সোহাগপুরা

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

উৎসর্গ

শিবশঙ্কর ভট্টাচার্য

প্রীতিভাজনেষু

সন্ধ্যার কিছু আগেই বিরাট দলটি শহরের প্রবেশপথে এসে পৌঁছেছিল; ইচ্ছে করলে যারা আগে এসেছিল তারা শাজাহানাবাদের ফটক পেরিয়ে শহরে ঢুকে পড়তে পারত, কিন্তু দলের কিছু কিছু লোক তখনও পিছিয়ে পড়ে—সবাই না এলে ঢোকা যায় কি ক'রে? লাহোর থেকে এতদিনের পথ একসঙ্গে এসেছে, সকলেরই সুখ-দুঃখ সকলে নিয়েছে ভাগ ক'রে; আজ পথের প্রান্তে এসে একদল স্বার্থপরের মতো ভেতরে চলে যাবে বাকী সবাইকে ফেলে, এটা কারুরই ভাল লাগল না। শহরে পৌঁছলে তো ছাড়াছাড়ি হবেই, তবু যতক্ষণ পারা যায়, ভাগ্যটা ভোগ ক'রেই নেওয়া যাক না!

কিন্তু শেষ দলটি—অর্থাৎ রুগ্ন পীড়িত পঙ্গুর দল যখন এসে পৌঁছল তখন সূর্য অস্ত গেছে। তারা আসছে 'বহল্' বা বয়েল গাড়িতে শুয়ে, তাদের বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না—এদের মতো হেঁটে বা উটে চেপে এলে হয়তো আগেই পৌঁছতে পারত!

তবে কারণ যাই হোক, ফটক বন্ধ করার ভার যাঁর হাতে—করিম বক্স সাহেব—কোন রকম দয়াধর্ম করতে রাজী হলেন না। ফটক বন্ধ হয়ে গেছে আজকের রাতের মতো—এবং বন্ধই থাকবে। এক খোদ বাদশা অথবা উজীর-এ-আজম, এঁদের সই-করা পরোয়ানা ছাড়া এ ফটক খোলবার শক্তি কারো নেই।

যাত্রীর দল নানা রকম যুক্তি প্রয়োগ করতে লাগলেন, 'আমরা তো চার দণ্ড আগেই এসে পৌঁছেছি খাঁ সাহেব, আপনি তো দেখেছেন!'

করিম বক্স তাঁর ঘুলঘুলি দিয়ে বিরাট দলটির দিকে চেয়ে প্রশান্তকণ্ঠে জবাব দিলেন, 'তখন ঢোকেন নি কেন, ফটক তো খোলাই ছিল।'

'পীড়িত আতুর লোকগুলোকে ফেলে কেমন ক'রে ঢুকি বলুন? ওদের জন্যেই তো—'

'তার আর আমি কি করব বলুন। একটু অপেক্ষা করুন, ভোরবেলাই শহরে ঢুকবেন। এখন গেলেও তো অসুবিধা, এই রাতের বেলা সরাইখানা দেখে খুঁজে নেওয়া—হয়তো জায়গা পাবেন না।'

'তা না পাই, তবু শহরের পথে রাত কাটানোও ভাল। কতদূর থেকে আসছি বোঝেন তো!'

'বুঝি বৈ কি। কিন্তু আমি নাচার।'

গোলাম আলি খাস্সুসিয়াৎ খাঁ এ দলের মাতব্বর গোছের একজন। তিনি নাকি মিয়া তানসেনের বংশধর, তাই তাঁর খাতির বেশি। তিনি এবার এগিয়ে এলেন, আদাব জানিয়ে একটা চোখ একটু টিপে বললেন, 'কী করলে ফটক খোলে, সেইটেই যদি মেহেরবাণী ক'রে জানিয়ে দিতেন। বলি, সেলামী-টেলামী কিছু ধরে নেওয়ার রেওয়াজ আছে কি?'

শেষ প্রশ্নটা বেশ চুপি-চুপিই করলেন গোলাম আলি।

'তওবা তওবা! আপনি বাওরা হয়েছেন খাঁ সাহেব? ভুলে যাবেন না বাদশা আলমগীর আজও দিল্লির তখ্‌তে রাজত্ব করছেন।'

'হ্যাঁ—নামে মাত্র করছেন, তখ্‌ৎ-এ-তাউস থেকে হাজার কোশ দূরে থাকেন তিনি।' এখানকার এই দরওয়াজা একদিন একটু পরে বন্ধ হ'ল কিনা—এ খবর সেখানে পৌঁছবে না।'

'ওটা আপনার মস্ত ভুল খাঁ সাহেব। আলমগীর বাদশাকে শুধু-শুধুই দুনিয়ার বাদশা বলা হয় না। তাঁর কান বহুদূর অবধি মেলা আছে, তাঁর হাতও অনেক দূর পৌঁছয়। মাপ করবেন খাঁ সাহেব, আর বেশী তকরার করতে পারব না। নমাজের সময় পার হয়ে এল।'

করিম বক্স তাঁর ঘুলঘুলির কপাটটা বেশ একটু জোরেই বন্ধ ক'রে দিলেন।

গোলাম আলি বিরস বদনে ফিরলেন সেখান থেকে। যাবার সময় কখন যে তাঁর বালিকা মেয়েটি সঙ্গে গিয়েছিল তা তিনি টেরও পান নি। সে এতক্ষণ চুপ ক'রে তার বাপজানের পিছনে দাঁড়িয়ে ওদের কথা শুনছিল, এখন একেবারে কথা কয়ে উঠতে তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন হলেন।

মেয়ে গম্ভীর মুখেই প্রশ্ন করল, 'তখ্‌ৎ-এ-তাউস কেমন দেখতে বা'জান? খুব সুন্দর দেখতে? আর খুব কিম্মৎ ওর?'

'আমি তো দেখি নি মেরে লাল, শুনেছি যে সেদিকে চাওয়া যায় না। তার জহরতের দিকে চাইলে চোখ ঝল্‌সে যায়।...তুই দেখবি?'

'শুধু দেখে কি হবে বাবা!' প্রশান্তমুখে উত্তর দেয় ঐটুকু মেয়ে।

'তবে? কি করবি?'

'চড়ব বাবা।'

'দূর পাগলী—তখ্‌ৎ-এ-তাউসে চড়বি কি! সে কেবল বাদশারাই চড়তে পারেন।'

'বাদ্‌শার বেগমরা ?'

'না—কৈ, তা তো শুনি নি !'

চুপ ক'রে রইল লালী। লালী নাম—কিন্তু গোলাম আলি আদর ক'রে ডাকেন 'লাল' বলেই। তাঁর ছেলে আছে তিনটি—তবে তারা কেউই মানুষ নয়। তাদের তিনি ছেলে বলে স্বীকারই করেন না। এই লালই আজ একাধারে তাঁর ছেলে মেয়ে দুই-ই।

অনেকক্ষণ পরে লালী বেশ দৃঢ়কণ্ঠেই বলল, 'তা হোক। আমি চড়বই বাবা, দেখে নিও !'

'দূর পাগলী।...কোথা থেকে একটা পাগলী এসেছে আমার কাছে। এসব কথা বেশী বলিস নি। সরকারী কোন লোকের কানে গেলে হয়তো গর্দানা যাবে।'

লালী চুপ ক'রে যায়।

•

ফটকের বাইরে এমনি প্রত্যহই বহুলোককে এসে পড়ে থাকতে হয়। সারারাত ধরে এসে লোক জমে—রীতিমত মেলা বসে যায় এক একদিন।

সুতরাং মেলার মতো দোকানপাটও বসে কিছু কিছু।

রুটি-কাবাব, দুধ-দহি-রাবড়ি—এসবের দোকান; সরাব-ওয়ালা থেকে শুরু ক রে ওস্তাগর, চামার পর্যন্ত বসে যায় পথের ধারে ধারে। দু-চারজন লোক গান-বাজনা ক'রে পয়সা রোজগারের ফিকিরে থাকে। নোংরা ঘাঘ্‌রা-পরা নাচওয়ালীও আসে। এরই মধ্যে দু-একজন হিন্দু গণৎকার কপালে ফোঁটা-তিলক লাগিয়ে সামনের মাটিতে আঁকজোক কেটে চট পেতে বসে থাকে। এদের কারুরই সারাদিন পাত্তা থাকে না, এদের কারবার শুরু হয় সূর্যাস্তের পর—ফটক বন্ধ হ'লে।

গোলাম আলি তখনই তাঁর রিস্‌সালাদারের কাছে ফিরে গেলেন না—মেয়ের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে এই মেলা দেখতে লাগলেন। বিবি রুটি পাকাবার তোড়জোড় করছেন সবে—এখনও খানা তৈরী হ'তে অনেক দেরি। এর মধ্যে ফিরে গিয়েই বা লাভ কি ? শুতে তো হবে আকাশের নিচেই, পথের ধুলোর ওপর—তার জন্য ব্যস্ত হয়ে লাভ নেই। আশেপাশে দু-একটা চটী বা সরাই আছে, কিন্তু সেগুলো এতই নোংরা যে, তার থেকে পথে থাকাই শ্রেয় বোধ হ'ল গোলাম আলির কাছে।

উদ্দেশ্যহীন ভাবেই ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন গোলাম আলি। জুতোতে একটা

তালি দেওয়া দরকার ছিল। চামারকে দিয়ে সেটা করিয়ে নিলেন। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খানিক নাচ দেখলেন। একটা লোক জমিয়ে গজল গাইছিল, তাও শুনলেন খানিকটা। কিন্তু কিছুই বেশীক্ষণ ভাল লাগল না। মেয়ের হাত ধরে অন্যমনস্কভাবে এগিয়েই চললেন।

হঠাৎ হাতে টান পড়তে চমকে ফিরে তাকালেন। মেয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছে, তাইতেই টান পড়েছে হাতে। কৌতূহলী হয়ে চেয়ে দেখলেন—এক গণৎকারের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছে লালী।

'কি রে?' বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেন গোলাম আলি।

'হাত দেখাব বা'জান!'

'দূর! হাত দেখাবি কি? মিছিমিছি কতকগুলো পয়সা নষ্ট!'

জ্যোতিষী সাগ্রহে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল: 'কিছু না—কিছু না, খাঁ সাহেব। পয়সা আর এমন কি?…বড় সৌভাগ্যবতী মেয়ে আপনার! দেখে দিই না হাতটা। এক ঢেবুয়া দেবেন—আর বেশী কি চাইব!'

'এক ঢেবুয়া? ইস্। ঢেবুয়ার অনেক দাম।'

'বেশ, এক ছিদাম, এক দামড়ি যা হয় দেবেন। যা আপনার খুশি!'

'দেখাই না বা'জান!' মেয়ের কণ্ঠে অনুনয়।

অগত্যা রাজী হন গোলাম আলি।

হেসে বলেন, 'দেখাও! যা ধরবে তা তো ছাড়বে না তুমি!…দাও হে, দেখে দাও। বেশ ভাল ভাল কথা বলবে আমার মাকে।'

সামনে মশালের মতো একটা চেরাগ জেলে বসেছিল গণৎকার। তিন-চারটে মোটা সল্তে একত্রে পাকানো। বদনার মতো একটা লোহার গোল পাত্রের নলে লাগানো আলো—লোহারই শিক পুঁতে বসানো সেটা। তার আলোতে লালীর হাতটা মেলে দেখলে সে অনেকক্ষণ ধরে। তারপর মুখ তুলে হাসি-হাসি মুখে বললে, 'মিছে ক'রে বানিয়ে বলবার কোন দরকার নেই খাঁ সাহেব। মেয়ের হাত আপনার সত্যিই ভাল। খুব বড়লোক হবে—পয়সা নিয়ে ছিনি-মিনি খেলবে। তবে শেষ বয়সে একটু গোলমাল আছে। একটু দুঃখের যোগ—'

অসহিষ্ণু কণ্ঠে লালী বলে উঠল, 'শেষ বয়স নিয়ে আমি একটুও মাথা ঘামাচ্ছি না, এখনকার কথা বল। আমি বেগম হতে চাই। বাদশার বেগম! হতে পারব?'

আবারও তার সেই ছোট্ট লালপদ্মের কোরকের মতো হাতখানির উপর ঝুঁকে পড়লেন গণৎকার। অনেকক্ষণ ধরে দেখে বললেন, 'না। সে সম্ভাবনা

নেই। বেগম হতে পারবে না ’

বালিকার সুন্দর বাঁকা ভুখানি জ্র নিমেষে কুঞ্চিত হয়েউঠল। সুগৌর কপোল লাল হয়ে উঠল রাগে। সে এক ঝট্‌কায় হাতটা ওর হাত থেকে টেনে নিয়ে বললে, ‘ঝুট্। সব ঝুট্। তুমি কিছু হাত দেখতে পার না। বেগম আমি হবোই—এই তোমাকে বলে দিলাম। বাদশার বেগম! লালকিলার তখৎ-এ-তাউসে বসবই।’

গণৎকারও যেন একটু চটে উঠল। বললে, ‘অনেক কষ্ট ক’রে এ বিদ্যা শিখেছি, রাস্তায় বসলেও আমি মিছে কথা বলে লোক ঠকিয়ে খাই না।… বাদশার বেগম তুমি হতে পারবে না কোনদিন।’

‘হবোই।’ দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে বলে লালী।

গণৎকারের পাশে এক বুড়ী বসে ছিল এতক্ষণ, বোধ হয় হাত দেখাবার জন্যেই অপেক্ষা করছিল। সে এবার বলে উঠল, ‘তোমাদের আমাদের মতো ঘর থেকে বাদ্‌শারা বেগম নিয়ে যান না মা—বড় জোর বাঁদী কি নাচওয়ালী হয়ে বাদ্‌শার মেহেরবাণী পেতে পার।’

‘কেন নিয়ে যাবেন না? আমি বাবার মুখে সব শুনেছি—নূরজাহাঁ বেগম কী এমন খানদানী ঘরের মেয়ে ছিলেন?’

‘ও, তোমার নূরজাহাঁ হবার শখ?’ বুড়ী হেসে ওঠে। খুব খানিক হেসে বলে, ‘তা খুবসুরৎ আছে বেটি।…ছাখো, কোন শাহজাদার নজরে যদি পড়ে যাও।

গোলাম আলি অসহিষ্ণু ভাবে জেব থেকে একটা দামড়ি বার ক’রে গণৎ-কারের সামনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, ‘চলে আয় দিকি! যত সব বাজে বাজে কথা!’

হাত ধরে একরকম টানতে টানতেই মেয়েকে নিয়ে গেলেন তিনি।

ততক্ষণে রুটি পাকানো হয়ে গিয়েছিল। ওদের দেখে গোলাম আলির বিবি বেশ ঝাঁজের সঙ্গেই বলে উঠলেন, ‘এই তো ছিরির খাওয়া—শুকনো রুটি শুধু। না একটু কাবাব, না কিছু—ডালও পাকাতে পারলুম না। তাও বুঝি শুকনো হাড় ক’রে না খেলে চলে না?’

‘কী করব—তোমার এই মেয়ে!…উনি গণৎকারকে দিয়ে হাত দেখাবেন —বাদশার বেগম হবেন।…আসতে কি চায়!’

‘আদর দিয়ে দিয়ে ওর দিমাগটি তুমিই বিগড়ে দিচ্ছ আলি সাহেব! কেবল

বড় বড় কথা ওকে আরও শোনাও ! নে এদিকে আয়। খেতে বোস ! বেগম হবে ! বাদশার বেগম ! আলমগীর বাদশার উমর সত্তর বছর পেরিয়ে গেছে— অনেকদিন আগেই। বুড়োর ঘর করতে পারবি ?'

স্থির নিশ্চিন্ত কণ্ঠে লালী উত্তর দেয়, 'কেন, ওঁর ছেলেও তো একদিন বাদশা হবে, কিংবা তার ছেলে। এই বাদশাই যে চাই তা তো বলি নি !'

'পোড়া কপাল আমার ! ঘুঁটেকুড়ুনীর বেটি বেগম হবেন !…ওরে তুই এমন কিছু রূপসী নোস। তোর মতো রূপ অনেকেরই আছে। বাদশার হারেমে যারা বাঁদীগিরি করে—তারাও তোর চেয়ে ভাল দেখতে। তুই তো আমার মতোই দেখতে হয়েছিস, সবাই বলে। তোর বয়সে আমারও ঐ রকম রূপ ছিল ! কী হ'ল তাতে ?'

'যার যা সাধ মা। তুমি তো বেগম হতে চাও নি। আমি চেয়েছি।'

মোটা মোটা কাঠের জালে তৈরী রুটি, পলাশ পাতায় ক'রে কাঁচা পিয়াজের কুঁচি আর কাঁচা লঙ্কা দিয়ে এগিয়ে দিলেন লালীর মা ওদের দিকে। খেতে খেতে গোলাম আলি স্ত্রীর সঙ্গে নানা বিষয়ে পরামর্শ করতে লাগলেন। লাহোরে ওঁদের পশমী জিনিসের কারবার ছিল বহুদিনের। পৈতৃক কারবার —এক ভাই ছিল তার বখ্‌রাদার। ভাই গানবাজনা নিয়েই থাকে—কিছুই করে না। এই নিয়ে ভাইয়ের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি মারামারি হওয়াতে সে কারবার গুটিয়ে দিল্লিতে এসেছেন। হিন্দুস্থানের সবচেয়ে ভারি শহর, রাজধানী। এখানে মুনাফা অনেক বেশী হবে। পরামর্শটা সেই দিক ঘেঁষেই চলেছে। ওঁর এক খুড়শ্বশুরের আতরের দোকান আছে চাঁদনীতে, তাঁকে খুঁজে বার করতে পারলে একটা সুরাহা হবেই। চাঁদনীতে ঘর পাওয়া শক্ত—তা তিনি এতকাল এখানে আছেন, ঘর একখানা কি আর খুঁজে দিতে পারবেন না ? আর অমনি কাছাকাছি একটা বাসা ? আপাতত শহরে পৌঁছে কোন সরাইখানাতেই ডেরাডাণ্ডা ফেলতে হবে। ইত্যাদি ইত্যাদি।…নানা রকমের স্বপ্ন-কল্পনা, ভবিষ্যতের নানারকম ছবি।

লালীর এদিকে কান ছিল না, সে শান্ত এবং নির্বাক ভাবে বসে বসে রুটি চিবুতে লাগল। শুকনো মোটা রুটি, নুনই তার উপকরণ। গলা খুব শুকিয়ে উঠলে পিঁয়াজ চিবোও, নয়তো লঙ্কা। আচ্ছা বেগমরা কি খায় ? তারাও কি এই আটার রুটিই খায়? না কেবল পোলাও খেয়ে থাকে ? রুটি খেলেও তাদের উপকরণ আলাদা, বা'জানের মুখে গল্প শুনেছে, শাহজাহান বাদশার অড়র দাল তৈরী হত—একসের দালে একসের ঘি দিয়ে। কাবাব, কোর্মা,

কোফতা—কত কীই নাকি রোজ হয়—বাদশার খুশী হলে কোনটা খান, নয়তো খান না। খেলেও একটুখানি হয়তো মুখে দেবেন।···আচ্ছা—বাদশার বেগমরাও নিশ্চয়ই অমনি খান—

একবার ইচ্ছা হ'ল বা'জানকে কথাটা জিজ্ঞাসা ক'রে জেনে নেয়, কিন্তু সাহসে কুলোল না। আবারও হয়তো ঠাট্টা শুরু হয়ে যাবে—আর মায়ের বকুনি। ওরা মোটে কথা বোঝে না।.

আহারের পর সেইখানেই একটা বিছানার মতো পাতা হ'ল। উটটাও শুয়েছে—উটের গা-ঘেঁষে আগাগোড়া বোরখা মুড়ি দিয়ে শুলেন লালীর মা, তাঁর কোলের কাছে লালী। একটু দূরে গোলাম আলীর বিছানা পড়ল। ঘুম তো হবেই না—পথে শোওয়ার জন্যে নয়, এ কদিন পথে-পথেই রাত কাটানো অভ্যাস হয়ে গেছে—উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠায় ঘুম আসা কঠিন। এমনি একটু আরাম ক'রে নেওয়া। অবশ্য ভয়ডরও বিশেষ কিছু নেই, চারিদিকে অমন তিনশ লোক ছড়িয়ে শুয়ে আছে—এই ময়দানের ওপরই। সবাই দীর্ঘ-দিনের সঙ্গী, আত্মীয়ের মতোই হয়ে গেছে।

'ঘুম হবে না' বলে শুলেও একটু পরেই লালীর মার নিশ্বাস গাঢ় হয়ে এল, গোলাম আলি সাহেবেরও নাক ডাকতে লাগল একটু একটু ক'রে। শুধু সত্যিই ঘুম এল না লালীর। দিল্লিতে এসে পড়েছে ওরা। সন্ধ্যার আগে দূর থেকে জামি মসজিদের চূড়ো দেখিয়েছেন ওর বাবা। আর লালকিলার লাহোরী ফটকের ওপরের নহবৎখানা। ত্রিপোলিয়া ফটক। উটের ওপর থেকে স্পষ্ট দেখা গেছে। আরো দূরে কুতুব।

কিন্তু ওসব বাজে, ওসব নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাচ্ছে না লালী। লালকিলা। লালকিলায় বাদশারা থাকেন—আর বেগমরা। 'সোনেরী নহর' বয় সেখানে, গুলাবের ফোয়ারা ছোটে। দিনরাত বাঁদীরা গান গায় আর নাচে—

দূরে এখনও কারা গান-বাজনা করছে। কান পেতে শোনে লালী। আরও দূরে ঘুঙুরের আওয়াজ। নাচওয়ালীরা এত রাত্রেও বিশ্রাম পায় নি—এক-আধটা ঢেবুয়ার লোভে এখনও মেহনৎ ক'রে যাচ্ছে সমানে। কী-ই বা পাবে বেচারীরা, দীর্ঘপথ আসতে রাহীদের সবাইকারই জেব্ খালি হয়ে গেছে।

এদের দিন চলে কিক'রে?

শুয়ে শুয়ে আকাশের তারার দিকে চেয়ে ভাবে লালী। এই এক আধ ঢেবুয়া ক'রে ক-টাই বা হয়! একটা সারেঙ্গী, একটা তবল্‌চী, দুটো নাচউলী।

কুলোয় ওদের ?

না—বড়ই দুর্দশা ওদের। আর কীই বা হবে ! যেমন চেহারা, তেমনি শিক্ষা-দীক্ষা আর তেমনি পোশাক। ওরা কি আর আমীর-ওমরাহ্‌ রইসদের বাড়ী মুজ্‌রো পাবে !

বা'জানের মুখে শুনেছে, দিল্লিতে এমনও নাচউলী আছে—হাজার আশরফি যার একদিনের রোজগার ! এখনকার আলমগীর বাদ্‌শা বড় বেরসিক তাই—নইলে শোনা যায় আগেকার বাদশারা হামেশাই ভাল ভাল নাচওয়ালীদের তলব করতেন। বহু নাচওয়ালী বাদশার হারেমে ঘর করেছে। বা'জানের মুখে না শুনলেও এমনধারা গল্প এবার আসতে আসতে বহুলোকের মুখেই শুনেছে সে।

হঠাৎ উঠে বসল লালী। আড়-চোখে একবার মার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল। বোরখায় মুখ ঢাকা, জেগে আছে কি ঘুমিয়ে আছে বোঝবার উপায় নেই। তবু নিঃশ্বাস ভারি হয়ে এসেছে যখন—নিশ্চয় ঘুমোচ্ছে। বা'জানের'ও নাক ডাকছে—গভীর ঘুম।

লালী নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল। চটিটাতে পা লাগাল না—হাতে ক'রে নিয়ে খানিকটা এসে তবে পায়ে দিল। তারপর সাবধানে ঘুমন্ত আধাঘুমন্ত রাহীদের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলল, যেদিক থেকে ঘুঙুরের শব্দ আসছিল সেই দিকে। কেউ কেউ তখনও খানা-পিনা করছে, কেউ বা এমনি কুণ্ডলী পাকিয়ে বসে তামাক খেতে খেতে খোশ-গল্প করছে। তারা আড়ে তাকিয়ে দেখলও কেউ কেউ—কিন্তু এতদিনে গোলাম আলির ধিঙ্গী মেয়েটার রকম-সকম সবাইকারই গা-সওয়া হয়ে গেছে—তারা কেউই বিস্মিত হ'ল না।

একেবারে শেষের দিকে গিয়ে নাচওয়ালীদের দেখা মিলল।

নাচ শেষ হয়ে গেছে তখন—ওদের মালিক সারেঙ্গী এবার একটা দোকানের সামনে আলোতে বসে পয়সা গুনছে। মিলেছে সামান্যই। সুতরাং মুখ সকলেরই অপ্রসন্ন। নর্তকী দুজন ক্লান্তিতে সেই ধুলোর ওপরই এলিয়ে পড়েছে। এত বড় রাহীর দল দৈবাৎ মেলে—তাতেও এই সামান্য আদায় ! সারেঙ্গীর চিন্তাক্লিষ্ট মুখে বড় রকমের একটা ভ্রূকুটি। এখনই এদের খোরাকীর পয়সা দিতে হবে—কোথা থেকে দেয় ?

এরই মধ্যে লালী কাছে গিয়ে সরাসরি প্রশ্ন করল, 'তোমরা দিল্লিতে থাক ?'

সারেঙ্গী অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখল—বছর আটেক-নয়ের ভারি সপ্রতিভ ফুটফুটে মেয়ে একটি। বয়স্কাদের মতো ওড়নাটা মাথায় জড়িয়েছে ঘোমটার আকারে—

দেখে কৌতুক বোধ করারই কথা—কিন্তু সারেঙ্গীর সে রকম মনের অবস্থা নয়, সে বিরক্ত হয়েই বলল, 'কেন ? তোমার কি দরকার তাতে ?'

'আমার একটু দরকার আছে। বল না, তোমরা কোথায় থাক।'

ততক্ষণে তবল্‌চী সামনে সরে এসে বসেছে। সে বললে, 'হ্যাঁ, আমরা দিল্লিতে থাকি, শাহ্‌জাহানাবাদে। কেন ? তোমার কেউ আছে সেখানে ?'

'না। কেউ নেই।'

এই পর্যন্ত বলে কেমন যেন থতিয়ে থেমে গেল লালী। তারপর, খানিক পরে—হঠাৎ যেন মরীয়া হয়েই বলে ফেলল, 'আচ্ছা, সেখানে বড় বড় সব নাচউলীরা কোথায় থাকে জান তোমরা ? ভাল ভাল নাচউলী—যারা আমীর-ওমরাদের বাড়ী নাচে, তোমাদের মতো রাস্তার নাচউলী নয়।'

নর্তকী দুজন তখনও পর্যন্ত এলিয়েই পড়ে ছিল। কখন পয়সা পাবে তবে রুটি কিনবে। দুখানা রুটি আর এক লোটা জল। পেটে কিছু না পড়লে আর নড়বার শক্তি ফিরবে না। কিন্তু এই অপমানসূচক কথাতে তারাও উঠে বসল। একজন, অপেক্ষাকৃত বয়স্কা যেটি, উঠে বসে কর্কশ কণ্ঠে বললে, 'আ মর ! এ-ডেঁপো ছুঁড়ির কথা দেখ না ! যা যা, সরে পড়্‌।'

কিন্তু তবল্‌চী তাতল না। তার দৃষ্টি বরং আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সে হাত বাড়িয়ে ওর একটা হাত ধরে টেনে কাছে আনল, 'কেন বল তো ? আমি জানি তাদের ঠিকানা। তুমি নাচ শিখবে, নাচওয়ালী হবে ?'

হাতটা একটানে ছাড়িয়ে নিলে লালী, কিন্তু নিজে সরে গেল না। তেমনি শান্ত স্থির কণ্ঠে বললে, 'হ্যাঁ। আমি নাচ শিখতে চাই। ভাল নাচ। যাতে আমীর-ওমরাহদের আসরে ডাক পড়ে। চাই কি বাদ্‌শার হারেমেও পৌছতে পারি।'

ঐটুকু মেয়ের মুখে এই কথাতে অবাক হওয়াই উচিত। এরাও কিছুক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো ওর মুখের দিকে। কেবল তবল্‌চীর চোখে ধূর্ত দৃষ্টি—বেড়ালের মতো জ্বলছে। সে বলল, 'হ্যাঁ—সে ব্যবস্থা আছে। খুব বড় নাচওয়ালীর কাছে নিয়ে যেতে পারি। কিন্তু তার কাছে বাঁদী হয়ে ঢুকতে হবে। কিছুদিন বাঁদী হয়ে সেবা না করলে সে নাচ শেখাবে না। ভাখো—রাজী আছ ?'

'আছি।' এতটুকু দ্বিধা বা সঙ্কোচ নেই ওর মুখে।

'তোমার বাপ-মা কোথায় ? তাঁরা কি রাজী হবেন ?'

'না। আমি লুকিয়ে চলে যাব, তোমাদের সঙ্গে !'

'কিন্তু সে তো হবে না! নেবে কেন! বাপের কাছ থেকে কিনবে সে, দলিলে সই করিয়ে নেবে দস্তুরমতো!'

এইবার লালী যেন একটু বিচলিত হ'ল। হতাশায় বিবর্ণ হয়ে উঠল তার মুখ।

'দাম দিয়ে কিনবে? ক্রীতদাসী? বাঁদী!'

'হ্যাঁ। এই-ই দস্তুর। নইলে তারা শেখায় না। তোমাকে ভাল ক'রে শেখাবে—বুড়ো বয়সে তোমার রোজগারে খাবে ব'লে—নইলে তাদের কী গরজ? ওরা নিজের মেয়েকে শেখায় আর কেনা-বাঁদীকে শেখায়!'

চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল লালী অনেকক্ষণ। তারপর ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেলে বললে, 'তুমি—তোমরা কেউ আমাকে মেয়ে ব'লে বেচতে পারো না? ...দামটা তোমরাই তো পাবে!'

তবল্‌চী অস্ফুট কণ্ঠে "বাহবা বাহবা" বলে আরও কাছে এগিয়ে এল...। আবারও ওর একখানা হাত ধরলে, "তুমি বাবা ব'লে মেনে নেবে আমাকে, সেখানে গিয়ে গোলমাল করবে না? ঠিক বলছ?'

'ঠিক বলছি, খোদা কশম!'

'তাহলে এখনই চলো। তোমার বাপ-মা ওঠবার আগেই বহু দূরে স'রে পড়তে হবে. তারা উঠলে তো বিষম গোলমাল বাধাবেই। কোতোয়ালকে জানাবে হয়ত – হৈচৈ পড়ে যাবে। শেষে আমাদের ধরে ফাটকে পুরবে।'

'কিন্তু যাবে কি ক'রে? ফটক যে বন্ধ।'

'আমরা এখন কোন দেহাতে গিয়ে ঘাপ্‌টি মেরে বসে থাকব। এদিক দিয়ে ঘুরে মেহ্‌রৌলি যাবো. সেখানে আমার এক আড্ডা আছে—গোলমাল মিটলে একদিন দিনের বেলায়ই তোমাকে বোরখা পরিয়ে সঙ্গে নিয়ে শাজাহানাবাদ ঢুকব।'

'বেশ, চল। আমি তৈরী।'

নাচওয়ালী দুজন অবাক হয়ে চেয়েই ছিল এতক্ষণ ওর দিকে, আর শুনছিল ওর কথা – এবার আর থাকতে পারলে না। অল্পবয়সী যেটি, সেটি প্রশ্ন করল, 'এমনি ভাবে এক কথায় বাপ-মাকে ছেড়ে চলে যাবে? মন কেমন করবে না'

'বা রে! মন-কেমন করবে কেন? বা'জান তো আমার শাদির জন্যে উঠে প'ড়ে লেগেছে। দিল্লিতে গিয়ে একটু গুছিয়ে বসতে পারলেই আমার শাদি দিয়ে দেবে। তখন তো দূরে যেতেই হবে। তাছাড়া—'

বলতে বলতে চুপ ক'রে যায় লালী।

'তাছাড়া কি, বল ? কিসের জন্যে, কোন্ লোভে তুমি এ পথে আসছ ? তোমার বাপ-মায়ের অবস্থা তো ভালই মনে হচ্ছে তোমার পোশাক-আশাক দেখে।'

'এটুকু ভালতে আমার চলবে না। আমি চাই খুব বড়লোক হ'তে। হীরা জহরৎ মোহর নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে। আমি বাদ্‌শার বেগম হতে চাই। বিয়ে হয়ে বাদ্‌শার হারেমে যেতে পারব না তো—দোকানদারের মেয়ে আমি—তাই ঠিক করেছি, নাচওয়ালী হয়েই ঢুকব।'

'বাদশার হারেমে যাবে ! তোমার আশা তো বড় কম নয় !···বড় কিম্‌তি খোয়াব* দেখছ ! দেখো সাবধান, খোয়াব টুটে গেলে না বেকুফ্ ব'নে যাও !'

লালীর পদ্মপত্রের মতো আয়ত চোখে নিমেষে বিদ্যুৎ খেলে যায়। পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাস আর ওদের ক্ষুদ্রতার প্রতি উপেক্ষা—ওর কণ্ঠস্বরে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

'খোয়াব কিসের ! এ আমি জেগে দেখছি। খোয়াব নয়। এ হওয়াই চাই। আর তখন—আম্মাজান আমাকে হারিয়ে যত চোখের জল ফেলবে, তার দুনো ওজনের মতি গুণে দেব তাঁকে। আর তোমাদের, তোমাদেরও ভুলব না। এই তোমারা সবাই—তোমাদের এমন উঁচুতে তুলে দেব, এ মুলুকের সমস্ত আমীর ওম্‌রা তোমাদের সেলাম জানাবে সকাল-সন্ধ্যায়। আজ যে পথের ধুলোর এক ঢেবুয়ার জন্য নেচে গেলে—সেই ধুলো মোহরে ঢেকে তার ওপর নাচবে একদিন !'

গোলমাল হৈ-চৈ হ'ল বৈ কি !

গোলাম আলি কোতোয়ালকে মোটা নজর দিয়ে বললেন, 'যেমন ক'রেই হোক্ আমার লালীকে খুঁজে দিন হুজুর। আমার ঐ এক মেয়ে। যা কিছু ওরই সুখের জন্য !'

কোতোয়ালও সে নজরের নিমক রেখেছিলেন। খোঁজখবর বড় কম করেন নি। আশপাশের সাতখানা গাঁয়ে লোক লাগিয়েছেন, শাজাহানাবাদ, শিরি, তোগলকাবাদ—শহরের কোনও কোণ বাদ রাখেন নি। কিন্তু কোথাও খবর পাওয়া গেল না। লালী যেন বাতাসে উবে গেল। ওদের দলের প্রত্যেক লোককেই জিজ্ঞাসা করা হয়েছে—তারা অনেকেই দেখেছে তাকে, গভীর রাত্রে একা নিঃশব্দে হেঁটে যেতে, তবে শেষ অবধি কোথায় যে গেল তা কেউ বলতে পারলে না।

---

* কিমতি খোয়াব—দামী বা মূল্যবান স্বপ্ন।

জানত একটা লোক—যে দুধ-দহির দোকানের সামনে বসে ওরা কথা কয়েছিল সেই দোকানদার। কিন্তু সে ঐ সারেঙ্গী ও তবল্‌চীর বহুদিনের বন্ধু, সে চুপ ক'রে রইল।

নাচওয়ালীদেরও খবর করা হয়েছিল। কিন্তু তারাই বা কি জানে? তারা তার পরের দিন সহজ ভাবেই নাচতে এসেছিল, তাদের বিশেষ সন্দেহ করার কথাও কারুর মনে আসে নি।

লালীর মা মাথা খুঁড়ে নিজেরই ললাট রক্তাক্ত ক'রে তুললেন শুধু। কেঁদে কেঁদে শুধু নিজেরই চোখ অন্ধপ্রায় ক'রে তুললেন। সে অপরিমাণ চোখের জলও না পারল দিল্লির রুক্ষ বালুময় রাজপথকে সিক্ত করতে, আর না পারল ভাগ্যদেবতার কঠিন হৃদয়কে কোমল করতে।

পাঁচ সাত দিন—এক মাস দু মাস—বসে বসে বৃথা চেষ্টা ক'রে গোলাম আলি হাল ছেড়ে চলে গেলেন আজমেঢ়। জীবনের বাকী কটা দিন যা হয় ক'রে গুজরান করা, এই তো! মোটা টাকা রোজগারের আশা বা ইচ্ছা কিছুই নেই যখন—তখন একটা তীর্থস্থানে থাকাই ভাল। দিনান্তে দুজনের দুখানা রুটি, মিলেই যাবে। না হয়, আজম শরীফের দরগায় বসে ভিক্ষা করতে তো পারেন!

কত কি স্বপ্ন—কত কি উচ্চাশা নিয়ে দিল্লী এসেছিলেন—এই নিষ্ঠুর নগরীর দ্বারপ্রান্তেই জীবনের যথাসর্বস্ব বিসর্জন দিয়ে ভগ্নহৃদয়ে চলে গেলেন মরুভূমির পথ ধরে।

এ জিন্দিগীও তো মরুভূমি হয়ে গেল। মিলবে ভাল!

॥ দুই ॥

মেহ্‌রৌলিতে পৌঁছে দলের সঙ্গে লালীর ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। কারণ দলের মালিক সারেঙ্গী নুরুদ্দীন মিয়া শেষ পর্যন্ত এসব ঝামেলায় যেতে রাজী হ'ল না। কোতোয়ালকে তার বড় ভয়। একবার মিথ্যে একটা মামলায় জড়িয়ে পড়ে তাকে কয়েকদিন ফাটকে বাস করতে হয়েছিল। সেই থেকে সে কোতোয়ালীর সাতশ' হাত দূরে থাকবার চেষ্টা করে। প্রথম থেকেই এত ঝুঁকি নেওয়াতে তার আপত্তি ছিল—তার ওপর মেহ্‌রৌলিতে পৌঁছে যখন শুনল যে, এরই মধ্যে চারিদিকে খোঁজাখুজি শুরু হয়ে গেছে—কোতোয়াল সাহেব নিজে এ বিষয়ে উত্তোগী এবং সক্রিয়—তখন একেবারেই বেঁকে দাঁড়াল সে। তবল্‌চী রাজু মিয়াকে সোজাই বলে দিলে, 'এসব হাঙ্গামে আমি নেই রাজু মিয়া;

সাফ্, সাফ্, কথা আমার। করতে হয় তুমি করো—কিন্তু তাও তফাতে !'

রাজু মিয়ার ধূর্ত চোখ ছুটি ধূর্ততর হয়ে' উঠল, তারই একটা চোখ মট্‌কে গলাটা নামিয়ে জবাব দিল, 'তাতে আমি খুব রাজী আছি—মোদ্দা শেষে আবার বখরার সময় এসে হিস্‌সা চাইবে না তো ?'

'না, না।'

'জবান দিচ্ছ ?'

'দিচ্ছি।'

তবল্‌চী রাজু মিয়া আর কথা না বাড়িয়ে কোমরে-বাঁধা ডুগি-তবলাটা খুলে কাঁধে ফেললে, তারপর লালীর একটা হাত ধরে ওদের উল্‌টো-পথে হাঁটতে শুরু করল।

কিন্তু দিল্লি শহরের বহু গলিঘুঁজি পেরিয়ে, অনেক পথ হেঁটে শেষ পর্যন্ত রাজু মিয়া লালীকে যেখানে এনে তুললে—আর যাই হোক্—সেটা কোন নাচওয়ালীর বাড়ী নয়। অন্তত নাচের কোন আয়োজন বা সরঞ্জামই তার চোখে পড়ল না। তাছাড়া, পাড়াটাও যেন কেমন-কেমন !

সে রাজু মিয়ার দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে সোজাসুজি প্রশ্ন করল, 'এ আমাকে কোথায় আনলে ?···তুমি যে বলে এনেছিলে—বড় নাচউলীর কাছে পৌঁছে দেবে !'

নিঃশব্দ হাস্যে রাজু মিয়ার ঠোঁট ছুটি বিস্ফারিত হয়ে পানের-ছোপ-খাওয়া দাঁতগুলি বেরিয়ে পড়ল। এখানে আসতে আসতেই তার মতলব উল্‌টে গেছে। বেশী লোভ তার।···একটু পরে হাসি সামলে বললে, 'থামো থামো বেগম সাহেবা, তুমি যে একেবারেই ওপরে উঠতে চাও। বলি লাফ্ দিয়ে কি কুতুবে ওঠা যায় ? শুনেছি 'আড়াইশ'র ওপর সিঁড়ি ভাঙ্গতে হয় ওপরে চড়তে হলে—'

লালী এক ঝটকায় হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বললে, 'ওসব আমি জানি না। আমি এখানে থাকব না।'

রাজু মিয়াও এক লাফে এগিয়ে এসে ওর হাতটা চেপে ধরল—এবার বজ্রমুষ্টিতে একেবারে—তার তব্‌লা-বাজানো আঙুলগুলো লোহার সাঁড়াশির মতো লালীর নরম হাতে চেপে বসল।

রাজু অস্ফুট একটা গালাগালি দিয়ে বলল, 'আরে তুমি যে ক্ষেপে উঠলে দেখছি ! একেবারেই কোন্ নাচওয়ালীর কাছে উঠব ? বলতে কইতে হবে—দরদস্তুর আছে, তাদের পছন্দ-করানোর কথা আছে—তবে তো ! এ আমার চাচীর বাড়ী, সাক্ষাৎ চাচী ! এখানে ক'দিন থাকো, দু'চার দিন সর-ময়দা

মাখিয়ে তোমার রঙের জেল্লা আরও খোলাই—তারপর বাইজী মহল্লায় নিয়ে যাব। এখন এই অবস্থায় নিয়ে গিয়ে দাঁড়ালে কেউ ফিরেও তাকাবে না!'

কথাটা খুব অযৌক্তিক নয়! যদিচ ওর হাসি, চাউনি এবং এখন এই সাঁড়াশির-মতো-ক'রে হাত চেপে ধরা—কোনটাই ভাল লাগছে না, তবু লালী আস্তে আস্তে নরম হয়েই এল। ইতিমধ্যে রাজু মিয়ার চাচীও বেরিয়ে এসেছে। বিপুল মেদ, ভারি ভারি রূপোর গহনা, মেদীপাতায় রঙানো হাত-পা, চোখে সুর্মা—সবটা মিলিয়ে এক তাজ্জব ব্যাপার। পাহাড়ের মতো দেহ মেয়েছেলেটার, শুধু সেই দিকে চাইলেই ভয় করে।

চাচী থপ্‌থপ্ করতে করতে এসে ওকে একেবারে কোলের মধ্যে টেনে নিলে, 'হায়! হায়! কী খুবসুরৎ বেটি রে আমার!...বাহবা বা!...কোন ভয় নেই বেটি, আমার কাছে থাক, খেলা কর, ফুর্তি কর, খাও-দাও—তোফা আরাম!...বলি আমি রাজুরও চাচী যখন—তোমার তো নানীর মতোই! আমাকে তোমার ভাল লাগছে না?'

লালী সোজা মুখ তুলে ওর সেই বিরাট গোল মুখখানার দিকে চেয়ে বললে, 'না, একটুও না।'

অপমানে চাচীর রং-করা মুখখানাও রাঙা হয়ে উঠল—তবু হেসেই বললে, 'আচ্ছা দু দিন থাক—ভাল লাগবে বৈকি, খুব ভাল লাগবে। তখন আর আমাকে ছাড়তে চাইবে না।'

এই ব'লে আবারও একটু হাসল সে। কেমন এক রকমের বিশ্রী হাসি। লালীর গা ঘিন-ঘিন ক'রে উঠল যেন। সে ওর কোল থেকে নেমে আসবারও চেষ্টা করলে, কিন্তু তৎক্ষণে চাচীর বাহু-বন্ধন আরও নিবিড় হয়ে এসেছে, তার মধ্যে থেকে মুক্তি পাওয়া বালিকার সাধ্যের বাইরে।

বেশীক্ষণ চেষ্টা করতে হ'লও না—একরকম কোলে ক'রেই ওকে তুলে এনে চাচী একটা ঘরে প্রায় ছুঁড়ে ফেলে দিলে—তারপর বিদ্যুৎগতিতে ভারী কপাট দুটো বন্ধ ক'রে বাইরে থেকে শিকল তুলে দিলে!

এরপর আর রাজু মিয়ার দেখা পায় নি লালী। কোনদিনও না। শুধু ঘরের ভেতর থেকে শুনেছিল কতকগুলো টাকা গুনে দেওয়া ও নেওয়ার শব্দ। আর চাপা হাসির আওয়াজ। ক্রমে সেটুকুও মিলিয়ে গেল।

চাচী খুশী হয়েছিল লালীকে পেয়ে, খুশী হয়েই দাম দিয়েছিল। মোটা দাম। কিন্তু তখনও লালীকে চেনে নি সে। খানিক পরে খানা নিয়ে ঘরে ঢুকতে ওর সে খুশির আর কোন কারণ রইল না।

এক কোণে একটা খাটিয়ার ওপর স্থির হয়ে বসে ছিল লালী। চাচী ঘরে ঢুকতে কোন গোলমাল করলে না, চেঁচামেচি করলে না—কান্নাকাটি তো নয়ই—শুধু ওর মুখের দিকে শান্ত চোখ মেলে বললে, 'আমাকে এমন ক'রে এখানে আটকে রাখলে কেন?'

'টাকা দিয়ে কিনেছি তোমাকে—লাভ পেলেই বেচব।'

'কাকে বেচবে?'

'যার কাছে বেশী দাম পাব। অনেক টাকা দিয়েছি, চাইও অনেক।'

'দাম তুমি যত খুশি নাও। আমি তো নিজেই বলেছিলুম। মোদ্দা আমাকে কোন নাচওয়ালীর কাছে বেচে দাও!'

'নাচওয়ালীরা বেশী দাম দিতে চায় না। ওদের মেয়ের অভাব নেই।'

'তবে কাকে বেচবে?'

'খোজার দল আসে খোঁজ করতে। এমনি কারবারীরাও আসে। দূর দেশে চালান দেবে তারা, মোটা দাম দিয়ে কিনবে।...তাছাড়া, বেচতে না ও পারি। আমার কাছে থাকবে—রোজগার করবে। তোমার যা সুরৎ—মোটা টাকা রোজগার হবে আমার!'

আবারও সেই হাসি। বিশ্রী, গা-ঘিন-ঘিন করা হাসি।

লালী কিন্তু বিচলিত হ'ল না, বললে, 'ত্থাখো আমাকে জোর ক'রে কিছু করাতে পারবে না। তুমি আমাকে কোন নাচওয়ালীর কাছে বেচে দাও। এখন দাম তো পাবেই, এর পর যখন খুব—খুব বড়লোক হব, তোমাকে অনেক টাকা দেব। যে দামে কিনেছ তার চারগুণ! আমার নসীবে আছে আমি টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলব।'

'সেই জন্যই হয়তো বেচব না তোমাকে! তুমি আমার কেনা বাঁদী, তোমার সব রোজগারই তো আমার।'

'রোজগার? আমি নাচ গান না শিখলে কিসে রোজগার করব?'

প্রশ্নটায় এই প্রথম বিব্রত বোধ করল চাচী, বলল, 'ও আর একটু বড় হও—বুঝবে!'

'বলই না।'

'এই ধরো—খুব বড়লোকের সঙ্গে তোমার শাদি দেব!'

ঠোঁট উল্টে লালী বললে, 'কত বড়লোক? পারবে বাদ্‌শা—কি কোন শাহ্‌জাদার সঙ্গে শাদি দিতে?'

'ইস! তোমার আশা তো কম নয়!'

'হ্যাঁ—ঐ রকম আশা আমার। নইলে আমি তোমাদের ঐ রাজু মিয়ার সঙ্গে আসতুম না। আমার বাবা খুব গরীব নয়।'

'আচ্ছা, ওসব কথা এখন থাক্। রুটি কখানা খেয়ে নাও দিকি—লক্ষ্মী মেয়ের মতো।'

'আমাকে ছেড়ে দাও। কোতোয়ালের কাছে খবর গেলে রক্ষা থাকবে না। সারা শহরে আমার খোঁজ চলছে, এই পথে আসতে আসতেই শুনেছি!'

চাচী হাসল। সানন্দ সরল হাসি।

'তুমি এ ঘর থেকে বেরোতে পারলে তো কোতোয়াল সাহেব খবর পাবেন।...ওসব ভরসা ছাড়। ঢের ছেলেমানুষী হয়েছে, খেয়ে নাও।'

'আমি খাব না।'

"খাবে না?'

'না। ছেড়ে দাও আমাকে; এ বাড়ীতে কিছুই খাব না আমি।'

'আচ্ছা দেখা যাক—ক'দিন উপোস করে থাকতে পার!'

চাচী আবারও কপাট বন্ধ ক'রে বেরিয়ে গেল।

কিন্তু লালী সত্যিই খেল না। সেদিনও না, তার পরের দিনও না।

চাচী এবার সত্যি-সত্যিই ভয় পেয়ে গেল।

'কোড়া লাগিয়ে তোমাকে শায়েস্তা করতে পারি—তা জান?' রাগ ক'রে বললে সে।

উপবাসে প্রায় নেতিয়ে পড়েছিল, তবু হার মানবার মেয়ে নয়। লালী সমান তেজের সঙ্গে জবাব দিলে, 'তাতে কি আমাকে খাওয়াতে পারবে? না তোমার দাম উসুল হবে?'

রাগে নিজের হাত নিজে কামড়ায় চাচী। অনেক মেয়েকেই সে শায়েস্তা করেছে এই বয়সে, কিন্তু এমন সাংঘাতিক মেয়ে তো কখনও দেখে নি! সত্যিই কিছু কোড়া লাগানো যায় না, নরম চামড়া—দাগ বসে যাবে। আর অমন চামড়াই যদি না রইল তবে দাম উঠবে কিসে! নইলে চেঁচাবার ভয় সে করে না। মুখে কাপড় গুঁজে দিলেই হবে।... একবার একটা মেয়েকে ঐভাবে ঢিট করতে গিয়ে মুশকিল বেধেছিল—পিঠে চিরদিনের মতো দাগ হয়ে গেল—আর কিছুতেই ভাল দাম পেলে না।

অগত্যা অন্য পথ ধরলে চাচী।

খুব মিষ্টি গলায় বোঝাতে বসল।

'কেন বেটি অমন করছিস! সত্যি বলছি, এই কসম খেয়ে বলছি, আমার

কথা শুনে চল্—টাকা-পয়সা হীরে-জহরতে ডুবে থাকবি। সত্যিই তোর নসীবে দৌলত আছে—তাই খোদা তোকে আমার কাছে এনে ফেলেছেন!'

'আমি শুধু টাকা-পয়সা চাই না নানী, আমি শাহী তাজ চাই! তখৎ-এ-তাউসে বসতে চাই!'

'এ যে পাগলের মতো কথা হ'ল। যা অসম্ভব তা আমি বলব না। বাদ্‌শা শাহ্‌জাদার কথা ছেড়ে দাও—বাদ্‌শা শাহ্‌জাদারা তো আমার বাড়ী আসবেন না—ধরে নিয়ে গিয়ে হারেমে পুরবেন। তাতে আমার লাভ কি? তবে হ্যাঁ—যা রয় সয়, নবাব সুবাদার পর্যন্ত চেষ্টা করলে দিতে পারব তোমাকে।...তাছাড়া টাকা যদি চাও—দক্ষিণের কারবারীরা আছে—হীরে-জহরতে মুড়ে দেবে।'

'না, নানী। বাদশা কি শাহ্‌জাদা ছাড়া আমি রাজী নই। তুমি আমাকে ছাড়। আমি বলছি, আমার যা জেদ তা আমি মেটাবই। আর সেদিন—তোমার এই টাকা—তোমার যত আশা—তার দৃশগুণ শোধ করব!'

আবারও চটে ওঠে চাচী, গালিগালাজ করে, চড়ও একটা বসিয়ে দেয় ওর গালে। তাতে শুধু লালীর নরম গালে পাঁচ আঙুলের দাগ বসে যায়, আর কোন ফল হয় না। নিষ্পলক শুষ্ক চোখ মেলে দেওয়ালের দিকে চেয়ে কাঠের মতো শুয়ে থাকে সে।

কিছুতে, কোন মতে ওকে শায়েস্তা করতে না পেরে যেন ক্ষেপে যায় চাচী।

কী করবে সে, কেমন ক'রে ঢিট করবে ওকে! ঐ এক ফোঁটা জিদ্দী মেয়ের জন্যে কি এতগুলো কর্‌করে মোহর জলে যাবে?

অনেক ভেবেও যখন কূল-কিনারা পায় না—তখন ছুটে যায় সে জুহরার কাছে। গলির মোড়ের সব্‌জীওয়ালী জুহরা তার অনেকদিনের আর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

সব শুনে জুহরাও অবাক হয়ে যায়।

'তাজ্জব তো!...কত বড় মেয়ে রে সে?'

'কত আর—বড় জোর দশ বছরের হবে!'

'বলিস কি, তার এত জেদ? এত বুকের বল?...চল তো দেখে আসি!'

জুহরা এসে কাছে বসে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করে লালীকে সব কথা। তারপর প্রশ্ন করে ওকে, 'আচ্ছা ধরো তোমাকে ভাল নাচ শেখাবার ব্যবস্থা ক'রে দিলুম—কিন্তু তাতেও যদি বড়লোক হ'তে না পার—কোন বাদ্‌শা শাহ্‌-জাদার নজরে না পড়—তাহলে, আমাদের টাকাগুলোর কী হবে?'

অসহিষ্ণু কণ্ঠে লালী ব'লে উঠল, 'কেন ওসব বাজে বাজে কথা বলছ! শাহী তাজ একদিন আমার পায়ে লোটাবে। কেউ আটকাতে পারবে না—কিছুতেই না। ঐ তখৎ-এ-তাউস আমার হবে। হিন্দুস্তানের মানুষগুলো আমার কথায় মরবে বাঁচবে—এ আমার হবেই। তখন—'

'তখন? কি হবে তখন?'

'তখন তোমরা যা চাও, যত চাও তোমাদের দেব। দু হাত ভ'রে দেব—সোনা, চাঁদি, জহরৎ!...এ বুঝবে না, তুমি বুঝবে আমার কথা—তুমি একটা উপায় ক'রে দাও—আমি তোমাকে রাণী ক'রে দেব, জায়গীর দেব তোমাকে। তুমি হাতীতে চেপে যাবে বেগমদের মতো!'

জুহরা এক দৃষ্টে কেমন একটা অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে ছিল ওর মুখের দিকে, এখনও তেমনি ভাবে চেয়ে প্রশ্ন করলে, 'আর যদি না পার?'

লালীও কিছুক্ষণ স্থির হয়ে চেয়ে রইল ওর দিকে, তারপর বললে, 'আমি যে সুযোগ চাইছি তা যদি আমাকে দিতে পার তো আজ থেকে ষোল বছরের মধ্যে তোমার জায়গীর তুমি পাবে—নইলে, নইলে ষোল বছর পরে আমি নিজে এসে দাঁড়াব তোমাদের কাছে। তখন আমাকে নিয়ে যা-খুশি ক'রো তোমরা। যাকে খুশি বেচে দিও। খোদা কসম।'

জুহরা বাইরে বেরিয়ে এসে বললে, 'এ আলাদা জিনিস আমিনা, যা এতদিন ঘেঁটেছিস সে জিনিস নয় এ। শাহীতখ্‌তে বসবার মতোই মেয়ে এ। ছেড়ে দে একে, পারবি না সামলাতে। অনেক টাকা তো করেছিস, একবার ছেড়ে দিয়ে ছাখ্ না। জুয়াও তো খেলিস তুই—মনে কর বড় রকমের জুয়া খেলছিস একটা।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আমিনা বলে, 'জানি না। যা খুশি কর তুই। ভাল এক আপদ এনে জোটাল রাজু মিয়া!'

জুহরা লালীর পাশে এসে বসল। ওর গায়ে হাত রেখে বলল, 'তোমার কথা বিশ্বাস করলাম আমি। তুমি যা চাও, তা-ই ব্যবস্থা ক'রে দেব। আমার সঙ্গে চল—ফাতিমা বিবির কাছে নিয়ে যাচ্ছি তোমাকে; তার এই কাজই, মেয়েদের নাচ গান শিখিয়ে তৈরী ক'রে নবাব বাদশার হারেমে পাঠায় সে।...কেমন খুশী তো?'

'খুশী।'

'তাহ'লে এখন একটু দুধ খেয়ে নাও অন্তত। নইলে হাঁটতেই পারবে না যে!'

লালী ওর মুখের দিকে চেয়ে কী যেন দেখে নিল একটা, তারপর যেন একান্ত নির্ভরে ওরই হাত ধরে উঠে বসে বলল, 'কৈ দাও দুধ, খাচ্ছি।'

॥ তিন ॥

শাহ্‌জাদা মির্জা মুইজউদ্দীন বিরক্ত হয়ে উঠেছেন। জীবন থেকে রঙ ও রসই যদি চলে গেল তো জীবনে রইল কি ?

কিছুই ভাল লাগে না। স্ত্রীগুলো একঘেয়ে। বাঁদীগুলো সব কেমন কেমন, কাঠের পুতুল—শুধু জানে পয়সা আদায় করতে আর হুকুম তামিল করতে। ওদের মধ্যে প্রাণ নেই। ভাল নাচওয়ালী কেউ তাঁদের ত্রিসীমানায় আসে না। বাদ্‌শা আলমগীর ছিলেন বেরসিক, বাহাদুর শা কৃপণ—তাই ভাল ভাল বাইজী ও নাচওয়ালী যারা, তারা বহুদিনই সরে পড়েছে দিল্লি থেকে এদিক ওদিক—লক্ষ্ণৌ আগ্রায় গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। তাঁদের দিন কাটে কি ক'রে ? জীবনে 'মজা' কৈ ?

শাহ্‌জাদার ইয়াররা তাঁর মেজাজের তল পায় না। তাদের যথাসাধ্য এনে যোগায়, কিন্তু মুইজউদ্দীনের মন খুশী হয় না তাতে। এক এক সময় মনে হয়, উনি কি চান তা তিনি নিজেও জানেন না !

হঠাৎ একদিন কথায় কথায় বলে বসলেন, 'শুনেছি অনেক গেরস্ত ঘরে বিবিরা মরদদের ধরে মার দেয়—আমি যদি বাদ্‌শার ঘরে না জন্মে গেরস্ত ঘরে জন্মাতুম তো ঢের ভাল হ'ত !'

'বিবির হাতে মার খেতেন খুশী হয়ে ?'

'মন্দ কি। তবু তো নতুন রকম হ'ত। এ আর ভাল লাগে না, এই একঘেয়ে জীবন !'

শাহ্‌জাদার প্রিয় বয়স্য ইমাম আলি হঠাৎ বলে উঠল, 'বেগম না হোক, একজনি নাচওয়ালী কিন্তু আমি দেখেছি শাহ্‌জাদা। সে ভারি মজার মেয়ে।'

'কী রকম, কী রকম ?' মুইজউদ্দীনের সুরারক্ত চোখ দুটি উৎসুক হয়ে ওঠে।

'সে নাকি মুজ্‌রো করে শুধুই নাচের, কিছুতেই কাউকে ধরা দেয় না। ওর সুখ্যাতি শুনে,—লাহোরের সুবাদার যখন দিল্লি যান তখন বায়না দিয়েছিলেন। মোটা টাকার বায়না—পাঁচশ মোহরের মুজ্‌রো, একশ মোহর তো বায়নাই দেওয়া হয়েছিল। নাচ শেষ হ'তে সুবেদার ওর হাত ধরতে গেছেন—হাত ছিনিয়ে নিয়েছে। বলে, পাঁচশ মোহরে আমার নাচ পাওয়া যায় নবাব

সাহেব, আমাকে পাওয়া যায় না। নবাব হেসে বলেছেন, চটছ কেন বাইজী, না হয় পাঁচশ মোহর আরও নেবে। সে বলে, তাও নয়, যে দামে আমি নিজেকে বেচব তা ঠিক করাই আছে। সুবেদার প্রশ্ন করেছিলেন—কী সে দাম বল, এখনি দিচ্ছি। উত্তর এল—সে দাম আপনি দিতে পারবেন না। কি দাম এমন ?···না, বাদশাহী তাজ। এক বাদ্‌শার কাছে ছাড়া আর কারও কাছে ধরা দেব না।'

'বটে বটে—বড় তাজ্জব মেয়ে তো !' শাহ্‌জাদা সোজা হয়ে বসলেন।

'শুনুন এখনও, এরই মধ্যে কি ? ওর কথা শুনে ঠাট্টা মনে ক'রে সুবাদার জোর ক'রে টানতে গেছেন, ওর কোমরে ছিল শঙ্কর মাছের এক চাবুক, যা নাকি জড়ানোই থাকে কোমরে—যেখানে যখন মুজ্‌রো করতে যায়—বার ক'রে সটান সুবেদারের মুখে এক ঘা। কপাল ফেটে রক্ত ঝরে পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে তিনি তো বাপ্‌ ব'লে ছেড়ে দিলেন, নাচওয়ালী বেরিয়ে এল ঘর থেকে !'

'এমন গুস্তাকী ! তা সুবাদার এমনি এমনি ছেড়ে দিলেন ?' জিজ্ঞাসা করলে মীর বক্স।

'কী করবেন ? এসব জানাজানি হ'লে যে আরও কেলেঙ্কারি। তাই কিল খেয়ে কিল চুরি করলেন !'

শাহ্‌জাদা ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছেন একেবারে, 'ইমাম আলি, কোথায় সে থাকে, তাকে এখনই তলব কর।'

'উঁহু শাহ্‌জাদা, সে হবার উপায় নেই। ঐ ঘটনার পর থেকে সে পরের বাড়ি মুজ্‌রো করাই ছেড়ে দিয়েছে, এখন কেউ নাচ দেখতে চাইলে তার বাড়ি যেতে হবে !'

'তাই না হয় যাই চল। এখনই যাই।'

'ধীরে শাহ্‌জাদা ধীরে। সে নাচওয়ালী থাকে দিল্লিতে, আপনি এখন মুলতানে। ইচ্ছে করলেই যাওয়া যাবে না। এমন কি বাদ্‌শা শাহ্‌জাদাদেরও ভগবান উড়ে যাবার ক্ষমতা দেন নি। আপনি আজ রওনা হ'লেও পৌছতে এক মাস। তাছাড়া আজই হঠাৎ মুলতান ছাড়বার কী কৈফিয়ৎ দেবেন বাদ্‌শাকে ?'

'তুমি বড় সব তাইতে দমিয়ে দাও ইমাম আলি।' অপ্রসন্ন মুখে বলেন শাহ্‌জাদা।

হজরৎ নিজামুদ্দীন আউলিয়ার মেলায় বহু দেশ থেকে বহু লোক আসে হরেক রকমের লোক। গুণী জ্ঞানী পণ্ডিত, সাধু ফকিরও আসে।

তীর্থযাত্রীরা আসে নানা দেশ থেকে—তামাম হিন্দুস্থান তো বটেই, বাইরেও সুদূর তাতারীস্তান কাজাগীস্তান ইরাক ইরাণ থেকে আসে মানসিকের পুজো শোধ করতে—কেউ আসে মানসিক করতে। জাগ্রত পীর আছেন এখানে নিজামুদ্দিন সাহেব, তাঁর মর্জি হ'লে রাত এখনও দিন হয়ে যেতে পারে।

যাত্রীদের সঙ্গে সঙ্গে আরও বহুলোক আসে। চিরকাল সব দেশেই, সব ধর্মের সব তীর্থেই আসে এরা। আসে তীর্থযাত্রীদের ইহলোকের সম্বল কিছু খসাতে। আসে নানান পণ্য নিয়ে কারবারী দল। আসে রোজা-ওঝা-গুণীন্। জড়ি বুঁটি নিয়ে আসে হাকিম বৈছেরা। দৈব ওষুধ নিয়ে এসে বসে যাযাবর বেদেরা। সব চেয়ে বেশী আসে দৈবজ্ঞ বা জ্যোতিষীর দল। ছোট বড় মাঝারি—নানান দামের ও নানান ধরণের। কেউ কেউ পথের তুদিকে বসে যায় খুঙ্গিপুঁথি নিয়ে, কেউ বা দরগার উঠোনেই জাঁকিয়ে বসে। কেউ আবার দরগার আশেপাশে যে সব সাময়িক চালা তোলা হয়, তারই একখানা ভাড়া ক'রে বসে যায়।

এবার এসেছেন দক্ষিণ ভারত থেকে বিখ্যাত দৈবজ্ঞ মৌলবী জনাব আল্লাবক্স সাহেব। এসেছেন তিনি তীর্থ করতে, কিন্তু সেই সঙ্গে যদি তু'পয়সা কামিয়ে নেওয়া যায় তো ক্ষতি কি? 'এক পন্থ দৈ কাজ'—আসা যাওয়ার খরচাটা উঠেও হয়তো তু'পয়সা থাকতে পারে।

আল্লাবক্স সাহেবের খ্যাতি খুব। দাক্ষিণাত্য থেকে সে খ্যাতি তাঁর পৌছবার বহু আগেই দিল্লি পৌছে গেছে। ফলে দিনে রাতে একটু ফুর্সৎ নেই। তাঁর ঘরে লোকের ভিড় লেগেই আছে। মেলার মধ্যে কী ক'রে যেন রটে গেছে মৌলবী সাহেব ত্রিকালজ্ঞ—ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান তাঁর নখদর্পণে, অভ্রান্ত তাঁর গণনা, যাকে যা বলেছেন তা-ই সত্যি হয়েছে। আর একটা বড় কথা, তিনি আমীর রইস লোকেদের কাছ থেকে যেমন মোটা টাকা আদায় ক'রে নিচ্ছেন, তেমনি গরীব লোক—যারা পীর সাহেবের নাম ক'রে বলছে যে তাদের কিছু দেবার সামর্থ্য নেই—তাদের হাত বিনা পয়সাতেই দেখছেন। অথচ তাই ব'লে অবহেলাও করছেন না, ভাল ক'রেই দেখছেন।

শাহ্‌জাদা মির্জা মুইজুদ্দীনও মেলাতে এসেছেন। নিজামুদ্দীন সাহেবের মেলাতে তিনি প্রায়ই আসেন—মানে কাছাকাছি থাকলেই। শাহ্‌জাদা বিলাসপ্রিয় এবং নারীসঙ্গলিপ্সু হ'লেও মোল্লা-ফকীরে তাঁর অচলা ভক্তি, তা এ অঞ্চলের সবাই জানে; এই মেলাতে বহু ভাল ভাল ফকীর দরবেশ আসেন, অন্য সময় তাঁদের দেখা মেলে না।

শাহ্‌জাদাও জ্যোতিষী আল্লাবক্সের নাম শুনেছেন বৈকি !

কামবক্স যেদিন জুলফিকর খাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন সেদিন এই আল্লাবক্সই নাকি তাঁকে নিষেধ করেছিলেন—কামবক্স শোনেন নি। তার ফল কী হয়েছে তা সবাই জানে। শাহ্‌জাদারও একটা জরুরী প্রশ্ন আছে, জীবনের সবচেয়ে বড় প্রশ্ন সেটা।

তাই তিনিও ঘুরতে ঘুরতে এক সময় জ্যোতিষীর চালার সামনে এসে দাঁড়ালেন। কিন্তু সেখানে তখন মস্ত গোলযোগ চলছে। এক তরুণী নাচওয়ালী এসেছে হাত দেখাতে। তার আগে থেকেও বহু লোক এসে দাঁড়িয়ে আছে—একে একে ডাকছেন মৌলবী সাহেব কিন্তু সে মেয়েটি অপেক্ষা করতে রাজী নয়। তাই নিয়ে তকরার চলেছে। সে বলছে, 'আমার এতক্ষণ অপেক্ষা করার সময় নেই, মৌলবী সাহেবকে বলো তাঁর কত টাকা চাই আমি দিচ্ছি—আমার হাত আগে দেখে দিতে হবে।'

মৌলবী সাহেবের মুন্সী বলছেন, 'মৌলবী সাহেবের অমন টাকায় দরকার নেই। বেইমানীর টাকা তাঁর কাছে হারাম!'

'টাকার আবার দরকার নেই কার? বাদশার তো অত টাকা—তিনিও টাকা পেলে খুশী হন!' ঝেঁঝে ওঠে মেয়েটি।

চেঁচামেচি গণ্ডগোল বেড়েই যায়। ঝোপড়ার মতো ঘর, ভেতরে বসে মৌলবী সাহেবের কাজ করা দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। তিনি মুন্সীকে ডেকে পাঠান খোঁজ করতে—ব্যাপার কি?

সব শুনে মৌলবী সাহেব বললেন, 'দাও বাপু ওকে পাঠিয়েই দাও—চেঁচিয়ে মাথা ধরিয়ে দিলে একেবারে। এমন করলে কাজ করব কি ক'রে?

কিন্তু মুন্সী সে অনুমতি নিয়ে বাইরে আসার আগেই বাইরে রীতিমতো শোরগোল পড়ে গেল—

'শাহ্‌জাদা! শাহ্‌জাদা! শাহ্‌জাদা এসেছেন!'

শাহ্‌জাদা যদিচ সাধারণ পোশাকে, সিপাহী শাস্ত্রী না নিয়েই এসেছেন, এমন কি ঘোড়াও রেখে এসেছেন বহুদূরে—ফকীর দরবেশদের মেলায় এলে এমনি ভাবেই আসেন তিনি বরাবর—তবু তাঁকে এতবড় মেলায় কেউ চিনতে পারবে না—তা সম্ভব নয়।

মুন্সীর কানেও সে রব পৌঁছেছিল বৈকি। তাই বেরিয়ে এসে মেয়েটিকে পাঠাবার কথা আর তাঁর মনে রইল না, তিনিও আভূমি-নত হয়ে কুর্নিশ করতে করতে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলেন বাদ্‌শাজাদাকে অভ্যর্থনা জানাতে।

'আসুন আসুন, শাহ্জাদা আসুন। কী ভাগ্য আমাদের!'

শাহ্জাদা মুইজুদ্দীনও প্রসন্ন বরাভয়ের হাসি হেসে এগিয়ে আসছেন—হঠাৎ মেয়েটি একেবারে বিদ্যুৎবেগে পথ আগলে দাঁড়াল।

'কখনও না। আমার বেলা কত বড় বড় কথা বেরোচ্ছিল, অনেক নিয়ম-কানুন শুনছিলাম, শাহ্জাদা আসতেই সব উল্‌টে গেল একেবারে! শাহ্জাদাই হোন আর যে-ই হোন, আমার পরে আসতে হবে।'

শাহ্জাদা ভ্রূকুটি ক'রে তাকালেন। চোখে চোখে মিলল। ভ্রূকুটি মিলিয়ে গেল তাঁর।

অপূর্ব সুন্দরী, তন্বী ছিপছিপে একটি মেয়ে, আয়ত চোখে তার আবেশ নয়—বহ্নি! রোষরক্তিমা তার গুলাবী-বর্ণে আরও দীপ্তি এনে দিয়েছে, ক'রে তুলেছে আরও মোহনীয়।

মেয়েটার ধৃষ্টতায় উপস্থিত সকলেরই চোখ কপালে উঠেছে। ওর গর্দান তো যাবেই—আর যাওয়াই উচিত—তাদেরও না সেই সঙ্গে যায়! শাহ্জাদা না মনে করেন তারাও ওর সঙ্গের লোক। একজন তো নিজের গলাটায় একবার হাত বুলিয়ে নিল—অধিকাংশই খানিকটা ক'রে সরে দাঁড়াল, বেশ একটা ব্যবধান রচনা ক'রে।

মুন্সীও ঘেমে উঠেছেন এই কল্পনাতীত গুস্তাকীতে।

'কী বলছ বহন! ইনি যে শাহ্জাদা!'

'শাহ্জাদা তো কী হয়েছে। বাদশা হ'লেও আমি যেতে দিতুম না! নিয়ম যা তা সকলের পক্ষেই নিয়ম। আমাকে তখন অত কথা বলেছিলেন কেন? আমিও তো বেশী টাকা দিতে চেয়েছিলাম। কত টাকা দেবেন শাহ্জাদা? আমি তার দুনো দেব!'

এই অসহনীয় ধৃষ্টতায় শাহ্জাদার বন্ধুরা চঞ্চল হয়ে উঠলেন। ইয়ার জঙ্ কোমরের তলোয়ারে হাত দিলেন, গোলাম আখ্‌তার ভীষণ ভ্রূকুটি ক'রে এগিয়ে এলেন। ইমাম আলি শুধু পিছন থেকে চুপিচুপি শাহ্জাদার কানে কানে বললে—'এ-ই সে নাচওয়ালী আলিজা, যার কথা বলেছিলাম আপনাকে।'

সে সংবাদ শোনবার আগেই শাহজাদা আকৃষ্ট হয়েছেন। তিনি হাতের ভঙ্গীতে গোলাম আখ্‌তারকে নিবৃত্ত ক'রে মধুর হেসে এগিয়ে এলেন দু'পা। মিষ্টকণ্ঠে বললেন, 'আচ্ছা, সে ঝগড়া আমি করব না। কিন্তু বাদ্‌শাজাদার আগে ভেতরে যেতে চাইছ, তোমার পরিচয় কি? নাম?'

এবার চোখটা একটু নামাল সে। ঈষৎ যেন সঙ্কোচও প্রকাশ পেল কণ্ঠস্বরে,

তবু সে সতেজেই জবাব দিল—

'নাম পরিচয় জেনে কি হবে জনাব? ধরুন আমি পথের ভিখিরী। কিন্তু তা হ'লেও আমার প্রাপ্যের দাবি আমি ছাড়ব কেন?'

'না, এমনি। আমার দাবি আমি যাকে ছেড়ে দিচ্ছি তার নামটাও জানব না?'

মেয়েটির শুভ্র মুখে এবার আর এক রকম রক্তিমাভা খেলে গেল। এবার রোষ নয়—লজ্জা। সে ধীরে ধীরে জবাব দিল, 'আপনার এ বাঁদীর নাম লাল কুঁয়র, লালীও বলে কেউ কেউ। আমি সামান্য এক নাচওয়ালী!'

ওর কপোলের সুগৌর শুভ্রতার সঙ্গে লালিমার যে অপরূপ খেলা চলছিল, সেই দিকে মুগ্ধ নেত্রে তন্ময় হয়ে চেয়ে ছিলেন শাহ্‌জাদা। এবার হেসে বললেন, 'বিনয় ক'রে বাঁদী ব'লে পরিচয় দিয়েছ—পাঁচজনের সামনে, সেই-মতো যদি তোমাকে এখন দাবি করি পিয়ারী?'

তারপর উত্তরের অপেক্ষা না ক'রেই অপেক্ষাকৃত গম্ভীর ভাবে বললেন, 'বেশ তো—এত বিবাদের কি আছে? চলো না আমরা একসঙ্গেই যাই মৌলবীজীর কাছে। কারুরই অপরের কাছে দাবি ছাড়বার দরকার নেই।'

লাল কুঁয়র এইবার মাথা নত ক'রে অভিবাদন জানাল, 'আপনিই আগে চলুন জনাবালি!'

মৌলবী আল্লাবক্স সাহেব বহুক্ষণ চেয়ে রইলেন নর্তকীটির মুখের দিকে। হাতখানাও দেখলেন একবার। তারপর বললেন, 'তোমার ভাগ্য দেখা আমার হয়ে গেছে বহিন! বলো এবার কি জানতে চাও?'

'আপনি তো সবই জানেন। মন বুঝেই উত্তর দিন!'

'ও, আমাকে পরখ করতে চাও?' হাসলেন আল্লাবক্স। তারপর বললেন, 'হ্যাঁ হবে, যা তুমি চাও, তা পাবে। বাপ-মা আত্মীয়-স্বজন, নিরাপদ নিশ্চিন্ত জীবন, সব কিছু ত্যাগ ক'রে এই দীর্ঘকাল সাধনা করেছ যার জন্যে—তা মিলবে তোমার। দীন-দুনিয়ার মালিক তামাম হিন্দুস্থানের কোন বাদ্‌শা তোমার পদানত হবেন। আমি জেনেশুনেই বলছি শাহ্‌জাদা,—জ্যোতির্বেত্তার অপরাধ ক্ষমা করবেন। তুমি সেই সাম্রাজ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলবে। উচ্চপদস্থ লোককে টেনে নামাবে তার সম্মানের আসন থেকে। আর যারা পথের ভিখিরী তাদের তুলে বসাবে রত্ন-আসনে। কুকুরকে যেমন ক'রে উচ্ছিষ্ট হাড়ের টুকরো দেওয়া হয় তেমনি অনায়াসে রাজ্যখণ্ডও তুমি বকশিশ করবে লোককে। মণিমুক্তা বিলোবে মুঠো

মুঠো। তুমি জাহান্নমে যাবে আর সেই সঙ্গে টেনে নিয়ে যাবে তোমার বাদ্‌শা-কেও। তোমাকে বরণ ক'রে চরম সর্বনাশকেই বরণ করবেন তিনি। তবে একটা কথা—তুমি যা চাও, এতকাল যা চেয়েছ তা পাবে, কিন্তু ক্ষণকালের জন্য। তোমার স্বভাবের দোষেই আবার তা হারাবে তুমি। মাত্র—'

লাল কুঁয়র মৌলবী সাহেবের মুখের কাছে দুই হাত তুলে, যেন তাঁর মুখ চেপে ধরবার ভঙ্গিতেই বললে, 'থাক থাক মৌলবীজী, সে খবর না শুনলেও চলবে! কতকাল ভোগ করব তার জন্যে আমি মোটেই ব্যস্ত নই। আশা যদি আমার সফল হয়—একদিনের জন্যে হ'লেও আমি খুশী। শেষের খবরটা আর আগে থাকতে না-ই শুনলুম!'

'বেশ। তাই হোক!'

আল্লাবক্স এবার শাহ্‌জাদার দিকে ফিরলেন।

'আপনার ভাগ্য কি এই মেহ্‌রারুর সামনেই গণনা করাবেন শাহ্‌জাদা?'

'খুশিসে। এই মেহ্‌রারুকে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই—শুধু দিল নয়—জিন্দিগীও দিয়ে দিয়েছি যে! এখন থেকে আর আমার জানও আমার নয় মৌলবীজী!'

একটু হাসলেন আল্লাবক্স। উন্মাদ দেখেশুনে আগুনে হাত দিতে যাচ্ছে দেখলে মানুষ যেমন হাসে, ছোট ছেলেমেয়েদের ছেলেমানুষীতে যেমন অভি-ভাবকরা হাসে—তেমনি।

তারপর গলা নামিয়ে বললেন, 'যা জানতে চান তা বলছি। তখৎ-এ-তাউস আপনি পাবেন। দৈবাৎ পাবেন, আপনার গ্রহসংস্থান অনুকূল বলে। আপনার চেয়ে যারা যোগ্যতর তারা হারবে এবং মরবে—শুধু অদৃষ্টের জন্য! কিন্তু তখ্‌ৎ আপনি রাখতে পারবেন না জনাব। এক স্ত্রীলোক আপনার সর্বনাশের মূল হবে, সে-ই টেনে নিয়ে যাবে আপনাকে জাহান্নমের দিকে। শুধু সে আপনারই সর্ব-নাশের হেতু হবে না শাহাজাদা, সমস্ত মুঘল বংশের সর্বনাশের হেতু হবে সে। সে ঐ তখ্‌ৎ-এ তাউসকে এমন নিদারুণ পঙ্ককুণ্ডে নিক্ষেপ করবে যে—তা থেকে আর কেউ টেনে তুলতে পারবে না সে তখ্‌ৎ! সাবধান জাহাঁপনা!...পুরুষকার দৈবকেও লঙ্ঘন করে মধ্যে মধ্যে—এখন থেকে সতর্ক হোন। নিজেকে সংযত করুন। স্ত্রীলোকের মোহ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখুন।'

'যথেষ্ট মৌলবীজী!...শুধু আর একটা কথা বলুন দেখি, এখন—এই মুহূর্তে যে স্ত্রীলোকটির চিন্তা আমার মনকে আচ্ছন্ন ক'রে আছে—তাকে আমি পাব কি না!'

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আল্লাবক্স বললেন, 'পাবেন! সে-ই আপনার নিয়তি!'

'ব্যস !···সে হুরী এসে যদি আমার হাত ধরে, চোখ বুজেই তার সঙ্গে চলব মৌলবী, সে বেহেস্তেই নিয়ে যাক—আর জাহান্নমেই নিয়ে যাক। তার তখ্‌ৎ সে নামিয়ে পাঁকে ফেলে তাও ভাল। শুধু আজ থেকে আমরণ সে যেন আমার পাশে থাকে !'

'থাকবে, তা থাকবে।' দৈববাণীর মতোই যেন কোন্ দূর থেকে বলেন আল্লাবক্স। তেমনি নির্মম শোনায় তাঁর কণ্ঠস্বর।···

জেব থেকে রুমালেবাঁধা মোহর জ্যোতিষীর সামনে রাখলেন বাদ্‌শাজাদা মুইজুদ্দীন। লাল কুঁয়রের মোহরের ওপরই পড়ল সেগুলো, ঈষৎ শব্দ ক'রে। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে লাল কুঁয়রের দিকে চেয়ে গাঢ়কণ্ঠে ডাকলেন, 'পিয়ারী !'

'আপনার বাঁদী শাহ্‌জাদা !' মধুর কণ্ঠে জবাব দিল লালী।

বুনো পাখী বুঝি তার মনের মতো খাঁচা খুঁজে পেয়েছে।

॥ চার ॥

১৭১৩ খ্রীষ্টাব্দের একটি অন্ধকার শীতার্ত রাত্রি। একে পৌষ মাস তায় কয়েকদিন ধরে অবিশ্রান্ত বর্ষণ গেছে—হাড়ভাঙা শীত চারিদিকে। আকবরাবাদ থেকে সোজা যে শাহী সড়কটি দিল্লি পর্যন্ত গেছে—সেই প্রশস্ত রাজপথেরও কোথাও কোন জনমানবের চিহ্ন নেই।

তবু, পরাজিত আশাহত সম্রাট জাহান্দার শাহ্‌ সে-পথে যেতে সাহস পান নি। এই কিছুক্ষণ আগেই প্রচণ্ড যুদ্ধে তিনি পরাজিত হয়েছেন। হয়তো এখনো সম্পূর্ণ সর্বনাশ হয় নি তাঁর। হয়তো এখনও কোথাও আশ্রয় পেলে আর একবার তিনি যাচাই করতে পারেন ভাগ্যকে। কিন্তু সে দূরের কথা। এখন তিনি পলাতক মাত্র। তাই তিনি যাচ্ছিলেন লোকালয় এড়িয়ে একটি 'বহল' বা বয়েল গাড়িতে চড়ে মাঠ ভেঙে—ক্ষেতের মধ্য দিয়ে। শাহী সড়ক বাদ্‌শাহেরই সড়ক, আজ বিকেল পর্যন্ত এই সড়কের তিনিই মালিক ছিলেন। আজও হয়তো আইনত তিনিই মালিক—তবু সে পথে উঠতে সাহস হচ্ছে না তাঁর। রাজপথ আজ রাজার অগম্য। মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগেও তাঁর পিছনে ছিল লক্ষ সৈন্য। আর এখন—একমাত্র সেবক এই আজম খাঁ ভরসা।

হ্যাঁ, আরও একজন আছে বৈকি, তাঁর পিয়ারী লাল কুঁয়র।···জাহান্দার শা ওরই মধ্যে আর একটু গা ঘেঁষে বসলেন তাঁর প্রেয়সীর।···আর কাউকে তাঁর দরকার নেই। লাল কুঁয়র থাকলেই বেহেস্ত্‌ও রইল তাঁর হাতের মুঠোয়। এই তো, অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে আসতে আসতে নিজের কানেই তিনি

শুনলেন—তাঁরই একজন প্রজা বলছে, 'জাহান্দার শা সত্যিকারের বীর ছিলেন। শুধু ঐ বাঁদীটা—নাচউলীটার পাল্লায় পড়ে আজ তাঁকে হিন্দুস্তানের তখ্‌ৎ হারাতে হ'ল।'…হিন্দুস্তানের তখ্‌ৎ হারাতে হ'ল কিনা তা এখনও তিনি জানেন না—কিন্তু হ'লেও দুঃখ নেই। লাল কুঁয়রের জন্য তিনি তামাম হিন্দুস্তান কেন—সত্যিকারের দুনিয়ার বাদ্‌শাহীও হারাতে রাজী আছেন। ওকে ছেড়ে বেহেস্তেও লোভ নেই তাঁর।

'উঃ!' অস্ফুট একটা আর্তনাদ ক'রে উঠলেন লাল কুঁয়র। বেগম ইমতিয়াজ মহল।

'কি হ'ল পিয়ারী? লাগল?'

'আর পারি না। এই শক্ত গাড়ি আর এই ঝাঁকানি। সারা গা আড়ষ্ট হয়ে গেল!'

'তাই তো!' কষ্ট জাহান্দার শাহেরও কিছু কম হচ্ছিল না। কিন্তু জাহান্দার শা যোদ্ধা, কিছুকাল আগেও নিয়মিত লড়াই এবং কুচকাওয়াজ করেছেন। ঘোড়ার পিঠে একাদিক্রমে আটপ্রহর কাটানোও তাঁর অভ্যাস আছে। গোরুর গাড়ির এই ঝাঁকানি তাঁর কাছে এমন কিছু কষ্টকর নয়। কিন্তু লাল কুঁয়রের কথা যে আলাদা। ননীর মতো নরম ওঁর শরীর। বাদ্‌শা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। আজম খাঁকে ঈষৎ ঠেলা দিয়ে বললেন, 'মহম্মদ মিয়া, গাড়িটা কোথাও একটু দাঁড় করালে হয় না? পিয়ারীর বড় কষ্ট হচ্ছে!' ওর জন্যে কোন ঝুঁকি নিতেই তিনি পিছ্‌পা নন। সত্যি কথা বলতে কি—সাম্রাজ্যের ওপর আজ আর খুব লোভ নেই তাঁর। যা কিছু করেছেন এই সিংহাসন বাঁচিয়ে রাখতে—তা তো লাল কুঁয়রেরই জন্য!

আজম খাঁয়েরও কষ্ট কম হচ্ছিল না। কারণ সে খানসামা হ'লেও বাদ্‌শারই খানসামা—আজ সে নিজেই ছোটখাটো একটা জায়গীরের মালিক। তবু ওরই মধ্যে বসে বসে সে একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়েছিল। সে ঈষৎ বিরক্ত কণ্ঠে বললে, 'এখানে কোথায় দাঁড় করাবো বলুন, এই মাঠের মধ্যে!'

জাহান্দার শা মুগ্ধ বটে, নির্বোধ নন। আজম খাঁয়ের বিরক্তি তাঁর কাছে গোপন রইল না। তিনি এবার অন্য পথ ধরলেন, 'কিন্তু আমারও যে বড় পিপাসা পেয়েছে মহম্মদ মিয়া, একটু জল না খেয়ে আমি তো পারছি না!'

লাল কুঁয়র নিজেই এবার মৃদু ধমক দিলেন, 'কী হচ্ছে আদিখ্যেতা তোমার! এখন যত তাড়াতাড়ি কোন নিরাপদ জায়গায় পৌঁছনো যায় ততই তো ভাল!'

'না না। তুমি কোথাও একটা কারুর ঘরবাড়ি দেখে গাড়ি দাঁড় করাও মহম্মদ মিয়া। একটু জল খেয়ে হাত-পা একবার ছাড়িয়ে নিই।…ঐ যে একটা আলো দেখা যাচ্ছে না?…ঐখানে বোধ হয় গাঁ আছে একটা।'

সত্যিই একটা আলো দেখা যাচ্ছিল। এরা কেউ লক্ষ্য করে নি। আজম খাঁ অত্যন্ত অপ্রসন্ন মুখে গাড়োয়ানকে সেই দিকে গাড়ি চালাতে বললে। অনেকটা ঘুরেই যেতে হ'ল—ওদের পথ যেদিকে সেদিকে নয়—অযথা খানিকটা দেরি। কী আর করা যাবে—'বাদ্‌শা'র হুকুম!

গাঁ নয় ঠিক—গাঁয়ের বাইরেই ঘরটা, যেখানে আলো জ্বলছিল। আজম খাঁ আশ্বস্ত হ'ল খানিকটা। বাদ্‌শাকে এ অঞ্চলের অনেকেই দেখেছে।… দেখলেই চিনতে পারবে। তারপর? বকশিশের লোভে কী না করতে পারে মানুষ? বিজয়ী ফররুখশিয়ারের কাছে ধরিয়ে দিতে পারলে অনেক হাজার টাকা ইনাম মিলবে। কাল সকালে যত তাড়াতাড়ি হোক্ হাজাম ডেকে বাদ্‌শার দাড়িগোঁফ-মাথা কামিয়ে দেওয়া দরকার। চট্ ক'রে যাতে মেয়েছেলে সাজিয়েও অন্তত নিয়ে যাওয়া যায়।

আজম খাঁর চিন্তাস্রোতে বাধা পড়ল।

গন্তব্যস্থানে তারা এসে গেছে। গাড়ি থেকে আগেই নেমে পড়েছেন সম্রাট। সেই নিশীথ রাত্রের আলেয়ার-আলোজ্বলা বাড়িটায় তাঁরা পৌঁছে গেছেন বুঝি—

বাড়ি নয়, নিতান্তই কুটির! খাপরার চাল, খান দুই মেটে ঘর। সামান্য একটু বেড়া দেওয়া উঠোনের মতো। ওধারে বোধ হয় আরও ঘর ছিল, মাটির চওড়া দেওয়ালগুলো ভেঙে পড়ে আছে। উঠোনেরই এক কোণে ভাঙা চারপাই একখানা পড়ে রয়েছে—তার নিচে একটা কালো কুকুর শুয়ে। কুকুরটা গাড়ির আওয়াজ পেয়ে সমানে চেঁচিয়ে যাচ্ছে।

ঘরের দু'টি মাত্র অধিবাসী ওদের চোখে পড়ল। একটি তরুণ এবং একটি কিশোরী। সম্ভবত স্বামী-স্ত্রী। ঘরের দাওয়াতে চেরাগ জেলে বসে এত রাত পর্যন্ত ওরা দশ-পঁচিশ খেলছিল। অন্তত ওঁদের তাই মনে হ'ল। হঠাৎ এমন সময় এদিকে একখানা বয়েলগাড়ি আসতে দেখে বিস্মিত হয়ে উঠে এসে দাঁড়িয়েছিল, এখন সশস্ত্র আজম খাঁ ও জাহান্দার শা'কে গাড়ি থেকে নামতে দেখে ওদের মুখ শুকিয়ে উঠল।

আজম খাঁ এক লহমায় অবস্থাটা বুঝে নিল। সেই ক্ষীণ আলোতেও ওদের

মুখভাব তার চোখ এড়ায় নি। সে তাড়াতাড়ি গিয়ে বলল, 'আমরা রাহী, এই পথে যাচ্ছিলুম—বড় তেষ্টা পেয়েছে। একটু জল খাওয়াতে পারো নওজওয়ান?'

ততক্ষণে লাল কুঁয়রও নেমে পড়েছেন। তাঁকে দেখে মেয়েটি একটু আশ্বস্ত হ'ল। তাড়াতাড়ি ছুটে তাঁর হাত ধরে এগিয়ে নিতে এল—'আসুন, আসুন বাইসাহেবা, বসুন।' সে নিজে যে চাটাইটায় বসে এতক্ষণ খেলছিল, সেই চাটাইতেই ওঁকে বসাল।

চাষীর মেয়ে, ধুলোর মাঝে মানুষ। রঙ্গীন ঘাঘরা আর কাঁচুলি যৎপরোনাস্তি ময়লা। হাতেও ধুলোকাদার অভাব নেই। মেয়েটি এসে হাত ধরাতে ঘৃণায় কি লাল কুঁয়র শিউরে ওঠেন নি?···উঠলেও মুখে তা প্রকাশ পেল না। অতিরিক্ত মনের জোরে প্রশান্তমুখে হাসি ফুটিয়ে ওর সঙ্গে এসে বসলেন সেই চাটাইয়ের উপরেই। ভেলভেটের শালোয়ার তো তাঁর আগেই বয়েলগাড়িতে ময়লা হয়েছে—তার ওপর আর মায়া নেই।

ছেলেটি ততক্ষণে ঘর থেকে একটা চারপাই এনে উঠোনে পেতে দিয়েছে। পুরুষদের বসবার জন্যে।

মেয়েটি আগের মতোই নিচু গলায় বললে, 'আগুন করব একটু?'

'না না বহিন, কিছু দরকার নেই। তোমার মরদকে বল শুধু একটু জল তুলে দিক্।'

'মরদ' অর্থাৎ সেই ছোকরাটি তার আগেই লোটা বার ক'রে মাজতে বসে গিয়েছে। ঐ মাজা লোটা কাদাসুদ্ধ দড়ি বেঁধে ডুবিয়ে দেবে কুয়ায়। প্রথম যে জল উঠবে তাতেই ধোবে তার মাটি। তারপর আবার ডুবিয়ে তুলবে পানীয় জল।···এই এ দেশের দস্তুর! আজম খাঁ তা জানে। সে চুপ ক'রেই রইল। সম্রাটের অত লক্ষ্য নেই, তিনি সেই সঙ্কীর্ণ খাটিয়াতেই এলিয়ে প'ড়েছেন তখন। আফিংয়ের কৌটোটা 'জেব'-এই ছিল ভাগিস। নেশাটা বেশ চড়েছে এখন।

লাল কুঁয়র এতক্ষণে মেয়েটির দিকে ভাল ক'রে তাকাবার অবকাশ পেয়েছেন। পনেরো-ষোল বছর বয়স হবে—কিন্তু একেবারেই চাষীর ঘরের মেয়ে বলে বোধ হয় না। অদ্ভুত, আশ্চর্য, সুন্দরী। বাদ্‌শার হারেমেও অগ্রগণ্য হবার মতো রূপ এর। ওর স্বামীর দিকে আড়ে দেখলেন। বলিষ্ঠ সুশ্রী চেহারা—কিন্তু সে সাধারণ। নিতান্তই সাধারণ। এদেশে এমন চেহারা হামেশাই চোখে পড়ে—পথে মাঠে ঘাটে। এ মেয়ের পাশে দাঁড়াবার মতো নয়—

লাল কুঁয়র মুগ্ধ চোখে চেয়ে হেসে বললেন, 'এত রাত অবধি দশ-পচিশ

খেলছিলে তোমরা ? ভোরের তো খুব বেশী দেরি নেই !'

'তাই নাকি ? কে জানে !' দীর্ঘ পক্ষ্মঘেরা পদ্মপলাশের মতো চোখ দুটি মেলে আকাশের দিকে চায় সে। তারপর আরও ফিস্‌ ফিস্‌ ক'রে বলে, 'বুড়ী শাস আছে যে। দিনের বেলায় তো মরদের সঙ্গে কথাই কওয়া যায় না ! তা'ছাড়া খেলতে দেখলে তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে একেবারে।...বুড়ী ঘুমোলে তবে তো খেলতে বসি !'

'আর বুড়ী যদি উঠে পড়ে হঠাৎ—?'

কৌতুকের ছোঁয়াচ লাগে বুঝি লাল কুঁয়রের দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মনেও।

'ও...সে ভয় নেই। সে ভোরের আগে ওঠে না। উঠলেও আগে তো একদণ্ড কাশবে খক্‌খক্‌ ক'রে। সে-শব্দ পেলেই দীয়া নিভিয়ে আমরা শুয়ে পড়ব !'

ততক্ষণে ছেলেটি বড় লোটা ভ'রে জল নিয়ে এসেছে।

'কে জল খাবেন ?'

মেয়েটি চোখের নিমেষে উঠে দাঁড়ায়।

'দাঁড়াও, শুধু জলটা খাবেন !...তাই তো, ঘরেও তো কিছু নেই। ...গুড় আছে একটু। এ-বছরের নতুন আখের তাজা গুড়।...খাবেন ?'

'গুড় ?' হঠাৎ সম্রাট হা হা ক'রে হেসে উঠলেন।

'তা মন্দ কিহে মহম্মদ মিয়া ! কখনও তো খাই নি।...খেয়েই দেখি। শরবতের কাজ করবে।'

'আপনাদের কি খিদে পেয়েছে ? ঘরে অবিশ্যি কিছুই নেই। ভুজা আছে কিছু কিছু—মকাই, চানা। খেতে পারবেন ?...যদি একটু অপেক্ষা করেন, গম ভেঙ্গে আটা বার ক'রে রুটিও ক'রে দিতে পারি।'

'না, না, দরকার নেই। জলই দাও—'

লাল কুঁয়র হাত পেতে বসেন। মেয়েটা ঘরের ভিতর থেকে মুঠি গুড় এনে কয়েকটা ক'রে দেয় পুরুষদের হাতে। ওড়নায় মুখটা ঈষৎ ঢেকে নিয়েছিল সে ইতিমধ্যে—তবু জাহান্দার শা'হের লুব্ধ চোখ জ্বলে ওঠে। গুড় মুখে ফেলে তিনি ব'লে ওঠেন, 'বাঃ !' কিন্তু সে হয়তো শুধু গুড়ের জন্যও নয়।

সকলের জল খাওয়া শেষ হ'তে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হ'লেন এঁরা। মেয়েটি হঠাৎ বলে ওঠে, 'দাঁড়ান একটু। ঘরে আর তো কিছুই নেই, একটু দুধ খেয়ে যান অন্তত।'

'দুধ ? দুধ কোথা পাবে বাছা এত রাত্রে ?' লাল কুঁয়র বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করেন।

'ঐ যে—' গোরুটার দিকে দেখায় সে।

তারপর স্বামীকে বলে, 'ওগো, দাও না একটু দুধ দুয়ে—।'

'দেরি হয়ে যাচ্ছে।' আজম খাঁ মনে করিয়ে দেয়।

সম্রাট ফিস্ ফিস্ ক'রে বলেন, 'না হে। দিচ্ছে, একটু খেয়েই নাও। আবার কখন যে কোথায় কি জুটবে তা তো জানো না।'

ছেলেটি ততক্ষণে গোরুটাকে ঠেলে তুলে বাছুর ছেড়ে দিয়েছে। মেয়েটি ওর কাছাকাছি ভাঙা চারপাইয়ের একটা খুরোর ওপর আলোটা বসিয়ে অন্ধকারেই ঘরে ঢুকল। একটু পরে বেরিয়ে এল ময়লা একটা ছেঁড়া ন্যাকড়াতে চারটি 'ভুজা' এবং কয়েক ডেলা গুড় বেঁধে নিয়ে। সোজা এগিয়ে এসে গাড়োয়ানের হাতে দিয়ে বললে, 'গাড়িবান্ ভেইয়া, এ'টা তোমার কাছে রেখে দাও। ভুখ্ লাগে তো খেয়ো।'

গাড়োয়ান সাগ্রহেই নিল হাত পেতে। ইতিমধ্যে তার বয়েল দুটোকেও ডাবা ভরে জল দিয়ে গেছে ছোকরা। বড় ভাল শানদার ছেলেমেয়ে এরা। খোদা এদের সুখে রাখবেন।...

লাল কুঁয়র এগিয়ে এসে মেয়েটির কাঁধে হাত রাখলেন। চুপিচুপি বললেন, 'এমন খুবসুরৎ মেয়ে তুমি। বাদ্‌শার হারেমেই তোমাকে মানায়। এখানে এই চাষীর ঘরে মিছিমিছি কষ্ট পাচ্ছ !'

'কষ্ট কি ?...কষ্ট তো কিছু না। আমি বেশ আছি। আমাদের যা জমি সব যদি আবাদ করি তো রাজার হালে চলে যায়। মরদ তো ইচ্ছে ক'রেই কিছু করে না।—কষ্ট ক'রে ফসল ঘরে তুলি আর জাঠ লুটেরারা এসে লুটে নিয়ে যায়।...বাদ্‌শা ! বাদ্‌শা যদি বাদশার মতো হতেন তো ভাবনা ছিল কি ! গরীব প্রজারা নিজেদের চাষের ফসল ইচ্ছামতো খেতে পায় না— তাঁরা অথচ বাদ্‌শাহী করেন !'

জাহান্দার শা এগিয়ে আসছিলেন, হয়তো কি বলতেনও। আজম খাঁ তাঁকে টেনে নিয়ে গেল গাড়ির দিকে। ইঙ্গিতটা জাহান্দার বুঝলেন। আর কথা কইলেন না। বোকার মতো আজম খাঁর মুখের দিকে চেয়ে একটু হাসলেন শুধু।

লাল কুঁয়র বললেন, 'তা তোমাদের চলে কিসে ?'

'কম কম চাষ করি। শুধু খাবার মতো। সবজী কলাই কিছু কিছু— যা লুটেরারা নিতে পারে না। গোরু ভঁইস্ মিলিয়ে ষোলটা ছিল আমার, তাও

ওরা নিয়ে গেছে। একটা বাছিয়া ছিল—বড় হয়ে দুধ দিচ্ছে, তাই খাই!'

'এত কষ্ট না ক'রে তুমি তো আরামেই থাকতে পারো। যাবে বাদ্‌শার হারেমে? আমার সঙ্গে চল, আমি ব্যবস্থা ক'রে দেব।'

'ছি ছি!' কঠিন হয়ে ওঠে মেয়েটির মুখ, 'ওসব কথা মুখে আনবেন না! হারেমে যায় এক রাজা-রাজড়ার ঘরের মেয়েরা, নবাবের মেয়েরা। আর যায় নাচওয়ালী কসবীরা, বাঁদীরা। আমি যাব কি দুঃখে! আমার মরদই আমার কাছে বাদশা বাই-সাহেবা!'

ভাগ্যে ততক্ষণে দুধ দুয়ে এনেছে ছেলেটি। নইলে লাল কুঁয়রের মুখের অপমান-রক্তিমা বোধ হয় সে চেরাগের আলোতেও ধরা পড়ত। কতকগুলো বড় বড় কী গাছের পাতাও ছেলেটা এনেছে যোগাড় ক'রে। ঠোঙার মত ক'রে পাতাগুলো ওদের হাত দিয়ে আলগোছে দুধ ঢেলে দিতে লাগল সে।

লাল কুঁয়র দুধ নিতে নিতে ভাল ক'রে তাকালেন ছেলেটির দিকে। ওর বয়সও বেশী নয়। কুড়ি-বাইশ হবে হয়তো। ওদের দেখতে দেখতে তাঁরও কি ভুলে-যাওয়া কোনো সুদূর অতীতের স্মৃতি মনে পড়ে যায়?

কোন ফেলে আসা কৈশোরের স্মৃতি?

যে বয়সে এবং যে-সময়ে সারারাত জেগে দশ-পঁচিশ খেলার কথাও অসম্ভব মনে হয় না?

তিনিই কি সুখী হয়েছেন বাদ্‌শার হারেমে পৌঁছে?

রাজ্যেশ্বর সম্রাট তাঁর পদানত। নুরজাহাঁর মতো হাতের মুঠোয় শুধু নয়—সত্যিই পায়ের তলায়। বীর যোদ্ধা আজ অমানুষ হয়ে গেছেন—তাঁরই জন্যে। তবুও কি সুখী আজ তিনি?

নুরজাহাঁই কি সুখী হ'তে পেরেছিলেন কোনদিন!···

গাড়ি তৈরী। অসহিষ্ণু আজম খাঁ তাড়া দেয়!

অকস্মাৎ এক কাণ্ড ক'রে বসলেন লাল কুঁয়র। নিজের গলা থেকে একটি মুক্তার মালা খুলে নেন। সাতনরী মালার একটি। অতিকষ্টে ছাড়িয়ে নেন।

তারপর মেয়েটির হাতে সেটা গুঁজে দিয়ে বলেন, 'এইটে রাখো বহিন। প'রো তুমি। তোমার গলাতেই মানাবে।···আমাকেও মনে পড়বে।'

মেয়েটি প্রবলবেগে ঘাড় নেড়ে হারটা আবার ওঁর হাতে ফিরিয়ে দেয়, 'পাগল নাকি, এসব নিয়ে আমরা কি করব? লোকে হাসবে আমার গলায় মতির মালা দেখলে।···একটা রুপোর হাঁসুলীই নেই।'

'তা হোক্। এমনিই রেখে দাও। মনে ক'রো না আমি তোমাকে যা-তা

জিনিস দিচ্ছি। ঝুটো নয়, আসল মতির মালা!'

'তবে তো আরও ভাল! লুটেরারা এতদিন শুধু মাল নিয়ে যেত—এবার আরও কোথায় কি আছে ভেবে জানেও মারবে। আগুনে ঝলসে ঝলসে মারে ওরা—বলে, খবর দাও কোথায় কি আছে! না, না, বাই-সাহেবা, এসবে আমার দরকার নেই। এসব আপনারাই বোঝেন, আপনাদের কাছেই এর কিম্মৎ। এ আপনি নিয়ে যান! অসময়ে এলেন, কিছু খাওয়াতে পারলুম না—সেইটেই আমার দুঃখ রইল। সকাল অবধি থেকে গেলে দু'খানা রুটি গড়ে খাওয়াতে পারতুম!'

লাল কুঁয়র খানিকটা অবাক হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর কী ভাবলেন কে জানে, একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'ঠিক বলেছ বহিন। কীই-বা কিম্মৎ এর—কয়েক হাজার টাকা হয়তো! তোমার উপযুক্ত নয়। তোমার যা আছে তা আমার ঘরে নেই!'

মেয়েটি হয়তো বুঝল ওঁর কথা—হয়তো বুঝল না। সে চুপ ক'রে দাঁড়িয়েই রইল। লাল কুঁয়র ধীরে ধীরে আবার বয়েলগাড়িতে গিয়ে উঠলেন। আলোটা কাছে থাকলে দেখা যেত—বহুকাল পরে ওঁর চোখের পাতা ভিজে উঠেছে।

সম্রাট দেখলে বিস্মিত হতেন বৈকি! লাল কুঁয়রের চোখে জল—এ যে অবিশ্বাস্য!

॥ পাঁচ ॥

আবার শুরু হ'ল সেই কষ্টকর, মন্থর যাত্রা। শুষ্ক কঠিন মাঠের ওপর দিয়ে, আল ডিঙিয়ে ধাক্কা খেতে খেতে চলেছে বয়েলগাড়ি। সে ধাক্কাতে এক একবার ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হচ্ছেন ওঁরা। আবার নিচে নামছেন। কখনও কখনও পরস্পরের গায়ে আছড়ে পড়ছেন সজোরে।

তবু ওঁদের কারুরই মুখে কোন কথা নেই। মহম্মদ মিয়া উৎকণ্ঠিত—বিপদ কখন কোথা দিয়ে আসে তার ঠিক নেই। সে তো যাবেই, তার জায়গীর বাড়ি ঘর ছেলেমেয়ে তিনটি বিবি—কিছুই বা কেউই থাকবে না হয়তো। কোনমতে এ বিপদ থেকে পরিত্রাণ পেলে এখন সে বাঁচে।

জাহান্দার শা?

তিনি বহুদিনই নিজের কথা নিজে ভাবা ছেড়ে দিয়েছেন। তাঁর প্রিয়তমার

নূপুর-শিঞ্জিত কমল-কোমল পা দুটিতে নিজের সমস্ত ইচ্ছা-অনিচ্ছা ভাবনা-চিন্তা, ইষ্ট-অনিষ্ট, ইহকাল-পরকাল সব কিছু সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছেন। এমন আত্মসমর্পণ তাঁর পূর্ব-পুরুষ—জাহাঙ্গীর বাদশা করেছিলেন বলে শুনেছেন। কিন্তু তাও বোধ হয় এতটা নয়। সেই প্রেয়সী পাশে বসে আছে—তাইতেই তিনি সুখী। তার পরের কথা আর এখন তিনি ভাবতে রাজী নন। তাছাড়া আফিং-এর নেশাও চড়েছে, কষ্ট যেটুকু হচ্ছিল, একটু দুধ খেয়ে নেবার ফলে সেটুকুও গেছে। তিনি এখন চমৎকার একটি তন্দ্রাচ্ছন্ন নিশ্চিন্ততার মধ্যে ডুবে আছেন।

লালকুঁয়রও ঠিক এই মুহূর্তে, এই শোচনীয় দুর্ঘটনা, এই হয়তো-বা সর্বনাশা পরাজয় আর তার অবশ্যম্ভাবী ফল—আসন্ন মেঘকজ্জল ভবিষ্যতের কথা ভাবছিলেন না। তাঁর মন চলে গিয়েছিল সুদূর অতীতে। অনেক, অনেকদিন আগেকার একটি অপরাহ্ণে। তিনিও এতক্ষণ একটা অভিভূত অবস্থায় ছিলেন—হঠাৎ ঐ মেয়েটির কথা তাঁকে যেন উন্মনা অস্থির ক'রে তুলেছে।

নুরজাহাঁ? হ্যাঁ, নুরজাহাঁ হ'তেই চেয়েছিলেন তিনি। আর সে সাধ তাঁর মিটেছে। মিটবে বলেছিল সেই জ্যোতিষীও। সেই সাংঘাতিক, নিষ্ঠুর জ্যোতিষী—ত্রিকালবেত্তা মৌলবী আল্লাবক্স সাহেব।

দেখতে দেখতে চোখের সুমুখ দিয়ে অতীতের ক'টা বছর পেরিয়ে চলে গেল। হজরৎ নিজামুদ্দীন আউলিয়ার দরগার বাইরে দরমার বেড়া দেওয়া ঘরে একটা চৌকির ওপর বোখারার কার্পেট বিছানো—তার ওপর বসে ছিলেন সৌম্য প্রৌঢ় একজন। মৌলবী আল্লাবক্স। তিনি বলেছিলেন, 'দীন দুনিয়ার মালিক তামাম হিন্দুস্তানের কোনো বাদশা তোমার পদানত হবেন। হ্যাঁ, পদানতই হবেন।...তুমি সেই সাম্রাজ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলবে। যারা পথের ভিখিরি তাদের তুলে রত্ন-আসনে বসাবে। কুকুরকে দেওয়া উচ্ছিষ্ট হাড়ের টুকরোর মতো রাজ্যখণ্ড বকশিশ করবে তুমি লোককে। মণিমুক্তো বিলোবে মুঠোমুঠো।...'

কিন্তু ঐখানেই যদি থামতেন তিনি!

তা থামেন নি। আল্লাবক্সের সামনে ঐ যে মেয়েটি বসে আছে তার পদ্ম-কোরকের মতো হাতখানি মেলে—তাকেও যেন চেনেন লালকুঁয়র। অনেক দিনের কথা: বহু অনাচারে, মদ্যপানে, তার চেয়েও বেশি—অহঙ্কারের চড়া নেশায়—চোখ আজ ঝাপসা হয়ে গেলেও, ওকে চিনতে পারেন বৈকি। ওর নাম ছিল লালী। তখনও ইমতিয়াজ মহলের জন্ম হয় নি। সেই সময়কার কথা।

ঐ লালীকে সম্বোধন ক'রে কঠিন কণ্ঠে আরও কয়েকটি কথা বলেছিলেন মৌলবী আল্লাবক্স সাহেব। রূঢ় মেঘমন্দ্রস্বরে ভয়ঙ্কর সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন তিনি। বলেছিলেন, 'তুমি জাহান্নামে যাবে আর সেই সঙ্গে টেনে নিয়ে যাবে তোমার বাদ্‌শাকেও।...আর একটা কথা, তুমি যা চাও তা পাবে কিন্তু সে ক্ষণকালের জন্য। তোমার স্বভাবের দোষেই আবার তা হারাবে তুমি।'

আরও কি বলতে যাচ্ছিলেন। হয়তো আজকের এই ভবিষ্যতটিকেই তিনি এঁকে দেখাতেন, কিন্তু সেদিনের অসহিষ্ণু, নির্বোধ লালীর তা শোনবার ইচ্ছা বা অবসর ছিল না। সে তাঁর মুখই চেপে ধরতে গিয়েছিল।

অথচ তা সবই তো ফলল। তাঁর প্রত্যেকটি কথাই। সেদিন যদি লালী তাঁর কথা শুনত, যদি এতটুকু সাবধান হ'ত—যদি সামান্য মাত্র সচেতন হ'ত নিজের আচরণ সম্বন্ধে—তাহ'লে হয়তো আজ লালকুঁয়রের অদৃষ্ট অমনভাবে সুতোয় বাঁধা অবস্থায় প্রজ্বলিত নরকাগ্নির ওপর ঝুলত না। অন্ধকার ভবিষ্যৎ এমনভাবে তার নগ্ন চেহারা নিয়ে ভয়ঙ্কর মুখব্যাদান ক'রে দাঁড়াত না সামনে এসে।

'পুরুষকার মাঝে মাঝে দৈবকেও লঙ্ঘন করে—এখন থেকে সতর্ক হোন্...' বলেছিলেন আল্লাবক্স ভাবী বাদ্‌শা জাহান্দার শা'কেও। কিন্তু সতর্ক তাঁরা কেউই হন নি।

এখনও সব যায় নি এটা ঠিক। এখনও হয়তো সময় আছে, এখনও কোন কোন সেনানায়ক, কোন কোন আমীর এসে আবার তাঁদের পাশে দাঁড়াতে পারে, হয়তো আর একবার ভাগ্য-পরীক্ষার অবসর মিলবে, হয়তো সে পরীক্ষায় আবারও চাকা উল্‌টে যাবে। কিন্তু—

কিন্তু—সে ভরসা যে আর নেই, তা নিজের মনের মধ্যেই কেমন ক'রে যেন বেশ বুঝতে পারছেন লালকুঁয়র। কারণ—সে ভরসার মূল পর্যন্ত তিনিই যে নষ্ট ক'রে দিয়েছেন। নিজের ভবিষ্যতের সমস্ত পথ নিজেই নষ্ট করেছেন বসে বসে। যেমনভাবে একদা তাঁরই সুরাফেনোন্মত্ত খেয়াল-খুশিতে লালকিলার প্রাসাদ-দুর্গ থেকে সুদূর জাহান-নুমার অরণ্য পর্যন্ত সমস্ত প্রাচীন বনস্পতিগুলিকে কেটে ফেলা হয়েছিল, একটির পর একটি, সেই ভাবেই। সেদিন হঠাৎ বুঝি মনে হয়েছিল ঐ অভ্রচুম্বী গাছগুলো তাদের সুবিশাল শাখা-প্রশাখা মেলে ওপর থেকে স্পর্ধিত অবজ্ঞায় তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে। কেউ ওপর থেকে তাঁকে দেখবে—এ চিন্তাও সেদিন ছিল অসহ্য। তাই বহুদিনের বহু

প্রাচীন বৃক্ষ—স্বর্গত বহু বাদ্‌শার দূরদৃষ্টি ও সৌন্দর্যপ্রিয়তায় বহু নিদর্শন—একদিনের মধ্যেই বিলুপ্ত হয়েছিল তাঁর হুকুমে। কারও স্পর্ধা সইতে পারবেন না তিনি—কী অন্তঃসারশূন্য স্পর্ধাই না তাঁর ছিল। এই তো একটু আগে সামান্য একটা চাষীর মেয়ে কি অনায়াসেই না সেই নিষ্ফল উদ্ধত স্পর্ধাকে ভূমিসাৎ ক'রে দিল। মাথা হেঁট ক'রে চলে আসতে হ'ল তাঁকে।

হ্যাঁ—আজ বেশ বুঝতে পারছেন। চোখ খুলে গেছে তাঁর—হয়তো বা এইমাত্র ঐ মেয়েটিই খুলে দিয়েছে—আজ বুঝতে পারছেন যে তাঁর ও তাঁদের বন্ধু কেউ নেই। আর তার জন্য দায়ী তাঁরাই। কতকগুলো অকারণ অর্থহীন খামখেয়াল—শ্রান্তিহীন মদমত্ততা—ঠেলে দূরে সরিয়ে দিয়েছে তাদের—যারা বন্ধু হ'তে পারত! আর সেই খেয়াল এভাবে নির্বিচারে চরিতার্থ ক'রেই কি সুখী হয়েছেন তিনি? মনে তো হয় না।

বেচারী বাদ্‌শা জাহান্দার শা। বীর, ধর্মভীরু, সহিষ্ণু বাদ্‌শা—হয়তো সত্যিকারের ভাল বাদ্‌শাই হ'তে পারতেন—যদি না এই মায়াবিনী ডাকিনীর কুহকে ভুলতেন। অন্ধভাবে প্রশ্রয় দিয়েছেন তিনি—অগ্রপশ্চাৎ, বর্তমান-ভবিষ্যৎ, ইহকাল পরকাল কিছু ভাবেন নি! যদি তিনি একটুও কঠোর হতেন! যদি তিনি ওর এই উন্মত্ততাকে একটু শাসন করতেন, তাহ'লে এই পাঁচমাসেই এমন ভাবে, এত কষ্টে অর্জিত, এত রক্তসমুদ্র পার হওয়া, এত প্রাণক্ষয়ের মূল্যে কেনা বাদ্‌শাহী এত সহজে এই শাহীসড়কের মাটিতে এসে পৌঁছত না। শাহীসড়কেই বা স্থান কৈ? প্রাণভয়ে সড়ক বাঁচিয়ে মাঠের ওপর দিয়েই তো চলেছেন তাঁরা। শশকের মতো মাটির আড়ালে আশ্রয় খুঁজছেন!

এই অভিশাপই তো দিয়েছিল একজন।

কে যেন দিয়েছিল?

সর্বাঙ্গ শিউরে মনে পড়ল কথাটা। রাজপুত্র মির্জা মহম্মদ করিম।

সে শিহরণ জাহান্দার শা নেশার আচ্ছন্নতার মধ্যেও টের পেলেন।

'কি হ'ল পিয়ারী? কি হ'ল?'

'কিছু না।'

'শীত করছে বোধ হয়? শিউরে উঠলে টের পেলাম যে!'

সস্নেহে ও সযত্নে জাহান্দার প্রিয়তমাকে বাহুবেষ্টনে টেনে নিলেন কাছে।

॥ ছয় ॥

চোখের ওপর থেকে বিস্মৃতির পর্দা দ্রুত সরে সরে যাচ্ছে। বাইরের জোনাকীজ্বলা অন্ধকারে অতীতের ইতিহাস যেন আরও স্পষ্ট, আরও উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে।

মির্জা মহম্মদ করিম। আজিম-উশ-শানের বড় ছেলে, বাহাদুর শার আদরের পৌত্র।

হ্যাঁ। এই তো মাত্র ক-মাস আগের কথা।

বেচারী সেদিনের আকাশে বাপের অদৃষ্টলিপি পাঠ করেছিল বোধ হয়। আর সেই সঙ্গে নিজেরও। তাই যুদ্ধ শেষ হবার আগেই সে পালাতে চেয়েছিল এই কুৎসিত ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব থেকে, এই মূঢ় আত্মকলহ থেকে, বহু—বহুদূরে কোথাও। কিন্তু পারে নি, অদৃষ্ট এসে পথ রোধ ক'রে দাঁড়িয়েছিল। অভিশাপ, এক নারীর অভিশাপ নিয়তির সর্পিল আকর্ষণে বেঁধে এনে নিক্ষেপ করেছিল—আর এক নিষ্ঠুরা, প্রতিহিংসাপরায়ণা নারীরই পদতলে—

এ গল্প শুনেছেন লালকুঁয়র তাঁরই এক দাসীর মুখ থেকে।

খুব বেশীদিনের কথা নাকি নয়। জাহান-নুমার বাদশাহী অরণ্যে শিকার করতে গিয়েছিলেন মহম্মদ করিম। শিকারে দারুণ নেশা ছিল তাঁর—সামনে শিকার পেলে কিছুই মনে থাকত না। সেদিনও এক বন্য বরাহের পেছনে দৌড়তে দৌড়তে সঙ্গী সাথী অনুচরদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বহুদূরে এগিয়ে গিয়েছিলেন—সে শিকার যখন অবশেষে নিহত হ'ল তখন দেখলেন তিনি একা পড়ে গেছেন। শ্রান্ত হয়ে ঘোড়া থেকে নেমে বিশ্রাম করছিলেন এক গাছ-তলায়। এমন সময়ে ঘুরতে ঘুরতে সেইখানেই এসে পড়েছিল রুস্তানা। যাযাবর বেদের মেয়ে, আর্মানী রক্ত বুঝি ছিল তার দেহে, তাই পরনের মলিন ঘাঘরা ও কাঁচুলি, স্বভাব-সুশ্রী সেই মেয়েটির রূপ ও যৌবন ঢাকতে পারে নি, সামান্য-ছাইচাপা প্রবল অগ্নির মতোই তা জ্বলছিল।

সে রূপে শাহজাদার তাতারী রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠবে, সে আগুনে পতঙ্গের মতো ঝাঁপ দিয়ে পড়তে চাইবেন—তাতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে?

মেয়েটি এসেছিল গোপনে চুরি ক'রে খরগোশ মারতে, আর জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করতে। কাজ সারাও হয়েছিল—কারণ, তার মাথায় কাঠের বোঝা,

পিঠের থলিতে দুটো মরা খরগোশ।

হঠাৎ সামনে করিমকে দেখে চমকে উঠেছিল সে, ভয় পেয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল। শাহ্‌জাদা বলে অবশ্যই চিনতে পারে নি, পারলে হয়তো ভয়ে মরেই যেত। এমনি তাঁর বেশভূষা ও আকৃতিতেই সে যথেষ্ট ভয় পেয়েছিল—যে-ই হোক, যদি বাদ্‌শাহী পাহারাদারদের হাতে ধরিয়ে দেয় তো তারা জ্যান্ত অবস্থাতেই কুকুর দিয়ে খাওয়াবে। সাধারণতঃ ওরা অরণ্যের এত গভীরে ঢোকে না, ধার থেকে কিছু কিছু ইন্ধন আর খাদ্য আহরণ ক'রে সরে পড়ে। শুধু মানুষ নয়—শ্বাপদ জন্তুর ভয়ও তো আছে! কিন্তু আজ একটু অন্যমনস্ক হয়ে পথ হারিয়ে ফেলেছিল সে, তাই কোথায় চলে এসেছে তা সে নিজেই জানে না!

ভয়ে দিশাহারা হয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল রুস্তানা, করিম অভয় দিয়ে ডাকলেন, 'এই ছোরী, শোন, এদিকে এসো। ভয় কি? কিছু ভয় নেই।'

সে মুগ্ধ-কণ্ঠে সত্যকার আশ্বাস ছিল বোধ হয়, মেয়েটি ফিরে এল। ভয়ে ভয়ে—তবু কাছেই এল শেষ পর্যন্ত।

'কী বলছ?'

'তুমি কে? এখানে কেন এসেছিলে? এখানে বাদ্‌শা আর শাহ্‌জাদারা ছাড়া কারুর আসবার হুকুম নেই তা জানো না? এমন কি ওমরাহ্‌রাও আসতে পারেন শুধু শাহ্‌জাদাদের সঙ্গেই—'

মাটির দিকে চোখ নামিয়ে রুস্তানা বললে, 'জানি। মাফ করো আমাকে। আমি অত বুঝতে পারি নি।...তাছাড়া আমি পথ হারিয়ে ফেলেছি।'

'ও, পথ হারিয়ে ফেলেছ? তাই নাকি!'

হো-হো ক'রে হেসে উঠলেন শাহ্‌জাদা।

'আমি সত্যিই পথ হারিয়ে ফেলেছি, বিশ্বাস করো। সেই থেকে কত খুঁজছি। সন্ধ্যে হয়ে এল, এর পর হয়তো বাঘে ধরবে। আমাকে—আমাকে দয়া ক'রে পথটা দেখিয়ে দেবে?'

সে থর-থর ক'রে কাঁপছে।

সুশ্রী, ভঙ্গুর, কোমল দেহলতা। দেহবল্লরী বলাই উচিত, এত কোমল ও ভঙ্গুর। ঐ শুকনো কাঠের বোঝাটাও যেন ওর পক্ষে বহন করা বিস্ময়কর।

'দেবো দেবো। একটু বসো। বোঝাটা এখানে নামাও না! বড্ড থকে গিয়েছি, সারাদিন পরিশ্রম ক'রে। একটু বসো, আমি যখন যাবো, তোমাকেও পথ দেখিয়ে দেবো। দেখেছ—ঐ দাঁতালো বুনো বরাটাকে আমি মেরেছি!'

'তাই বুঝি?'

চোখ দুটো বড় বড় ক'রে তাকায় রুস্তানা।

'বাপ রে! সাংঘাতিক বরা। সত্যিই তুমি মেরেছ?'

'হ্যাঁ। ঐ দেখ ওর গায়ে আমার তীর। দেখছ না, অমনি তীর আমার কাছে এখনও রয়েছে!'

তা বটে।

সপ্রংশস নেত্রে রুস্তানা তাকায় ওঁর দিকে। বলিষ্ঠ বীরের দেহ, সুশ্রী সুপুরুষ। হ্যাঁ—এঁর পক্ষে সম্ভব।

সে কাঠের বোঝাটা নামিয়ে সামনে বসে। শাহ্‌জাদার মিষ্ট কণ্ঠে আর অমায়িক ব্যবহারে তার ভয় ভেঙ্গে গেছে।

এদিকে মোহের ঘোর নিবিড় হয় শাহ্‌জাদার চোখে। ভয়ে আর পরিশ্রমের ক্লান্তিতে—হয়তো বা কিছুটা লজ্জাতেও—রুস্তানার মুখ রক্তাভ হয়ে উঠেছিল, সে লালিমা ওর সুগৌর কপোলে এখনও লেগে আছে। এখনও জড়িয়ে আছে ললাটের কোলে কোলে চূর্ণ কুন্তলের সঙ্গে একটি সামান্য স্বেদরেখা। ঈষৎ-উদ্ভিন্ন ওষ্ঠের ওপরেও মুক্তাবিন্দুর মতো ঘাম জমে আছে। উত্তেজনায় বুকটা উঠছে নামছে দ্রুত তালে—কাঁচুলির ওপর থেকেই তার সম্পদ মনে বিভ্রান্তি জাগায়।

শাহ্‌জাদা আর একটু কাছে সরে আসেন।

'তুমি তো বেদের মেয়ে, হাত দেখতে জানো?'

খিলখিল ক'রে হেসে উঠল সে।

'জানি বৈকি। কেন, তুমি হাত দেখাবে নাকি?'

'দ্যাখো না একটু—'

আর একটু কাছে সরে এসে ডান হাতখানা মেলে ধরেন শাহ্‌জাদা।

রুস্তানা ওঁর হাতখানা সরিয়ে দেবার চেষ্টা করে, 'সন্ধ্যে হয়ে আসছে, এ আলোতে কি দেখা যাবে?'

'যা পারো একটু দ্যাখো—'

শাহ্‌জাদা আবারও হাতখানা ওর চোখের সামনে তুলে ধরেন—ওর বুকের কাছাকাছি। ওর নিঃশ্বাস এসে পড়ে ওঁর হাতে—যৌবনের তপ্ত নিঃশ্বাস। সে নিঃশ্বাসের বাতাসে নেশা লাগে।

নিজের হাতে ওঁর হাতখানা আলোর দিকে তুলে ধরল রুস্তানা। আশ্চর্য, সারাদিন যাকে কাঠ কুড়িয়ে বেড়াতে হয় তার হাতও এত নরম? আর এত

উষ্ণ ? একটু আর্দ্র, বোধ হয় ঘামেই—কিন্তু তবু ঠাণ্ডা নয়। বরং বেশী গরম। গরম তুলোর স্পর্শ সে হাতে।

ওর হাত যখন দেখতে শুরু করে রুস্তানা, তখন একটু সকৌতুক হাসিই লেগে ছিল তার মুখে, কিন্তু হাত দেখতে দেখতে সে হাসি মিলিয়ে গেল, ক্রমশ বিবর্ণ হয়ে উঠল মুখ। হাতখানা নামিয়ে দিয়ে বললে, 'তোমার হাত আমি দেখব না—'

আলো কমে এসেছে, বনের মধ্যে ছায়া নামছে। তবু এত কম নয় যে ওর মুখ দেখতে পান নি শাহ্‌জাদা। তিনি সে মুখের সব পরিবর্তনই লক্ষ্য করেছেন। তিনি সজোরে ওর হাত সরিয়ে আবার নিজের হাত তুলে ধরলেন, 'না, বলো। বলতেই হবে তোমাকে।'

'বলব না আমি। হাত ভাল নয় তোমার! দেখব না ও হাত।'

'কোন ভয় নেই। খারাপ হ'লে খারাপই বলো। নির্ভয়ে বলো। অশুভ ভবিষ্যৎ শোনবার শক্তি আর সাহস আমার আছে।'

রুস্তানারও যেন জেদ চেপে যায়।

'না, আমি বলব না। এ কি জবরদস্তি নাকি ?'

'হ্যাঁ—ধরো তাই।'

'জানো আমি বেদের মেয়ে। আমরা সাংঘাতিক। আমাদের সঙ্গে জবরদস্তি করতে এসো না।'

'আর তুমি জানো আমি শাহ্‌জাদা ? এ বন আমার ঠাকুর্দার। এই কাছেই আমার রক্ষী আর পাহারাদাররা আছে। যদি তাদের ডাকি তোমার অবস্থাটা কি হবে জানো ?'

'তুমি—আপনি শাহ্‌জাদা ?'

আড়ষ্ট অবিশ্বাসভরা কণ্ঠে কোনমতে প্রশ্ন করে রুস্তানা।

'হ্যাঁ। আমি শাহ্‌জাদা মির্জা মহম্মদ করিম।...নাও, এখন যা বলি শোন—'

'আমার গোস্তাকি মাফ্ করবেন শাহ্‌জাদা। কিন্তু না শুনলেই ভাল হ'ত। কেন জিদ করছেন ?

'তবু শুনব—বলো তুমি।·· আমি সিংহাসন পাবো কোনদিন ? তখৎ-এ-তাউস ?'

'না। আপনার শিগগিরই মৃত্যুযোগ আছে। অপঘাত মৃত্যু, আর—আর এক নারী হবে আপনার মৃত্যুর কারণ।'

'নারী ? আওরৎ ?…ভাল ভাল।…বেশ শুনেছ তুমি, বা!'

জোর ক'রে হেসে ওঠেন মহম্মদ করিম। অবিশ্বাসের হাসি।

'মাফ্ করবেন শাহ্‌জাদা। আমি যাই। সন্ধ্যে হয়ে এল। এর পর একেবারেই পথ খুঁজে পাব না।'

'দাঁড়াও। সময় হ'লে পথ আমিই দেখাব।'

কেমন যেন রূঢ়, কর্কশ শোনায় শাহ্‌জাদার গলা।

তবুও রুস্তানা একটা পা বাড়িয়েছিল, কিন্তু তিনি ওর একখানা হাত ধরে আকর্ষণ করলেন নিজের দিকে। সবলে, সজোরে,—

'ও কি, ও কি করছেন। ছাড়ুন আমাকে, ছাড়ুন শাহ্‌জাদা। আপনার পায়ে পড়ি—'

মির্জা মহম্মদ করিম তাকে তখন ছাড়েন নি। ছাড়তে পারেন নি। রক্তে অভিশাপ আছে তাঁর। সেই অভিশাপই রক্তে নেশা জাগিয়ে তুলেছিল।…

তারপর অবশ্য নিজের ঘোড়ায় চাপিয়ে ওকে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন জঙ্গলের বাইরে পর্যন্ত। অন্তত পথ দেখিয়ে দেবার অধিকারটুকু চেয়েছিলেন। টাকাও দিতে চেয়েছিলেন অনেক। যতগুলি মোহর ওঁর জেব-এ ছিল, সব। কিন্তু রুস্তানা তাতে রাজী হয় নি। নমনীয় ভঙ্গুর দেহ সন্দেহ নেই—মনটা কিন্তু ইস্পাতের মতোই কঠিন। প্রথম বিস্ময়ের আঘাতটা সামলাতে যা একটু দেরি হয়েছিল, তারপরই সে আশ্চর্য রকম শান্ত হয়ে উঠল। সহজ ভাবেই কাঠের বোঝাটা উঠিয়ে নিলে মাথায়, খরগোশের থলেটাও আগের মতোই কাঁধে ফেলল। তারপর—মাথা নিচু ক'রে নয়—বরং সোজা সামনের দিকে চেয়েই এগিয়ে চলল নিজের পথে।

তবু মহম্মদ করিম খানিকটা এসেছিলেন সঙ্গে সঙ্গে, অপরাধীর মতোই ঈষৎ অপ্রতিভ ভাবে। আবারও কী একটা বলতে গিয়েছিলেন—বোধ হয় পথ দেখিয়ে দেবার কথাই—হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়েছিল সেই বেদের মেয়েটি, অবাস্তব রকম কোমল কণ্ঠে বলেছিল, 'আমাকে আর পথ দেখাতে হবে না জাহাঁপনা —পথ আপনি দেখিয়েই তো দিয়েছেন।…কিন্তু, কিন্তু—আপনার প্রয়োজনের সময় আপনি পথ খুঁজে পাবেন তো?…তখন আপনার ভাগ্য জানতে চেয়েছিলেন না?—শুনুন—দুটি নারীর অপমান আপনার মৃত্যুর কারণ হবে। একটি এইমাত্র যা হ'ল—তার ফলে আপনার চরম দুর্দিনে আপনি বুদ্ধিভ্রংশ হবেন। আর একটি শেষ পর্যন্ত সব চেষ্টা ব্যর্থ ক'রে আপনার মৃত্যুর কারণ হবে। খান

শাহ্‌জাদা, আপনার নিজের পথে যান। স্বল্প দিনের পরমায়ু আপনার—যে কটা দিন হাতে আছে ভোগ ক'রে নিন!'

অপমানে, ক্রোধে এবং সম্ভবত কিছুটা আতঙ্কেও শাহ্‌জাদার মুখ অগ্নিবর্ণ হয়ে উঠল। কিছুক্ষণ সময় লাগল তাঁর যেন—ভাষা খুঁজে নিতে। শেষে কোনমতে বলে উঠলেন, 'এত গোস্তাকি তোমার! জানো—জানো—তোমাকে আমি—'

'কি, বলুন। থামলেন কেন? আমার আর কী ক্ষতি করতে আপনি পারেন, দেহটা তো গেলই, এখন প্রাণটা? বেশ তো, তীর ধনুক তলোয়ার—কোনটারই তো অভাব নেই। বসিয়ে দিন—এই আমি বুক পেতে দিচ্ছি!'

সে সত্যি সত্যিই বুক খুলে দেয়। সেদিকে চেয়ে মাথা ঝিম্‌ঝিম্ ক'রে ওঠে মহম্মদ করিমের।

তাড়াতাড়ি মাথা নামিয়ে নেন তিনি। কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা ক'রে রুস্তানা আবার শান্ত ভাবে বুকের ওপর কাঁচুলি টেনে দিয়ে নিজের পথ ধরে।···

রুস্তানার সে অভিশাপ ফলতে দেরি হয় নি।

তারিখটা মনে আছে লালকুঁয়রের—১১২৪ হিজরীর ৯ই সফর। জাহান্দার শা যেদিন প্রথম যুদ্ধ শুরু করেন আজিম-উশ-শানের বিরুদ্ধে।

সারা দিনের যুদ্ধের পরই মহম্মদ করিম যেন কেমন ক'রে মনে মনে ভাগ্য-লিপি পড়তে পেরেছিলেন—তাঁর এবং তাঁর বাবার। ওঁরই এক 'খাবাস'* বলেছিল, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফেরার পথে সন্ধ্যার মুখে পশ্চিম আকাশের দিকে চেয়ে তিনি নাকি একটি বেদের মেয়ের প্রতিচ্ছবি দেখতে পেয়েছিলেন। তাতেই তাঁর মুখ বিবর্ণ হয়ে যায়। ভয়ে তিনি কেমন বিহ্বল হয়ে পড়েন। তাঁবুতে ফিরে আসতে খাবাস তাড়াতাড়ি শরবতের পাত্র এনে সামনে ধরেছিল কিন্তু রণ-শ্রান্ত শাহ্‌জাদা সেদিকে আর ফিরেও চান নি, সেই অস্নাত অভুক্ত অবস্থায় তখনই আবার ঘোড়ায় চেপে কোথায় যেন রওনা হয়েছিলেন।

ঐ খাবাসের মুখেই শোনা—তিনি পালিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, এই যুদ্ধ থেকে, যুদ্ধের ফলাফল থেকে, ভ্রাতৃদ্বন্দ্বের সর্বনাশা পরিণাম থেকে—এমন কি রাজৈশ্বর্য থেকেও, বহু দূরে কোথাও।

কে জানে হয়তো বা লাহোর থেকে বহুদূরে, শহর দিল্লীর উপান্তে জাহান-

*খাবাস—খাস খানসামা—Valet

হুমা শিকার অরণ্যের ওপারে গিয়ে কোন বেদের আস্তানা খোঁজ করতেই চেয়েছিলেন তিনি। সেখানের কোন একটি মেয়ের কাছে নতজানু হয়ে বসে ক্ষমা ভিক্ষা করতেই যাচ্ছিলেন হয়তো বা। আর সে ক্ষমা পেলে এই রাজভোগ থেকে বহুদূরে সেই অরণ্য-আবাসেই জীবনের বাকী ক'টা দিন কাটিয়ে দিতেন, চেয়ে নিতেন সেই নারীর কাছেই সামান্য একটু আশ্রয়।

কিন্তু তা হয় নি।

মির্জা মহম্মদ করিম নাকি পথ খুঁজে পান নি!

ওঁদের শিবির থেকে বেরিয়ে দিল্লী যাবার যে সোজা রাস্তা সেটা কোথাও দেখতে পান নি। শুধু তাই নয়—সারারাত নিজের তাঁবুর বাইরে চক্রাকারে ঘুরেছেন, আচ্ছন্নের মতো—ভূতগ্রস্তের মতো, কোথাও কোনমতে এতটুকু পথ খুঁজে পান নি।

প্রত্যুষে ঐ খাবাসই নাকি তাঁকে ঐ অবস্থায় দেখতে পায়। ভয়ে উদ্‌ভ্রান্তপ্রায় রমনিবের চেহারা দেখে সে আর তাঁবুতে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করে নি বরং রাজপুত্রের পোশাক ছাড়িয়ে সাধারণ পোশাকে, সাধারণ একটা ঘোড়ায় চাপিয়ে নদীর ওপারে কাট্‌রা-তাল-বাঘা তারই পরিচিত এক জোলার ঘরে রেখে আসে। ওখানে ক'দিন আত্মগোপন ক'রে থাকেন যেন—এই অনুরোধই ক'রে আসে সে—যত দিন না এই রাষ্ট্রবিপ্লবের ঝড় থেমে যায়, ঘোলাজলের ঘূর্ণি থিতিয়ে যায়।

নিয়তি।

একটি ভুল হয়েছিল ওদের দুজনেরই। পোশাক বদলাবার সময় নতুন পোশাকের জেব-এ টাকাপয়সা দেবার কথা খাবাসের মনে হয় নি, ওঁরও মনে-পড়ে নি নেবার কথা। ফলে শাহ্‌জাদা সেই জোলার বাড়ি উঠেছিলেন কর্পদক-শূন্য অবস্থায়।

জোলার অবস্থা ভাল ছিল না। তখন ওখানে কারুরই অবস্থা ভাল থাকার কথা নয়। যুদ্ধ বেধেছে—ভাড়াটে সেনাতে ছেয়ে গেছে ও অঞ্চল। লুঠতরাজ ছাড়া আর কিছু জানেই না তারা। কাজেই বাজারহাট সব বন্ধ, জোলারা কাপড় বুনে বসে আছে—বিক্রীর পথ নেই, যদিচ লুঠ হবার পথ অবারিত।

গরিবের সংসারে তাদের খাবার মতো ও কিছু ছিল না। অতি কষ্টে মকাইয়ের ছাতু দুটি যোগাড় হয়েছিল—তাও সকলের পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। তবু তারই একটি ভাগ তারা অতিথিকে দিয়েছিল। আগের দিনের অনাহারের পর সেই সামান্য অনাভ্যস্ত খাদ্য—তরুণ শাহ্‌জাদার কিছুই হয় নি তাতে। এর পরও দুটি দিন

সম্পূর্ণ অনাহারে কাটাবার পর শাহ্‌জাদার মনে পড়েছিল যে তাঁর হাতে তখনও দুটি মূল্যবান আংটি আছে, একটি হীরার ও একটি চুনির। তিনি জোলাকে ডেকে চুনির আংটিটিই খুলে দিয়েছিলেন—বলেছিলেন শহরের মারোয়াড়ী-পটিতে গিয়ে ওটা বেচে আটা দাল ঘি সংগ্রহ করতে।

জোলা বেচারী বুঝতে পারে নি অত। সে-ও ক'দিন ধরে সপরিবারে উপবাসী—আংটি পেয়ে প্রায় নাচতে নাচতেই গিয়েছিল শহরে। কিন্তু একে তার অনাহার-শীর্ণ চেহারা, তায় জীর্ণ মলিন বেশ। তার হাতে অত বড় সাচ্চা চুনির আংটি দেখে মহাজনের সন্দেহ হবারই কথা। সুবৃহৎ পাথরটির দাম অন্তত তিনশ মোহর।

মহাজন জেরা শুরু করলেন—কঠিন জেরা।

বোধ হয় তাঁর মনে হয়েছিল যে চোরাই মাল—ধমকধামক করলে জলের দামে বেচে চলে যাবে লোকটা। জোলা গরীব কিন্তু চোর নয়। এই আকস্মিক অপবাদে সে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে উঠল—বার বার শপথ ক'রে বলতে লাগল যে তার ঘরে এক অতিথি এসেছেন, সেই অতিথিই তাকে এ আংটি দিয়েছেন—বিশ্বাস না হয় ওরা কেউ চলুক, দেখে আসুক নিজের চোখে।

শুধু মহাজনের ব্যাপার হ'লে কথাটা সেইখানেই মিটে যেত। কিন্তু কী কাজে সেখানে এসেছিল হিদায়ৎ কেশ—সে আগে ছিল হিন্দু, রাজ-সরকারে চাকরি পাবার লোভে ধর্মত্যাগ করেছে অনায়াসে। সে এই ঘটনার মধ্যে নিজের উন্নতির উপায় পরিষ্কার দেখতে পেলে। ঈশ্বরের যোগাযোগ নিশ্চয়—তাঁরই অনুগ্রহ। সে মহাজনকে চোখ রাঙিয়ে জোলাকে নিয়ে গেল উজীর জুলফিকর খাঁর তাঁবুতে। তারপর সেখান থেকে কয়েকজন সিপাহী নিয়ে গিয়ে সে-ই ধরে নিয়ে এল মির্জা মহম্মদ করিমকে!

তবু হয়তো হতভাগ্য রাজকুমার প্রাণে বেঁচে যেতেন!

জাহান্দার শা তো ক্ষমাই ক'রেই ছিলেন। হুকুম দিয়েছিলেন দিনকতক শুধু নজরবন্দী ক'রে রাখতে।

কিন্তু তাঁকে বাঁচতে দেন নি লালকুঁয়র।

কারণ লালকুঁয়র ভুলতে পারেন নি একটা কথা। মর্মদাহকারী অপমানে একটা। অপমানটা সুতীক্ষ্ণ কাঁটার মতো তখনও বিঁধে ছিল বুকে—

অবশ্য খুব বেশী দিনের কথাও নয়, বাহাদুর শা তখন তখ্‌ৎ-এ-তাউসে।

মহম্মদ করিম খোজা সর্দার জাবেদ খাঁর মারফৎ প্রস্তাব ক'রে পাঠিয়েছিলেন

লালকুঁয়র যদি মালিক বদল করতে রাজী থাকে তো মির্জা মহম্মদ করিম তাকে নিজের আশ্রয়ে গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছেন!

সে প্রস্তাবে ঠিক অপমান বোধ করার কথা নয়। লালকুঁয়রও করেন নি। এ প্রস্তাবকে তাঁর রূপ যৌবন ও নৃত্যপটুত্বের প্রাপ্য স্বীকৃতি হিসেবেই গ্রহণ করেছিলেন। শুধু বলে পাঠিয়েছিলেন, যে লালকুঁয়রের আপাতত মালিক বদল করার কোন অভিপ্রায় নেই। কুমার এ প্রস্তাব পাঠিয়েও ভাল কাজ করেন নি, তাঁর চাচা জানতে পারলে এ ধৃষ্টতা ক্ষমা করবেন না। তাছাড়া লালকুঁয়র হলেন সম্পর্কে কুমারের চাচী, তাঁকে এ ধরনের প্রস্তাব পাঠাবার আগে একটু লজ্জা বোধ করা উচিত ছিল।

এটুকু বলতে হয়েছিল শোভনতার খাতিরেই।

তার জবাবে শাহ্‌জাদা যেকথাগুলো বলে পাঠিয়েছিলেন,—তা গরম লৌহ-শলাকার মতোই কানে বিঁধেছিল লালকুঁয়রের।

শাহ্‌জাদা বলে পাঠিয়েছিলেন, নাচওয়ালী বাঁদীরা কখনই, কোন কারণেই বাদশাজাদার চাচী হ'তে পারেন না। বাঁদী টাকা দিয়ে কেনাবেচা যায়—সে সম্পত্তি। লালকুঁয়রের ইতিহাস তাঁর শোনা আছে, সিংহাসন এবং টাকা—এই লোভেই তিনি নির্বোধ মুইজ-উদ্দীনের সঙ্গে যেচে ঘনিষ্ঠতা করেছেন। এ কথা সবাই জানে যে বাদ্‌শার ছেলেদের মধ্যে আজিম-উশ-শানই যোগ্যতায় সকলের শ্রেষ্ঠ, তিনিই ভাবী বাদ্‌শা। মহম্মদ করিম তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র—সুতরাং তখৎ-এ-তাউসে বসবার আশা করিমেরই বেশী। সেদিক দিয়ে নাচওয়ালীর মালিক-নির্বাচনে একটু ভুলই হয়েছে। তাছাড়াও—টাকাও যে আজিম-উশ-শানেরই বেশী তাই বা কে না জানে। টাকাই যখন লক্ষ্য, তখন টাকার প্রতি-যোগিতাতেও মুইজ-উদ্দীন পিছিয়ে যাবেন। লালকুঁয়র যেন কথাটা ভেবে দেখে ভাল ক'রে।

লালকুঁয়র এই আঘাতে যতটা বিচলিত হয়েছিলেন—এতটা বোধ হয় কখনই হন নি। এ অপমান তাঁর সর্বাঙ্গে বিছার বিষের মতোই জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছিল। সে জ্বালা এমনই যে, অপর কাউকে দগ্ধ না করা পর্যন্ত বুঝি তার শান্তি হয় না! তিনিও দগ্ধ করতে চেয়েছিলেন ঐ ধৃষ্ট, গর্বিত মূর্খ রাজকুমারকে।

কিন্তু তখন কিছুই করতে পারেন নি।

জাহান্দার শাকে বলেছিলেন বৈকি!

জাহান্দার শা তখন দিল্লী থেকে বহুদূরে। বাদ্‌শার কাছে নালিশ জানিয়ে একটা খৎ পাঠানো ছাড়া আর কিছুই ক'রে উঠতে পারেন নি। তার জবাবে

বাহাদুর শা শুধু জানিয়েছিলেন যে, ছেলেমানুষরা চিরদিনই ছেলেমানুষি করে—তা নিয়ে যে বয়স্ক লোকেরা মাথা ঘামায় বা বিচলিত হয়, তারা হয় নির্বোধ নয় বেকার। এর মধ্যে কোন্ শ্রেণীতে প্রিয় পুত্র মুইজ-উদ্দীনকে তিনি ফেলবেন তাই ভেবে পাচ্ছেন না। তবে কি এই বুঝতে হবে যে পুত্র মুইজ-উদ্দীনকে যে রাজকীয় কাজে তিনি পাঠিয়েছেন—পুত্র তার কিছুই দেখেন না? তা ছাড়া একটা নাচওয়ালী রক্ষিতার কথা পিতাকে লেখার আগে তাঁর আর একটু বিবেচনা করা উচিত ছিল। ইত্যাদি—

সে চিঠির জবাব দেবার সাহস মুইজ-উদ্দীনের হয় নি। তারপর তিনি হয়তো ভুলেই গিয়েছিলেন কথাটা।

লালকুঁয়র ভোলেন নি নিশ্চয়ই। কিন্তু তাঁর কানে করিমের গ্রেপ্তারের সংবাদটা পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গেই এ খবরটাও পৌঁছল যে বাদ্‌শা তাকে ক্ষমা করেছেন। শুধু নজরবন্দী রাখার হুকুম হয়েছে। আর তাকে আশ্রয় দিয়েছেন জুল্‌ফিকর খাঁ। সে বড় কঠিন ঠাঁই!

ক্ষোভে ও রোষে হাত কামড়ালেন লালকুঁয়র কিন্তু হাল ছাড়লেন না। জুল-ফিকর খাঁই বোধ হয় একমাত্র লোক যিনি নতুন বাদ্‌শার প্রিয়তমা রক্ষিতার অনুগ্রহের পরোয়া করেন না। অন্তত সে অনুগ্রহের আশায় নিরপরাধ লোককে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে রাজী হবেন না।

কিন্তু তিনি না হ'লেও—সে রকম লোক আছে বৈকি!

খাঁ জাহান কোকলতাশ খাঁ তেমনিই একজন লোক। তাকেই ডেকে পাঠালেন লালকুঁয়র। তার কাছে আগ্রা দিল্লীর খবর চাইলেন কিছু কিছু। যেন সেই জন্যই ডেকেছেন। কথা-প্রসঙ্গে মহম্মদ করিমের অতীত ধৃষ্টতার কথা বললেন। মহম্মদ করিমের শাস্তি হ'লে তিনি খুশী হতেন সে কথাও জানালেন। কিন্তু কি আর করা যাবে? বাদ্‌শা ন্যায়পরায়ণ, তিনি বিচার ক'রে যা ব্যবস্থা করেছেন—ঠিকই করেছেন!

কোকলতাশ খাঁ সব শুনলেন মন দিয়ে।

তারপর মহম্মদ করিমের চাকরদের ডেকে একটু কড়া জেরা চালাতেই বহু কথা বেরিয়ে গেল। জাহান-নুমার অরণ্যে সেই বেদের মেয়েটির ঘটনাও নাকি আড়াল থেকে প্রত্যক্ষ করেছিল কোন্ অনুচর। সেটাও শোনা গেল।

কোকলতাশ খাঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

তিনি নতুন ক'রে শাহানশার দরবারে বিচার চাইলেন।

প্রজা সকলেই। বাদ্‌শা পিতার মতো—তাঁর কাছে সব প্রজাই সমান।

শাহ্‌জাদা মহম্মদ করিম অনাথা বালিকার উপর অত্যাচার করেছেন। দরিদ্র তারা, গৃহহীন, নিরাশ্রয়—তবু প্রজাই। এর বিচার না করলে ধর্মাধিকরণের মর্যাদা থাকবে না।

লালকুঁয়র উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। জগতের সমস্ত নারীজাতির হয়ে নারীর এই অপমানের প্রতিকার প্রার্থনা করলেন।

ক্লান্ত উত্ত্যক্ত বাদ্‌শার তখন অত কথা ভাববার সময় নেই। তিনি কি দিনরাত এই সব কচ্‌কচি নিয়ে থাকবার জন্যেই সিংহাসনে বসেছেন? সুতরাং বেশী কথা বলতেও হ'ল না—চোখের পলকে প্রাণদণ্ড হুকুম হয়ে গেল।…

বাদ্‌শার দুই-ভাই আলি মুরাদ খাঁ-জাহান কোকলতাশ খাঁ লালকুঁয়রের অনুরোধে আমীর-উল-উমারা বা দ্বিতীয় মন্ত্রীর পদ গেলেন।

কিন্তু— না, না। এত নিষ্ঠুরতার প্রয়োজন ছিল না। এত নিষ্ঠুর হ'তে চান নি বাদ্‌শার প্রিয়তমা বাঁদী ইমতিয়াজ মহল। মর্মান্তিক অপমানের জ্বালা সর্বাঙ্গে বিষের দাহ ছড়ানো সত্ত্বেও না।

কোকলতাশ খাঁ একটু বেশী নিমকহালালী করতে গিয়েছিলেন। তিন দিন নাকি অনাহারে ছিলেন শাহ্‌জাদা মির্জা মহম্মদ করিম। সেই অবস্থায় ঘাতকরা তাঁকে টানতে টানতে নিয়ে গিয়েছিল। কোকলতাশের পায়ের কাছে বসে পড়ে হাতজোড় ক'রে তিনি দু'খানা রুটি আর এক লোটা জল চেয়েছিলেন। উচ্ছিষ্ট পোড়া রুটি, রাস্তায় ফেলে দেওয়া রুটিতেও আপত্তি নেই জানিয়েছিলেন—কিন্তু তাতে কর্ণপাত করেন নি খাঁ সাহেব।…

মৃত্যুর আগে কুমার বলে গিয়েছিলেন, 'আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত শেষ হ'ল, খোদার দরবারে আমি এখন দয়া পাবো, তা জানি—কিন্তু বাঁদী লালকুঁয়রের প্রায়শ্চিত্ত বাকী রইল। এ দৃশ্য এখন সে আড়াল থেকে দেখে আনন্দ পাচ্ছে হয়তো—কিন্তু আরও এই রকম দৃশ্য তাকে দেখতে হবে, তখন আর আনন্দ পাবার কারণ থাকবে না। আমারই মতো অবস্থা হবে, ভীত শশকের মতো এতটুকু আশ্রয় খুঁজে বেড়াবে—সে আশ্রয় সেদিন মিলবে না। আমারই মতো নতজানু হয়ে প্রাণভিক্ষা করতে চাইবে—সে ভিক্ষা কেউ দেবে না। সেদিন মনে পড়বে আজকের কথা। কঠোরতর প্রায়শ্চিত্ত তোলা রইল তার। তখন আজকের কথা মনে হয়ে সে অনুতাপ করবে—এই আমি বলে গেলাম।'

বাঁদী লালকুঁয়র!

বেগম ইমতিয়াজ মহল কথাটা শুনে হেসেছিলেন। ঐ আভিজাত্যটুকুই বুঝি কুমারের এখনও অবশিষ্ট আছে। দুর্বলের ব্যর্থ অহঙ্কার!

॥ সাত ॥

সেদিন হেসেছিলেন। কিন্তু আজ শিউরে উঠলেন বেগম ইমতিয়াজ মহল। মনে হ'ল সেই অভিশাপ তার বীভৎস নিষ্ঠুর নির্মম চেহারা নিয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে—এই বাইরের কুয়াশা-ঢাকা অন্ধকারের চেয়েও অন্ধকার তাঁর ভবিষ্যৎ। কিন্তু অন্ধকার হ'লেও বুঝি ভাল ছিল। তার এ ভয়ঙ্কর চেহারাটা চোখে পড়ত না।

'কী হ'ল, কি হ'ল পিয়ারী ?' অকস্মাৎ নেশার ঘোর থেকে জেগে উঠে প্রশ্ন করেন জাহান্দার শা।

'কিছু না। তুমি ঘুমোও।' বলেন লালকুঁয়র। সস্নেহে জাহান্দার শার একটা হাতের ওপর হাত বুলোন আস্তে-আস্তে।

ছেলেমানুষ হয়ে পড়েছেন বাদ্‌শা। একেবারেই ছেলেমানুষ। আর সে তো তাঁরই জন্য।

'তুমি জাহান্নমে যাবে আর সেই সঙ্গে তোমার বাদ্‌শাকেও নিয়ে যাবে' বলেছিলেন জ্যোতিষী আল্লাবক্স। তাই তো হ'ল। তাই তো করলেন লাল-কুঁয়র। জাহান্দার শাকেও সেদিন সতর্ক করেছিলেন আল্লাবক্স; যদি তিনি তাতে কান দিতেন।

'আর কত দূর মহম্মদ মিয়া ?'

প্রশ্ন করেন বাদ্‌শা।

'বেশী দূর আর নেই জাহাঁপনা। ঐ যে দূরে শাজাহানবাদের আলো দেখা যাচ্ছে। আর পাঁচ ছ' দণ্ডের মধ্যেই আমরা ওখানে পৌঁছব।'

'বেশ বেশ। পৌঁছলেই ভাল। একটু অন্ধকার থাকতেই পৌঁছতে চাই। নইলে আবার সারা দিনটা কোথাও গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে হবে। আর পিয়ারীরও বড় কষ্ট হচ্ছে। দিল্লীতে পৌঁছলে উনি অন্তত ওঁর নিজের ডেরায় গিয়ে বিশ্রাম নিতে পারেন।'

বেশ অনায়াসেই বলেন কথাগুলো!

ক্ষোভ, অভিমান, অপমানবোধ, উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা কিছুই যেন নেই।

এ অবস্থার জন্য ওঁর এই প্রিয়তমা বাঁদীই দায়ী।

অন্ধকারে নিঃশব্দে কঙ্কণপরা হাত তুলে ললাটে আঘাত করেন। ওরে

অন্ধ, ওরে দৃষ্টিহীনা—আজকের এই চোখ সেদিন তোর কোথায় ছিল ?

বেচারী জাহান্দার শা ! শুধু বর্তমানটা সঁপেই যদি নিশ্চিন্ত হতেন তো কথা ছিল না। ভবিষ্যৎও সঁপে দিয়ে বসে ছিলেন এক পথের কুড়োনো নাচওয়ালীর পায়ে। কোন দিকে তাকান নি, কারুর কথা ভাবেন নি।

একে একে পর করেছেন সবাইকে। যারা আজ সম্রাটের পাশে দাঁড়াতে পারত, যারা সাম্রাজ্যের স্তম্ভ হ'তে পারত তাদের সবাইকে একান্ত অবহেলায় সরিয়ে দিয়েছে ঐ নাচওয়ালী।

আজ এ বিপদে শুধু মাত্র জুলফিকর খাঁকে ভরসা ক'রেই চলেছেন বাদ্‌শা। সে জুলফিকর খাঁরও খুব প্রসন্ন থাকবার কথা নয় তাঁদের ওপর। নানা কারণেই তাঁরা বার বার খোঁচা দিয়েছেন প্রধান উজীরকে। এই তো সেদিনও—চিনকিলিচ খাঁর ব্যাপারেই—

চিনকিলিচ খাঁ বীর, চতুর এবং দুঃসাহসী। তিনি যদি আজ ওঁদের ওপর প্রসন্ন থাকতেন ! অথচ কী তুচ্ছ কারণেই না অত বড় মিত্রকে প্রবল শত্রু ক'রে দিয়েছেন।

সে কী ছেলেমানুষি ! আজ মনে পড়লে লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে যায়।

কোন্ এক উন্মাদ মুহূর্তে, বাল-চপলতায় জুহরা সব্‌জীওয়ালীকে কথা দিয়েছিলেন যে যদি কখনও 'দিন' পান তো তাকে জায়গীর দেবেন, সে হাতীতে চড়ে বেড়াবে। তার কাছে ঋণ ছিল সন্দেহ নেই, সে ঋণ শোধ করতেও তিনি বাধ্য—কিন্তু সমস্তরই একটা সীমা আছে, সেইটে মনে পড়ে নি। জায়গীর দিয়েছিলেন, হাতীও দিয়েছিলেন—আর সেই সঙ্গে দিয়েছিলেন অতিরিক্ত প্রশ্রয়। ফলে তার স্পর্ধার বাঁধ ভেঙ্গে গিয়েছিল।

আর জুহরার পক্ষে এ পরিবর্তন—এ তো আবুহোসেনের গল্পকথা। অবিশ্বাস্য।

সুতরাং সে যে জায়গীর ও হাতী পাবার পর প্রত্যহই লোকলস্কর নিয়ে হাতীতে চেপে ঘুরে বেড়াতে শুরু করবে, এতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে ! সেই ভাবেই একদিন যেতে যেতে ফৈজ-বাজার এলাকার এক গলি-পথে ওদের দেখা। চিনকিলিচ খাঁ আসছিলেন পাল্‌কীতে—জুহরা হাতীতে। আর সে হাতীর পিছনে অন্তত পঁচিশ জন চাকর। সরু পথ—দুজনের এক সঙ্গে দু'দিকে যাওয়া সম্ভব নয়, একজনকে এক ধারে সরে একপাশ করে দাঁড়াতে হয়। চিনকিলিচ খাঁ চিরদিন লোকের কাছে সম্ভ্রম পেতেই অভ্যস্ত। তিনি আশা করছিলেন জুহরাই পথ ছেড়ে দেবে। 'হঠাৎ বাদ্‌শা' জুহরার এ ধৃষ্টতা সহ্য হ'ল

না। তার হুকুমে তার 'নৌকর'রা রূঢ়ভাবে ধাক্কা দিয়ে ওঁর পাল্কী সরিয়ে পথ ক'রে দিলে। তাও সহ্য করেছিলেন চিনকিলিচ খাঁ, কিন্তু জুহরার বুঝি মনে হ'ল যে হঠাৎ বাদ্শাহীটা যথেষ্ট দেখানো হ'ল না! সে হাতীর ওপর থেকে চেঁচিয়ে বললে, 'কে রে? ওঃ, সেই কানা মুরুব্বির ছেলেটা বুঝি?'

চিনকিলিচ খাঁর বাবা শেষ জীবনে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন—কিন্তু অন্ধ হয়েও তিনি বিশ বছর সেনাপতির চাকরি করেছেন—নিজে যুদ্ধেও গিয়েছেন। গাজী-উদ্দীন খাঁ ফিরুজ জঙ্গকে স্বয়ং আলমগীর বাদ্শাও সমীহ করতেন।

এ স্পর্ধা চিনকিলিচের সহ্য হয় নি। তাঁর সঙ্গে যে শান্ত্রী ছিল তারা সংখ্যায় অল্প—কিন্তু যুদ্ধ-ব্যবসায়ী। খাঁর ইঙ্গিত পাবার পর জুহরাকে উচিত শাস্তি দিতে বিলম্ব হয় নি তাদের। স্বয়ং জুহরাকেও হাতী থেকে টেনে নামিয়ে পথে হেঁটে যেতে বাধ্য করেছিল তারা।

জুহরা কাঁদতে কাঁদতে এসে নালিশ করেছিল বেগম ইমতিয়াজ মহলের কাছে। অভিমানে জ্ঞানশূন্য হয়ে তিনি জাহান্দার শাকে দিয়ে একেবারে প্রাণদণ্ডাজ্ঞা সই করিয়ে জুলফিকর খাঁর কাছে পাঠিয়েছিলেন।

সে আদেশ অবশ্যই উজীর পালন করেন নি। প্রিয়তমার তাগাদায় বাদ্শা অনুযোগও করতে গিয়েছিলেন সেজন্য—জুলফিকর খাঁর কাছে মৃদু ধমক খেয়ে শেষ পর্যন্ত চুপ ক'রে যান। সে কথা কি চিনকিলিচ খাঁ ভুলে যাবেন?

—না! জুলফিকর খাঁই ভুলবেন!

পথের ধুলো মানুষ স্বেচ্ছায় মাথায় করে সে আলাদা কথা—কিন্তু সে ধুলো যদি জোর ক'রে মাথায় চাপতে যায় তো কখনই সহ্য করে না কেউ। জাহান্দার শা শখ ক'রে তাঁকে শিরোধার্য করেছেন, জাহান্দার শা উন্মাদ। তাই ব'লে কি সবাই উন্মাদ হবে?…

সবচেয়ে ভুল করেছিলেন বাদ্শা এই সৈয়দ আবদুল্লা খাঁকে শত্রু ক'রে—কিন্তু সে জন্যও কি লালকুঁয়র দায়ী নন?

সৈয়দ হাসান খাঁ আর সৈয়দ হোসেন খাঁ—এঁদের দুজনের কেউই ঠিক সাধারণ লোক নন। সৈয়দ বংশের ছেলে ব'লে নয়, বিখ্যাত বীর যোদ্ধা ও শাসক সৈয়দ-মিয়ার ছেলে বলেও নয়—এঁরা নিজেরাই যথেষ্ট কৃতী। এই বয়সেই বার বার নিজেদের শৌর্য ও রণদক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। আলমগীর বাদ্শার রাজত্বকালেই এঁরা দায়িত্বপূর্ণ পদ পেয়েছিলেন। জাজাউর যুদ্ধক্ষেত্রে এঁরা দু ভাই না থাকলে শাহ্ আলম বাহাদুর শা কোনও দিন সিংহাসনে বসতে পারতেন কিনা সন্দেহ! অথচ বাহাদুর শা পরে এঁদের সঙ্গে খুব ভদ্র ব্যবহার

করেন নি, মুইজ-উদ্দীন তো বার বার অভদ্রতাই করেছেন। তবু এঁরা তো আগে কোন শত্রুতা করেন নি। আজিম-উশ-শানের অনুগ্রহেই এঁরা সামান্য দুটি সুবেদারী পেয়েছিলেন—তবু আজিম-উশ-শানের পতনের পর জাহান্দার শা সিংহাসনে বসেছেন খবর পেয়ে তাঁকেই তো বাদ্‌শা ব'লে মেনে নিতে প্রস্তুত হয়েছিলেন!

কিন্তু লালকুঁয়র তা হ'তে দেন নি।

অনেকদিন আগে—জাহান্দার শা তখন মুইজ-উদ্দীন মাত্র—তাঁর তাঁবুতে গান-বাজনার এক জলসায় নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন হাসান ও হোসেন দু ভাই। লালকুঁয়র উপস্থিত ছিলেন, মুইজ-উদ্দীনের আসন থেকে একটু দূরে বসে ছিলেন। তাঁবুতে ঢুকে মুইজ-উদ্দীনকে অভিবাদন জানাবার পরই সকলে তাঁর সামনে গিয়ে মাথা হেঁট করে ছিল—করে নি কেবল এই দুই ভাই। সে কথা ভোলেন নি লালকুঁয়র।

তাই লাহোরের যুদ্ধক্ষেত্রে জয়লাভের পরই যে ব্যক্তিটি সবচেয়ে বেশী মাথা হেঁট ক'রে তাঁকে অভিবাদন জানিয়েছিল—রাজী মহম্মদ খাঁ—তাকে পুরস্কৃত করতে গিয়ে প্রথমেই মনে হয়েছিল ওঁর এই দুটি ভাইয়ের কথা। সঙ্গে সঙ্গে হাসান বা আবদুল্লা খাঁর এলাকা কারামানিকপুরের সুবেদারী বকশিশ করেছিলেন তাকে। আবদুল্লা খাঁ নতুন বাদ্‌শাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান জানিয়ে যে চিঠি দিয়েছিলেন, সেই চিঠির জবাবে গেল এই হুকুম!

তার ফলে—তার ফলেই জাহান্দার শার বাদ্‌শাহীর প্রথম পরাজয় স্বীকার করতে হ'ল। রাজী খাঁর প্রতিনিধি আবদুল গফুর সৈন্যসামন্ত নিয়ে আবদুল্লা খাঁকে তাড়াতে গিয়ে কোনমতে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এল!

তার পর অবশ্য জাহান্দার শা সে ভুল সংশোধনের চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু গাছের গোড়া কেটে আগায় জল ঢাললে ফল কি হয় তা বালকেও জানে। আবদুল্লা খাঁ আর হুসেন খাঁ মাত্র দু'জনের চেষ্টাতেই তো বলতে গেলে ফররুখশিয়ার আজ বিজয়ী আর জাহান্দার শা পরাজিত!

গোরুর গাড়ি চলেছে এখনও মাঠের ওপর দিয়ে, আল্ থেকে নামতে গিয়ে এখনও বার বার ঠোক্কর খাচ্ছেন ওঁরা। কিন্তু লালকুঁয়রের সে দিকে লক্ষ্য নেই। তিনি নিজের নির্বুদ্ধিতার কথাই ভাবছেন শুধু।

আজ যদি বাদ্‌শার আত্মীয়স্বজনরাও কেউ প্রসন্ন থাকতেন ওঁর ওপর। রাক্ষসী লালকুঁয়র ওঁর ছেলেদের পর্যন্ত বিদ্বিষ্ট ক'রে তুলেছেন! যে ছেলেরা

তাঁকে মহিষীর সম্মান দিতে চায় নি তাদের সবাইকার সঙ্গেই বাপের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে, এমন কি শেষ দুটিকে তো কারাগারেই পাঠিয়েছেন বাদ্‌শা। ওঁর হুকুমেই সে 'হুকুমনামা'য় সই করেছেন শাহান্‌শাহ। নইলে বাপের স্নেহ ছোট ছেলেদুটির ওপর কম ছিল না!

অন্তত বাদ্‌শা-বেগমও যদি একটু খুশী থাকতেন! আলমগীরের কন্যা, বাহাদুর শার ভগ্নী—জিন্নত-উন্নিশা বেগম সারা হিন্দুস্তানের সম্ভ্রমের পাত্রী। বিদূষী ও বুদ্ধিমতী শুধু নন—রাজনীতিতেও গভীর জ্ঞান তাঁর। সেজন্যে সকলেই তাঁকে সমীহ করে, ভয় করে। আজ তিনি যদি বিজয়ী ফররুখশিয়ারকেও কোন অনুরোধ করেন তো তার সাধ্য নেই সে অনুরোধ ঠেলে। কিন্তু জাহান্দার শার জন্য কোন অনুরোধই তিনি করবেন না—তা লালকুঁয়র জানেন। কারণ তিনি তো পিসীকেও বাদ্‌শার' শত্রু ক'রে দিয়েছেন। যেহেতু আলমগীরের দুহিতা বাদ্‌শা-বেগম পথের নাচওয়ালীকে বেগম বলে স্বীকার করতে রাজী হন নি—সেই হেতু প্রকাশ্যে, মুখের সামনে কুৎসিত ভাষায় গালি দিয়েছেন লালকুঁয়র সেই মহিমময়ী মহিলাকে। আগে দিল্লীতে থাকলেই প্রতি জুম্মাবারে জাহান্দার শা প্রণাম করতে যেতেন পিসীকে—লালকুঁয়রের অসন্তোষের ভয়ে তাও বন্ধ ক'রে দিয়েছিলেন—এমন কি ডেকে পাঠালেও যান নি কোন দিন। আজ কোন মুখে গিয়ে তাঁর কাছে অনুগ্রহ চাইবেন বাদ্‌শা?

অকস্মাৎ চিন্তা-স্রোতে বাধা পড়ল।

গাড়ি দাঁড়িয়ে গেছে।

'কী হ'ল, কী হ'ল?' জাহান্দার শা চমকে জেগে ওঠেন।

'দিল্লী।' সংক্ষেপে উত্তর দেয় আজম খাঁ।

দু-হাতে চোখ রগড়ে বাদ্‌শা ভাল ক'রে চোখ চেয়ে দেখেন। শাজাহানাবাদের আলো জ্বলছে চারিদিকে। এখন আর দূরে নয়, শহরের মধ্যেই এসে পড়েছেন তাঁরা—

'তা'হলে মহম্মদ মিয়া, তুমি এঁকে নিয়ে চলে যাও।'

'আপনি?'

'আমি একাই যাবো উজীরের বাড়ি।'

'কিন্তু এখনও ভেবে দেখুন জাহাঁপনা—এখনও সময় আছে। দীর্ঘদিন আপনি মুলতানে ছিলেন, সেখানে আপনাকে সবাই চেনে, ভালবাসে। বন্ধু-বান্ধবের একেবারে অভাব হবে না। সেখানে গেলে এখনও হয়তো একটা

উপায় হয়। আমি মিনতিকরছি আপনাকে—'

'তুমি জুলফিকর খাঁকে চেনো না মহম্মদ মিয়া। সে বীর, সাহসী, বুদ্ধিমান। সে ইচ্ছে করলে এখনও অনেক খেলা দেখাতে পারবে। সে বেচারী সেদিন শেষ পর্যন্ত আমার জন্যে অপেক্ষা করেছিল, তা শোন নি? হয়তো সেদিনই ভাগ্যের চাকা ঘুরে যেত। সে আমাকে সাহায্য করবেই। আমি এখনই এই অবস্থায়, এই ধূলিধূসরিত দেহে ক্লান্ত পদে তার কাছে গিয়ে সাহায্য চাইব—সে আমাকে সাহায্য না ক'রে থাকতে পারবে না মহম্মদ মিয়া।...তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। সে আমার বিশ্বস্ত সেবক।...কী বলো পিয়ারী? তোমার কি মত?'

অবসন্ন ক্লান্তভাবে গাড়ির টপ্পরে মাথা রেখে বসেছিলেন লালকুঁয়র। মাথা তুলে আস্তে আস্তে বললেন, 'আমি আর কোন মত দেব না শাহান্‌শা, তুমি যা ভাল বোঝ তাই করো। আমি আর কিছু বুঝতে পারছি না। আমার বুদ্ধিতে চলে তোমার অনিষ্টই হয়েছে বার বার, এবার থেকে তুমি তোমার বুদ্ধিতেই চলো!'

ভারী খুশী হলেন জাহান্দার শা।

'শুনলে তো মহম্মদ মিয়া। আমি যা বলছি তাই শোন। ওঁকে নিয়ে চলে যাও সোজা ওঁর বাড়ি। আমি আসাদ খাঁ আর জুলফিকর খাঁর সঙ্গে কথাটা সেরেই চলে যাচ্ছি—'

॥ আট ॥

জুলফিকর খাঁ অবাক হয়ে বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর এতখানি বয়স হ'ল—এর ভেতরে এতটা অবাক বোধ হয় আর কোন দিন হন নি। একবার মনে হ'ল যে তিনি ভুল শুনেছেন—কিন্তু না, আসাদ খাঁর কণ্ঠস্বরে তো কোন জড়তা কি সংকোচ নেই। যা বলেছেন বেশ পরিষ্কার ক'রেই বলেছেন।

আসাদ খাঁর বয়স হয়েছে। তিনি যৌবনকাল থেকেই—নামে না হোক—কাজে এই এত বড় সাম্রাজ্যের উজীর-উল্‌-মুলুক বা প্রধান মন্ত্রী। আলমগীর বাদশার একান্ত বিশ্বাসভাজন লোক ছিলেন তিনি। বাহাদুর শা তাঁকে পিতৃবন্ধুর মতই সম্মান করতেন। আর জাহান্দার শা তো বলতে গেলে তাঁর ওপরই সব কিছু ছেড়ে দিয়ে বসে আছেন। তিন পুরুষের অনুগ্রহপুষ্ট ও

আস্থাভাজন প্রধান অমাত্য তিনি—তাঁর মুখে এ কী কথা ?

অতি কষ্টে, অনেকক্ষণ থেমে জুলফিকর খাঁ বললেন, 'কি বলছেন আপনি বাপজান ?'

আসাদ খাঁ প্রশান্ত মুখেই উত্তর দিলেন, 'ঠিকই বলছি, এ ছাড়া তোমার এবং আমার বাঁচবার কোন পথ নেই।'

তবু বজ্রাহতের মতো স্তম্ভিত হয়ে বসে রইলেন জুলফিকর খাঁ।

আসাদ খাঁর আশি বছরের ওপর বয়স হ'ল। তিনি দেখলেন অনেক। তিনি জানেন রাজনীতিতে দয়াধর্মের কোন স্থান নেই, এখানে কে কতটা সুবিধা ক'রে নিতে পারে, শুধু সেইটেই বড় কথা। "রাজধর্মে ভ্রাতৃধর্ম বন্ধুধর্ম নাই—" কবির একথা চিরদিনই সত্য।

জুলফিকর খাঁও যে সে কথা জানেন না তা নয়। তিনিও দেখেছেন ঢের। কিন্তু তবু তাঁর কথা একটুখানি স্বতন্ত্র। তিনি আসাদ খাঁর মতো শুধুই ঝুনো রাজনীতিক নন—তিনি যুদ্ধ-ব্যবসায়ী, বীর। বীরের হৃদয় থেকে কৃতজ্ঞতা ও বিবেক বুঝি একেবারে লোপ পায় না কখনই—তাই তিনি মনেপ্রাণে ঠিক মেনে নিতে পারলেন না কথাটা। এতখানি বিশ্বাসঘাতকতা, এতখানি প্রবঞ্চনা করতে যেন মন সায় দেয় না কোন কারণেই।

জাহান্দার শাকে বলতে গেলে তিনিই সিংহাসনে বসিয়েছিলেন। বাহাদুর শার মৃত্যু আসন্ন জেনে, ভাই আজিম-উশ-শানের হাতে বন্দী হবার ভয়ে মুইজ-উদ্দীন যেদিন পালিয়ে যান, সেদিন তাঁর সঙ্গে একশ'টির বেশী অনুচর ছিল না। এক রকম কপর্দকহীন তিনি তখন—কোন সৈন্য বা সেনাপতি সেদিন মুইজ-উদ্দীনের পতাকাতলে গিয়ে সমবেত হবে—সেকথা কেউ কল্পনাও করতে পারেন নি। আজিম-উশ-শানের সৌভাগ্য-রবি তখন মধ্যগগনে—তাই সকলে তাঁকেই সেলাম দিতে দৌড়েছিল।

দৌড়েছিলেন জুলফিকর খাঁও। হয়তো সেদিন যদি আজিম-উশ-শানের এক সামান্য কর্মচারী অমন উদ্ধত অবহেলার সুরে জুলফিকর খাঁর চিঠির জবাব না দিতেন, তাহ'লে ইতিহাসই যেত বদলে, আজ দিল্লীর তখ্‌ৎ-এ-তাউসে আজিম-উশ-শানই শোভা পেতেন, জাহান্দার শাকে সে সিংহাসনের ত্রিসীমানার মধ্যেও পৌঁছতে হ'ত না। সেই চিঠি পেয়েই না অপমানে জুলফিকর খাঁর চোখে জল এসে গিয়েছিল—এবং তিনি নিজের লোকজন নিয়ে তৎক্ষণাৎ সোজা চলে গিয়েছিলেন মুইজ-উদ্দীনের তাঁবুতে! জুলফিকর খাঁ মুইজ-উদ্দীনের দলে যোগ দিয়েছেন শোনবার পরই একে একে এসে জুটেছিলেন অপর সেনানী এবং

রাজপুরুষরা। তাঁরই মন্ত্রণা আর চক্রান্তে জাহান্দার শার বাকী দু ভাইও তাঁর পক্ষে যোগ দিয়ে লড়েছিলেন—নইলে জাহান্দার শার একার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হ'ত না তাঁর মেজভাইকে হারানো। সেদিন বাহাদুর শার সমস্ত রাজশক্তি এবং বহুদিনের সযত্ন-সঞ্চিত পূর্ণ কোষাগার ছিল আজিম-উশ-শানের করতলগত।

তার পর—

আজিম উশ-শানের পরাজয়ের পরও—বাকী দুই ভাইকে সামলানোও কি সম্ভব হ'ত জাহান্দার শাঁর? বিশেষতঃ জাহান শা'র কাছে তো পরাজিত হ'তেই বসেছিলেন সেদিন—জুলফিকর খাঁ না থাকলে কেউ বোধ করি বাঁচাতে পারত না তাঁকে। শুধু শৌর্য নয়—তাঁর বুদ্ধিও—সেদিন নিষ্কণ্টক ক'রে দিয়েছিল মুইজ-উদ্দীন বা জাহান্দার শার সিংহাসন।

অর্থাৎ এক কথায় জুলফিকর খাঁই বলতে গেলে হাত ধরে এনে জাহান্দার শাকে বসিয়েছিলেন দিল্লীর শাহী তখ্‌তে। সেই জাহান্দার শা:ক আজ এমনি ভাবে ত্যাগ করবেন? ত্যাগ করলেও না হয় তবু কথা ছিল—এ যে তাঁকে নিশ্চিত মৃত্যু এবং চরম দুর্দশার মধ্যে ঠেলে দেওয়া।

'না, না, তা সম্ভব নয় বাপজান! এখনও সময় আছে, আমি ওঁকে নিয়ে মুলতান কিংবা দাক্ষিণাত্যে পালিয়ে যাই। দাক্ষিণাত্যে এখনও আমার ডাকে লক্ষ সৈন্য এবং ক্রোর ক্রোর টাকা আসবে তা আমি জানি। তারপর ফররুখশিয়ারকে ঐ সিংহাসন থেকে টেনে নামাতে আমার বেশীক্ষণ সময় লাগবে না!'

'মূঢ়!' প্রবীণ এবং বিচক্ষণ আসাদ খাঁর দৃষ্টিতে তীব্র ভর্ৎসনা ফুটে উঠল। আবারও তিনি বললেন, 'মূঢ়! কালের লেখা ফুটে উঠেছে আশমানে—তুমি পড়তে পারছ না? জাহান্দার-শার কাল ফুরিয়ে গেছে, তার সৌভাগ্য-রবি এখন অস্তাচলে।...তাকে আমরা সিংহাসনে বসিয়েছিলাম ঠিকই—কিন্তু সে আসনের মর্যাদা সে রাখতে পারে নি। দিল্লীর শাহী-তখ্‌ৎকে সে পঙ্ককুণ্ডে নামিয়েছে। আলমগীরের আসনে বসবার সে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত প্রমাণ ক'রে দিয়েছে নিজেকে। তার অপদার্থতায় সামান্য চাষী থেকে শুরু ক'রে দিল্লীর ধনী নাগরিক পর্যন্ত সবাই বিরক্ত। এখন তাকে আবার সেখানে বসাবার চেষ্টা করলে আমরাই হেয় হয়ে যাব প্রজাদের চোখে।'

তা ঠিক।

জুলফিকর খাঁও তা স্বীকার করেন।

গত কয়েকমাসেই জাহান্দার শা তাঁর আচার-আচরণে, তাঁর নির্বোধ প্রমোদ-বিলাসে এবং সাম্রাজ্যের প্রতি অসীম ঔদাসীন্যে নিজেকে একান্ত হাস্যাস্পদ ক'রে তুলেছেন। তাঁকে আবার সিংহাসনে বসানোর চেয়ে হয়তো একটা মর্কটকে বসানোও ভাল। এমন এমন কাজ করেছেন তিনি, যা একেবারে উন্মাদ না হ'লে কেউ করে না। কিন্তু তবুও—

আসাদ খাঁ ছেলের মন বুঝে আবারও বললেন, 'পরশু তো তুমি যুদ্ধটা জিতেই এনেছিলে প্রায়—অকারণে ভয় পেয়ে আর বেগমের পরামর্শে যদি উনি অমন ভাবে পালিয়ে গিয়ে গা-ঢাকা না দিতেন তাহ'লে আজ তো এসব কোন প্রশ্নই উঠত না। বুঝতে হবে স্বয়ং খোদাই বিরূপ হয়েছিলেন ওঁর নির্বুদ্ধিতায়। তিনিই যোগ্যতর লোককে সিংহাসনে বসিয়েছেন। তাঁর বিধানের বিরুদ্ধে যাওয়া কোনমতেই তোমার উচিত হবে না বৎস।'

'বেশ, তাই যদি মানেন তাহ'লে তাঁকে ফিরিয়ে দিই, তিনি যা পারেন নিজেই করুন। কিন্তু একে ভূতপূর্ব মনিব—ভূতপূর্বই বা বলি কেন, এখনও পর্যন্ত আমরা নতুন কোন মনিবের নিমক খাই নি—তায় শরণাগত, তাঁকে মিথ্যা স্তোক দিয়ে ভুলিয়ে শত্রুর হাতে তুলে দেওয়া—না না, বাপজান, এ নিমকহারামি খোদা কখনও ক্ষমা করবেন না।'

'জুলফিকর খাঁ, আমি তোমার বাবা, আমার বয়স বেশী, অভিজ্ঞতাও বেশী।...আত্মরক্ষা সকল ধর্মের শ্রেষ্ঠ ধর্ম। এ ছাড়া আমাদের বাঁচবার কোন পথ নেই। ফররুখশিয়ারের বাবার সঙ্গে আমরা যে দুশমনি করেছি, তার সঙ্গেও যা করলুম—তা সহজে ভোলবার নয়। একমাত্র উপযুক্ত উপঢৌকন বা মূল্য পেলে সে আমাদের ক্ষমা করতে পারে। জাহান্দার শা-ই সেই উপঢৌকন, আমাদের ক্ষমার সেই মূল্য। তিন তিন বাদশার নৌকরি ক'রে যে বিপুল ঐশ্বর্য জমিয়েছি, যে প্রতিপত্তি করেছি—সেই ঐশ্বর্য লুটেরাদের পেটে যাবে, সেই প্রতিপত্তি ধুলোয় লুটোবে—তাই কি তুমি চাও?...অন্য কোন পথ খোলা নেই বৎস, যা বলছি তাই শোন। দিল্লির দরওয়াজা বন্ধ ক'রে দিয়ে ফররুখশিয়ারকে ঠেকাবে কিংবা দাক্ষিণাত্যে গিয়ে বাহিনী গড়বে—এ তোমার উপযুক্ত কথা তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু কার জন্যে করবে? সমস্ত ওমরাহ্ জাহান্দার শার আচরণে বিরক্ত, প্রজারা উত্ত্যক্ত—যত ওস্তাদ খেলোয়াড়ই হও বৎস, একেবারে ফুঁকো কানাকড়ি নিয়ে খেলা যায় না, এটি স্মরণ রেখো।'

জুলফিকর খাঁ এবার নীরব হলেন।

তিনি বীর বটে, যুদ্ধের ব্যাপারে তাঁর বুদ্ধি কারুর চেয়ে কম নয়, কিন্তু

রাজনীতি তাঁর বাপজান তাঁর চেয়ে ঢের বেশী বোঝেন। আসাদ খাঁর সেই ঝুনো বুদ্ধিকে বরাবরই জুলফিকর খাঁ সমীহ বা ভয় ক'রে এসেছেন—আজও সেই ভয়ের কাছেই মাথা নোয়ালেন তিনি। সত্যিই তো—সেদিন যদি আগ্রার যুদ্ধক্ষেত্র থেকে অমন ক'রে কাপুরুষের মতো পালিয়ে না আসতেন জাহান্দার শা, হয়তো আজও তাঁর সিংহাসন তাঁরই থাকত। বলতে গেলে স্বেচ্ছায় হারালেন তিনি—জুলফিকর খাঁ আর কী করবেন!

কাপুরুষ! ভীরু! অপদার্থ!

আলমগীরের পৌত্র, শাজাহানের প্রপৌত্র স্ত্রীলোকের পরামর্শে রণক্ষেত্র থেকে পালিয়ে ছিলেন। তাতেও অপমানের শেষ হয় নি, তারপর নাকি দাঁড়িগোঁফ কামিয়ে বোরখায় মুখ ঢেকে বয়েলগাড়িতে চেপে মেঠোপথ ধরে এখানে এসেছেন চুপিচুপি চোরের মতো! তার চেয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে মরে যেতে পারলেন না?

সেই মুখ নিয়ে আবার এই নিশীথরাত্রের অন্ধকারে একা পায়ে হেঁটে এসে দাঁড়িয়েছেন নিজেরই এক কর্মচারীর দেউড়ীতে—আশ্রয় এবং আশ্বাসের জন্যে! ঠিকই বলেছেন বাপজান, ওকে দয়া করলে খোদাতালা অসন্তুষ্ট হবেন!

জুলফিকর খাঁ মন স্থির করলেন।

তারপর মিথ্যা আশ্বাসে ভুলিয়ে প্রাসাদের একটি নির্জন ঘরে এনে অস্নাত, অভুক্ত, পথশ্রান্ত, আশ্রয়প্রার্থী সম্রাট্—নিজেরই মনিব—জাহান্দার শাকে বন্দী করতে খুব বিলম্ব হ'ল না। বন্দী করলেন—এবং আসাদ খাঁর সঙ্গে সই ক'রে এক চিঠি পাঠালেন নতুন বাদ্‌শা ফররুখশিয়ারের কাছে। কাজটা তাঁরা দু'জনে ভুলই ক'রে ফেলেছেন তাতে সন্দেহ নেই। তবে সে ভুল এখন তাঁরা বুঝতে পেরেছেন এবং সেজন্যে খুবই অনুতপ্ত। যদি বাদ্‌শা তাঁর এই বান্দাদের অপরাধ ক্ষমা করেন তো বান্দারা অতঃপর কায়মনোবাক্যে তাঁর সেবা করবে এবং তাঁর কাজে জীবন উৎসর্গ করবে। অবশ্য অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ একটি কাজ তাঁরা অগ্রিম ক'রেই রেখেছেন। বাদ্‌শার পরম শত্রু অপদার্থ মুইজ-উদ্দীনকে তাঁরা বন্দী করেছেন। এখন অভয় পেলেই সেই শত্রুকে তাঁরা নতুন বাদ্‌শার পদপ্রান্তে পৌছে দেবেন, ইত্যাদি—

সে অভয়ও প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই এসে পৌছল। বাদ্‌শা তাঁদের পরমাত্মীয় বলেই মনে করেন। তিনি আগেই দু'জনকে ক্ষমা করেছেন। তাঁরা যেন অবিলম্বে বাদ্‌শার দরবারে হাজির হন।

আসাদ খাঁ নিশ্চিন্ত হয়ে নিজের বুদ্ধির তারিফ করতে লাগলেন।

কিন্তু জুলফিকর খাঁ কিছুতেই স্বস্তি পান না কেন?

আবারও আসাদ খাঁকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন তিনি—'এখনও সময় আছে বাপজান। আপনার বুদ্ধি আর আমার তরবারি, আপনার টাকা আর আমার খ্যাতি—দাক্ষিণাত্যে পালিয়ে গেলে, হয়তো আমরা এ সিংহাসন নিজেদের জন্যেই জিতে নিতে পারব—'

'চুপ কর। ছেলেমানুষী করিস নে।...মুঘলবংশের সিংহাসন—কার্যত না হোক, নামে অন্তত একজন মুঘলকেই সেখানে বসিয়ে রাখতে হবে।...ভয় কি? আমাকে বাদ দিয়ে আজিম-উশ-শানের বেটা এত বড় সাম্রাজ্য চালাতে সাহস করবে না। তুই নিশ্চিন্ত থাক্।'

এর পরের দিনই খবর পাওয়া গেল—নতুন বাদ্‌শা আগ্রা থেকে দিল্লির দিকে রওনা হয়েছেন। দিল্লিতে যে প্রবল প্রতিরোধের ভয় করেছিলেন জুলফিকর খাঁর কাছ থেকে—সে ভয় আর নেই; শত্রুও করতলগত—লালকিলার বিশেষ বন্দীশালায় জাহান্দার শাকে রাখা হয়েছে, হাতে হাতকড়া এবং পায়ে বেড়ি দিয়ে। নতুন উজীর সৈয়দ আবদুল্লা খাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে গেছেন আসাদ খাঁ, সত্যি-সত্যিই শরণাগত, তাতে সন্দেহ নেই। সুতরাং আপাততঃ নিশ্চিন্ত, কোন তাড়া নেই। ধীরে সুস্থে এগোচ্ছেন বাদ্‌শা, একটু একটু ক'রে —পাচ সাত ক্রোশ অন্তর-অন্তর তাঁবু পড়ছে। আমোদ-আহ্লাদে দিন কাটছে।

অবশেষে—পনেরো-ষোল দিন পরে বাদ্‌শা এসে পৌঁছলেন খিজিরাবাদে, দিল্লী থেকে মাত্র আড়াই ক্রোশ দূরে। আসাদ খাঁ আর অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে থাকতে পারছেন না তখন—তিনি এসে আবারও নতুন উজীরকে ধরলেন। কিন্তু দেখা গেল যে নতুন বাদ্‌শাহও ইতিমধ্যে কম ব্যস্ত হয়ে ওঠেন নি। তাঁর পুরাতন ও বিশ্বস্ত সেবক তকরাব খাঁকে পাঠালেন তিনি আসাদ খাঁ ও জুলফিকর খাঁকে সসম্মানে তাঁর দরবারে নিয়ে যাবার জন্যে।

জুলফিকর খাঁ তবুও ইতস্তত করেন। হঠাৎ বাদ্‌শার এত আগ্রহ কেন?

আসাদ খাঁকে বলেন, 'আপনিই আজ যান বাপজান। অবস্থাটা কি হয় তা দেখে আমি বরং কাল যাবো!'

আসাদ খাঁ দৃঢ়ভাবে ঘাড় নাড়েন,—'সে কোন কাজের কথা নয়। তাতে

বাদ্‌শা আরও চটে যাবেন। নানারকম সোবে করবেন।'

তকরাব খাঁ বলেন, 'বৃথাই আপনি ভয় পাচ্ছেন খাঁ সাহেব। আমি বলছি কোন ভয় নেই!'

জুলফিকর খাঁ বললেন, 'আপনি কথা দিচ্ছেন?'

'এই কোরান স্পর্শ ক'রে বলছি—আমার দেহে রক্তবিন্দু থাকতে আপনার কোন অনিষ্ট হবে না।'

জুলফিকর খাঁ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, 'চলুন বাপজান। আমি তৈরী!'……

তার পরের কথা সবাই জানে।

আসাদ খাঁকে দেখে নতুন বাদ্‌শা আলিঙ্গন ক'রে পাশে বসালেন। আসাদ খাঁ সম্রাটকে খুশী করার জন্যে ছেলের দুই হাত একটা রুমাল দিয়ে বেঁধে নিয়ে গিয়েছিলেন, তিনি নতমস্তকে অপরাধীর মতো সামনে এসে দাঁড়ালেন।

'আসামীকে এনে আপনার পায়ের কাছে ফেলে দিলুম শাহানশাহ, আপনি যা খুশি শাস্তি দিন এবার!' সবিনয়ে জানালেন আসাদ খাঁ।

বাদ্‌শা যেন শিউরে উঠলেন, 'এ কি! বাঁধন কেন? ছি ছি!'

তাঁর ইঙ্গিতে তাড়াতাড়ি কারা সব ছুটে এসে জুলফিকর খাঁর বাঁধন খুলে দিলে।

জুলফিকর খাঁ এবার এগিয়ে এসে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন নতুন মনিরের সামনে! বাদ্‌শা নিজে তাঁর হাত ধরে উঠিয়ে নিজের পাশেই বসালেন। কুশল-বিনিময়ের পর নিজের হাতে খিলাত দিলেন—নতুন পোশাক ও রত্নহার! নিশ্চিন্ত হলেন বাপ-বেটা দু'জনেই।

তখন নমাজের সময় হয়েছে। বাদ্‌শা খাজা কুতবউদ্দীন বখ্‌তিয়ারীর সমাধিতে যাচ্ছেন নমাজ পড়তে। তিনি আসাদ খাঁকে বললেন, 'আপনি এবার গিয়ে বিশ্রাম করুন গে—ভাইয়াজী বরং থাক। আমি নমাজ সেরে এসে ওঁর সঙ্গে কথা কইব। কেমন?'

আসাদ খাঁ কুনিশ করতে করতে বেরিয়ে গেলেন। বাদ্‌শাও রওনা হলেন পীরের দরগার উদ্দেশে। হেসে জুলফিকর খাঁকে বলে গেলেন, 'আপনি তাহ'লে কিছু খাওয়া-দাওয়া করুন ততক্ষণ, বেলাও তো হ'ল ঢের। আমি আপনার জন্যে কিছু খানা বরং এখানেই পাঠাতে বলে দিচ্ছি!'

জুলফিকর খাঁ আভূমি নত হয়ে কৃতজ্ঞতা জানালেন।

কিন্তু বাদ্‌শা চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই কোথা থেকে গজিয়ে উঠল প্রায় দু'শ

তাতারী সৈন্য। চারিদিক থেকে ঘিরল তারা নিরস্ত্র জুলফিকরকে।

তারপর? প্রথমে খানিকটা বিচারের প্রহসন চলেছিল। বাদ্‌শা লোক মারফৎ একটার পর একটা ওঁর অপরাধের কৈফিয়ৎ চেয়ে পাঠাতে লাগলেন। কেন জুলফিকর আজিম-উশ-শানের বিরোধিতা করেছিলেন? কেন মির্জা মহম্মদ করিমকে মেরেছিলেন তাঁরা?...এমনি হাজারো কৈফিয়ৎ! প্রথম প্রথম দু'একটার উত্তর ভাল ভাবেই দিয়েছিলেন জুলফিকর খাঁ। তারপরই বুঝলেন যে এটা একটা ছুতো মাত্র। মরতে তাঁকে হবেই। মিছিমিছি নতি-স্বীকার ক'রে লাভ কি? তখন উদ্ধতভাবে জবাব দিলেন, বাদ্‌শার মারতে ইচ্ছা হয়েছে তাঁকে, সোজাসুজি মারুন। এ অভিনয়ের প্রয়োজন কি!

সঙ্গে সঙ্গে সেই দু'শ তাতারী ক্ষুধার্ত বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল তাঁর ওপর। কেউ লাগাল তাঁর গলায় ফাঁসি, কেউ উঠে নাচতে লাগল তাঁর বুকের ওপর—প্রাণ বেরোবার অনেক পরেও তাঁর মৃতদেহে পুনঃ পুনঃ অস্ত্রাঘাত করতে লাগল কেউ কেউ। অর্থাৎ যে যতটা বাহাদুরী নিতে পারে!

বলা বাহুল্য—ততক্ষণে আসাদ খাঁর বাড়িও ঘেরাও করেছে বাদ্‌শার লোক। বহু বৎসরের সঞ্চিত ঐশ্বর্য, খ্যাতি, প্রতিপত্তি এবং একমাত্র পুত্র—দিগ্বিজয়ী বীর পুত্র—একদিনেই সব হারালেন বৃদ্ধ! অথচ এইসব বাঁচাবার জন্যেই এতবড় গর্হিত কাজ করেছিলেন তিনি: শরণার্থী মনিবের সঙ্গে বিশ্বাস-ঘাতকতা করেছিলেন। এই সব পার্থিব ঐশ্বর্যের জন্যেই—মূল্য দিয়ে যে ঐশ্বর্য কেনা যায় না—ইমান আর ইজ্জৎ খুইয়েছিলেন।

কিন্তু এখানেই কি শেষ?

পরের দিন নতুন বাদ্‌শা দিল্লী প্রবেশ করছেন। লোকে লোকারণ্য পথের দু'পাশে। বিরাট মিছিল চলেছে লালকিলার দিকে। পুরাতন বাদ্‌শার পতন ঘটেছে—নতুন বাদ্‌শা বসবেন তখ্‌ৎ-এ তাউসে। নতুন খেতাব ও খেলাত বর্ষিত হবে, শহরের বাড়িতে বাড়িতে পুষ্প-সজ্জা; রাত্রে আলো দিতে হবে—(নতুন উজীরের হুকুম) বাজিও পুড়বে পথের মোড়ে মোড়ে।

চলেছেন নতুন বাদ্‌শা—হাতীর ওপর সোনার হাওদায় বসে। মাথায় রাজছত্র, ময়ূর-পালকের বিরাট পাখা দিয়ে বাতাস করছেন স্বয়ং মীরজুমলা। দু'পাশ থেকে মুঠো মুঠো টাকা পয়সা ছড়ানো হচ্ছে রাজপথে—কাড়াকাড়ি ক'রে তা কুড়িয়ে নিচ্ছে গরীব-দুঃখীরা।

সুপুরুষ বাদ্‌শা। মুখে তাঁর প্রসন্ন হাসি। হেসে হেসেই অভিবাদন নিচ্ছেন পথের দুধারে দাঁড়ানো প্রজাদের কাছ থেকে।

কিন্তু বাদ্‌শার হাতীর পিছনেই ও হাতীটা কিসের ?

কী বীভৎস দৃশ্য ওটা ?

সবাই প্রশ্ন করে সবাইকে।

হাতীর ওপরে একটা শবদেহ, মুণ্ডহীন। না, ঐ যে, মুণ্ডটাও কে যেন একজন বর্শার বল্লমে বিঁধিয়ে ধরে আছে না ? কার শব ওটা ?

আরে, ঐ তো জাহান্দার শার দেহ !

ক'দিন আগেও যিনি ছিলেন কোটি কোটি প্রজার দণ্ডমুণ্ডের মালিক, তাঁরই মুণ্ডের এই অবস্থা ! কিন্তু তা তো হ'ল। পেছনে ওটা আবার কি ? আর একটা হাতীর ল্যাজে-বাঁধা ওটা আবার কার দেহ ? পা বাঁধা, মাথাটা নিচের দিকে ঝুলতে ঝুলতে যাচ্ছে, হাত দুটো লুটোচ্ছে ভুঁয়ে—পথের ধুলোয় ঘষতে ঘষতে চলেছে ! ক্ষত-বিক্ষত রক্তাক্ত দেহ, নীল বিকৃত মুখ—কিছুই চেনা যায় না।

অবশেষে উত্তরটাও ছড়িয়ে পড়ে বাতাসে—ফিস্‌ ফিস্‌ ক'রে একজন বলে আর একজনকে—সেনাপতি জুলফিকর খাঁর মৃতদেহ ! আমির-উল উমারা, মীর বক্সী—দুর্ধর্ষ, অপরাজেয় বীর জুলফিকর খাঁ।

কালকে যে সবার ওপরে ছিল, আজ সে সবার অবজ্ঞাত। এই-ই বুঝি দুনিয়ার নিয়ম !

প্রকাশ্যেই দর্শকরা চোখের জল ফেলেন ! দীর্ঘনিঃশ্বাসের একটা আতপ্ত তরঙ্গ ওঠে বাতাসে, সে শব্দ বুঝি বাদ্‌শাও পান। তাঁর ভ্রূ কুঞ্চিত হয় একবার। কিন্তু দিল্লীর লক্ষ লক্ষ নাগরিককে নিঃশ্বাস রোধ করতে বলবেন—এত সাহস বুঝি তাঁরও নেই। তাই নিঃশব্দে এই অপ্রকাশ-অভিযোগ হজম করেন।

কিন্তু প্রশ্নের তো এইখানেই শেষ নয়।

তৃতীয় হাতীর ঠিক পরেই, অর্থাৎ জুলফিকর খাঁর গলিত শবদেহের পিছনেই মূল্যবান ভেলভেট মোড়া হাতীর দাঁতের পালকিতে বসে ও বৃদ্ধ কে চলেছেন ?

চেনো নাকি ওঁকে ?

প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর আসে চারদিক থেকে—ওঁকে কে না চেনে—উজীর-এ-আজম আসাদ খাঁ। নতুন বাদ্‌শার বিজয়-উৎসবে আনন্দ প্রকাশ করতে মিছিলে যোগ দেবেন বৈকি উনি ! নইলে চলবে কেন ? বাদ্‌শা যদি অসন্তুষ্ট হন !

হ্যাঁ—আসাদ খাঁই বটে। পঁচাশি বছরের বৃদ্ধ। মাথা উঁচু ক'রে বসে আছেন পাল্‌কিতে। দৃষ্টি স্থির, সামনের দৃশ্যে আবদ্ধ। চোখে এক ফোঁটাও

জল নেই, বুকে হাহাকার আছে কিনা কে জানে! ঠোঁট দুটি নড়ছে শুধু নিঃশব্দে—কী বলতে চাইছেন কে জানে। হয়তো বা ঈশ্বরকেই ডাকছেন এতদিন পরে, অবশেষে!…

শেষ পর্যন্ত বুঝি কার দয়া হ'ল। আকবরাবাদী মসজিদের সামনে এসে হুকুম পাওয়া গেল, আসাদ খাঁর বয়স হয়েছে—মিছিলের সঙ্গে যদি না যেতে চান তো এইখানেই বিশ্রাম করতে পারেন!

পাল্‌কি নামানো হ'ল মসজিদের সামনে, পথের ধুলোর ওপর।

চলে গেল জলুস—বাদ্য ভাণ্ড-কোলাহল। নবীন বাদ্‌শার জয়ধ্বনি দূরে সরে যেতে যেতে এক সময় বহুদূর বাতাসে মিশে গেল। শুধু আকাশ বাতাস আচ্ছন্ন ক'রে সেই বহু সহস্র লোকের পায়ের ধুলো জমে রইল অনেকক্ষণ। তারপর সে ধুলোও থিতিয়ে গেল এক সময়। নগরের বাইরে গ্রাম-প্রান্তের পথ নিঃশব্দ ও জনহীন হয়ে উঠল আবার। কিন্তু আসাদ খাঁ ছুটি পেলেন না, সেই ভাবে সেই পাল্‌কির মধ্যেই বসে রইলেন তিন-চার ঘণ্টা।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার পর নতুন উজীরের বুঝি মনে পড়ল কথাটা। একটা পুরোনো বাড়ির একখানা কামরায় আপাততঃ আশ্রয় দেওয়া হ'ল— তাঁকে ও তাঁর পরিবারের সবাইকে।

অবশ্য বেশী জায়গার আর প্রয়োজনও নেই।

একবস্ত্রে প্রাণ নিয়ে আসতে পেরেছেন শুধু তাঁরা।—

তার পর?

তারপর আর কি?

জুলফিকর খাঁর অপরাধ অল্প—তাই তিনি মরে অব্যাহতি পেলেন। কিন্তু আসাদ খাঁ ঈশ্বরের অমোঘ এবং অব্যর্থ ন্যায়বিচারের জীবন্ত সাক্ষ্যস্বরূপ বেঁচে রইলেন, আরও অনেক দিন। নিজেরই রচিত কৃতকর্মের শ্মশানে বসে রইলেন তিনি।

॥ নয় ॥

'বহল' বা বয়েলগাড়িখানা তৈরী হয়ে অপেক্ষা করছে অনেকক্ষণ ধরে। গাড়োয়ান ঠিক তাগাদা না করলেও—হয়তো এখনও তার মন থেকে পূর্বের সম্ভ্রমবোধ সবটুকু মুছে যায় নি—বারকয়েক সামনে এসে নিঃশব্দে কিছুক্ষণ ধরে অপেক্ষা ক'রে ক'রে ফিরে গেছে।

না, আর দেরি ক'রে লাভ নেই।

লালকুঁয়র অভিভূত, আচ্ছন্নের মতোই উঠে দাঁড়ান। যে সিপাহীরা পাহারা দিচ্ছে, তারাও অসহিষ্ণু হয়ে উঠছে ক্রমশ, একটু পরে হয়তো ধমকই দেবে। বান্দার বান্দা ওরা—কয়েকদিন আগেও তাঁর এতটুকু প্রসন্ন দৃষ্টিলাভের আশায় পিছনে পিছনে পদচিহ্ন লেহন ক'রে ফিরেছে—ওদের কাছ থেকে ধমক খাওয়ার জন্য অপেক্ষা না করাই ভালো। এখনও যে দেয় নি, সেইটেই যথেষ্ট অনুগ্রহ। দিলে কিছুই করবার নেই—আরও অনেক অপমানের সঙ্গে সেটুকুও হজম করা ছাড়া।

কারাগারের আঁকাবাঁকা সঙ্কীর্ণ সিঁড়িপথ দিয়ে সেইভাবেই—অভিভূতের মতোই বেরিয়ে এলেন লালকুঁয়র। কারাগার ঠিক কি রকম তা তিনি জানতেন না, কখনও দেখেন নি। তবে অনেককেই এখানে পাঠিয়েছেন এটা ঠিক—তার মধ্যে কাউকে হয়তো সম্পূর্ণ বিনাদোষেই। লজ্জার সঙ্গে হ'লেও সে কথাটা স্বীকার করতে তিনি বাধ্য। ভাই, বোন, ভগ্নীপতি, অথবা ভাগ্নে কি ভাইপো—এমন কি তাঁর পেয়ারের বাজনদারদেরও সামান্য মাত্র অপ্রীতিভাজন যে হয়েছে, তাকেই নির্বিচারে পাঠিয়েছেন এখানে—হয়তো এখানকার চেয়েও কোন জঘন্য স্থানে। ক'দিন আগেই একজন রক্ষী তাঁকে জানিয়েছে—এই প্রথম যে,—এটা ঠিক সাধারণ কারাগার নয়। সম্মানিত বন্দীদেরই শুধু এখানে রাখা হয়। ত্রিপোলিয়া ফটকের এই বন্দীশালা—এ শুধু রাজনৈতিক বিশেষ বন্দীদের জন্যই। মাটির নিচে সার-সার বহু অন্ধকার কারাগৃহ আছে এই কিলাতেই—ইঁদুর-চামচিকা-আরশুলা-অধ্যুষিত গহ্বর কতকগুলো—সেখানে আজও বহু বন্দী জীবন্ত-সমাহিত অবস্থায় রয়েছে। লালকুঁয়রই হয়তো পাঠিয়েছেন কত লোককে। রাজা বদলাল, রাজশক্তি হাতবদল হ'ল, কিন্তু তাদের কথা নিয়ে কেউ মাথা ঘামাল না। ঘামাবেও না। ঐ একটা জায়গায়

কতকগুলি প্রাণী আজও দ্বিতীয় নুরজাহাঁর সর্বময় কর্তৃত্বের অস্তিত্ব বহন ক'রে চলবে।

সম্রাজ্ঞী নুরজাহাঁ!

হ্যাঁ। লালকুঁয়রের দিনকতক শখ হয়েছিল দ্বিতীয় নুরজাহাঁ হবার। বামন হয়ে চাঁদ ধরবার শখ। সে শখ ভালো ক'রেই মিটল!...

ক মাসেই শেষ হয়ে গেল সব। সম্রাজ্ঞী নুরজাহাঁর পরিণতিও ছিল বৈকি তাঁর চোখের সামনে। কিন্তু লালকুঁয়র সতর্ক হন নি। সে ইতিহাস থেকে কোন শিক্ষাই গ্রহণ করতে পারেন নি। অন্তত এত শীঘ্র সব ফুরিয়ে যাবে তা তিনি ভাবেন নি। জাহান্দার শাহের জীবিতকালের মধ্যেই এ অবস্থা ঘটবে তা কল্পনাও করতে পারেন নি। ভেবেছিলেন, এখন কিছুকাল অন্তত নিশ্চিন্ত।

তাও—নুরজাহাঁর ঠিক এতটা দুরবস্থা হয় নি। তিনি তবু একটা স্বতন্ত্র বাসা পেয়েছিলেন। তার সঙ্গে নাকি পেয়েছিলেন বার্ষিক একলক্ষ টাকা ভাতা আর অসংখ্য দাসদাসী। শাজাহান বাদ্শা নিজে ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছিলেন। তবে নুরজাহাঁ ছিলেন বাদ্শার বিবাহিতা স্ত্রী, আর লালকুঁয়র রক্ষিতা উপপত্নী মাত্র—বাঁদী। এই তো তাঁর পরিচয়!

কথাটা মনে আসার সঙ্গে সঙ্গেই মনের মধ্যে একটা উষ্ণ বিদ্রোহ, একটা নিরুদ্ধ আক্রোশ নিজের বিরুদ্ধেই যেন মাথা তুলে দাঁড়ায়।

কিসের বিবাহিতা স্ত্রী? নুরজাহাঁ যতই হোন—নিকায়-বসা বিধবা বৈ তো নয়। লালকুঁয়র একদা রাস্তাঃ নাচওয়ালী ছিলেন বটে, কিন্তু ঠিক সাধারণ নাচওয়ালীর মেয়ে তিনি নন। ভারতবিখ্যাত সঙ্গীতসাধক মিয়া তানসেন তাঁর পূর্বপুরুষ—অনায়াসে তিনি সে পর্যন্ত পর পর নাম বলে যেতে পারেন পিতৃপিতামহের। তিনিও সুগায়িকা, তাঁর কণ্ঠস্বরও সে পরিচয়ের স্বীকৃতি বহন করছে। বলতে গেলে এই কণ্ঠস্বরেই জাহান্দার শা মুগ্ধ হয়ে ছিলেন এতকাল। মুগ্ধ বললেও হয়তো যথেষ্ট বলা হয় না; সে মোহ তাঁকে অমানুষে পর্যবসিত করেছিল।

'কী হ'ল?'

যে দুজন রক্ষী তাঁর সঙ্গে যাবে ব'লে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেই ভোর থেকে—তাদেরই একজন অসহিষ্ণুভাবে প্রশ্ন করল। কিলাদার ইয়ার খাঁ এতটুকু অনুগ্রহ করেছেন তাঁকে—সঙ্গে দুজন রক্ষী দিতে রাজী হয়েছেন। নইলে যা যৎসামান্য ধুলিগুঁড়ি নিয়ে তিনি যাত্রা করছেন—এটুকুও পৌঁছবে না শেষ পর্যন্ত।

সেই অসহিষ্ণু প্রশ্নে চমক ভাঙ্গল যেন লালকুঁয়রের। তিনি চমকেই উঠলেন।

দিবাস্বপ্নের মধ্যে কখন যে মন্থর গতি একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে, তা তিনি টেরও পান নি। সত্যিসত্যিই থমকে দাঁড়িয়ে গেছেন কখন! অপ্রতিভ লালকুঁয়র মাথা নিচু ক'রে নেমে এলেন তাড়াতাড়ি।

সাধারণ কাপড়ের কানাত দিয়ে ঘেরা অতিসাধারণ একটা বয়েলগাড়ি; তলায় বাঁশের চালির ওপর ঘাস বিছানো, তার ওপর একটা জাজিম পাতার কথাও কেউ ভাবে নি।

না, হাতী তো নয়ই।

আজ আর তাঁকে হাতী পাঠানোর কথা কারুরই মনে পড়া সম্ভব নয়। হয়তো, তেমনভাবে সবিনয় প্রার্থনা জানালে, কিলাদার ঘোড়া একটা দিতে পারতেন। কিন্তু সে ভিক্ষা চান নি লালকুঁয়র। তাঁর যা অবস্থা—আজ ঐ কাপড়েঘেরা বয়েলগাড়িই ভালো। তার ওপর মিছিমিছি খানিকটা দেরি ক'রে ফেলেছেন তিনি—মাঘের সকাল তবু বেশ ফরসা হয়ে গেছে চারদিক। সূর্য উদয়ের আগেই শহরের সীমাত্যাগ করবেন তিনি—এই ইচ্ছা ছিল। সেই-মতোই ইয়ার খাঁ সব ব্যবস্থাও করেছিলেন। তাঁর নিজের দোষেই অনর্থক দেরি হয়ে গেল খানিকটা।

গাড়িতে ওঠবার আগে আবারও এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়ালেন লালকুঁয়র; একবার তাকিয়ে দেখলেন পিছন দিকে—এইমাত্র ফেলে-আসা সেই ভয়ঙ্কর কারাগারটার দিকে। আজ প্রথম তাঁর মনে হ'ল, এই লালকিলা যেন এক দানবের আস্তানা। ঐ যে লাল পাথরের ত্রিপোলিয়া ফটক স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে তাঁর পিছনে—প্রভাতী আলো ও রাত্রির কুয়াশায় মাখামাখি হয়ে—ও যেন জড় পাষাণের তৈরী ইমারত নয়—ওটাও একটা দানব! এখনই, তিনি গাড়িতে উঠে বসলেই, যেন খলখল ক'রে হাসতে হাসতে ছুটে এসে ওর পাষাণ-মুষ্টিতে চেপে ধরবে তাঁর গলা।

লালকুঁয়র শিউরে উঠে তাড়াতাড়ি বোরখায় মুখ ঢেকে গাড়িতে উঠে বসলেন।...

রইল তাঁর সব কিছু পিছনের ঐ দুঃখময় রিক্ত ভয়ঙ্কর কারাগারে প'ড়ে। তাঁর শক্তি, তাঁর মহিমা—তাঁর বাদশা।

দর্পহারী খোদা বুঝি তাঁকে শেষ শিক্ষা দেবার জন্যেই টেনে এনেছিলেন ঐ কারাগারে। দর্পে ও দম্ভে উন্মত্ত হয়ে কাউকেই কখনও গ্রাহ্য করেন নি তিনি।

তারই পুরস্কার মিলল আজ হাতে হাতে। যে বাদ্‌শার শক্তিতে তাঁর শক্তি, যাঁর জন্যে এত দম্ভ—তাঁকেই বা কী অবস্থায় দেখলেন তিনি! লাল পাথরের ঠাণ্ডা ঘর, একটু শয্যা পর্যন্ত দেয় নি তাঁকে ওরা—মাত্র ক'ঘণ্টা আগেও যিনি ছিলেন দুনিয়ার বাদ্‌শা, ওদের দণ্ডমুণ্ডের মালিক। ওজু করার একটা বদ্‌না, আর জলের জন্যে একটা মাটির ঝাঁঝর—আসবাব বলতে এই। একটা সান্‌কিতে ক'রে দিয়ে যেত খানকতক পোড়া রুটি। লালকুঁয়রের কুকুররাও কখনও খায় নি সে রকম খাবার!

তবু, তাই খেয়েও যদি জাহান্দার শাকে বেঁচে থাকতে দিত ওরা! তিনি তো আর কিছুই চান নি ওদের কাছে, শুধু লালকুঁয়রকে কাছে পেতে চেয়েছিলেন মাত্র; ঐ একটিই মাত্র প্রার্থনা তিনি জানিয়েছিলেন বন্দী হবার পর। প্রেয়সী লালকুঁয়র যেখানে থাকবে সেইখানই তাঁর কাছে বেহেস্ত্‌—তা হোক-না কেন তা কঠিন, শীতল, নগ্ন পাথরের কারাগার। সেটুকুও দিতে পারল না ওরা—শুধু বাঁচবার অধিকারটুকু! প্রায়শ্চিত্ত করারও অবসর মিলল না লালকুঁয়রের। জীবনের শেষ ক'টা দিন ওঁর পাশে পাশে থেকে একটু সান্ত্বনা, একটু আনন্দ দেবার চেষ্টা করবেন তিনি—নিজের বেদনার পাত্র প্রণয়ের সুধারসে পূর্ণ ক'রে তৃষিত ওষ্ঠে তুলে ধরে বাদ্‌শার শেষ মুহূর্তক'টিকে সান্ত্বনাময় ক'রে তুলবেন, আর সেই সঙ্গে নিজের অসংখ্য অপরাধের মার্জনা চেয়ে নেবেন—সামান্য এই সুযোগটুকুও বাদ্‌শার দীনতমা বাঁদী লালকুঁয়রকে কেউ দিলে না। কেউ না বলে দিক, আজ লালকুঁয়র বোঝেন যে—তিনিই এই অবস্থার জন্যে, এই সাংঘাতিক সর্বনাশের জন্যে মুখ্যত দায়ী। তিনি আর তাঁর লুব্ধ ক্ষমতা-প্রিয়তা। দ্বিতীয় নুরজাহাঁ হবার নির্বোধ মূঢ় লালসা। নুরজাহাঁর শক্তির এতটুকু কণামাত্রও ছিল না তাঁর—বাদ্‌শাহী করতেও তিনি চান নি—তিনি শুধু চেয়েছিলেন রাজ্যেশ্বরকে পদানত ক'রে, দুনিয়ার সকলের অবনত মাথার ওপর দিয়ে কারুকার্যখচিত এই চটিজুতা-সুদ্ধ হেঁটে যেতে—

হায়রে মূর্খতা!

সে মূর্খতার শাস্তি পেয়েছেন বৈকি লালকুঁয়র। হাতে-হাতেই পেয়েছেন।

আজ নয়—এমন কি, কাল জাহান্দার শা'র অসহায়, অপমানকর ভয়াবহ মৃত্যুতেও নয়—পেয়েছেন প্রায় এক মাস আগেই—যেদিন আসন্ন বিজয়ের সামনে দাঁড়িয়েও পরাজয় বরণ ক'রে নিতে হয়েছিল, লালকুঁয়রের নির্বুদ্ধিতার জন্যেই খানিকটা—সেই দিনই। একমুহূর্ত আগেও যিনি ছিলেন বাদ্‌শা—সেই জাহান্দার শাকে নিয়ে যেদিন গোপনে সকলের দৃষ্টির অগোচরে এইরকম

বয়েলগাড়িতে ক'রে পালাতে হয়েছিল, সেই দিনই। সেনাপতি জুলফিকর খাঁ সারা যুদ্ধক্ষেত্র খুঁজে বেড়িয়েছিলেন, তারপরও, হয়তো তখনও দুজনে দেখা হ'লে ইতিহাস অন্যরূপ হ'ত। কিন্তু তিনিই তা হ'তে দেন নি। অথচ কী পরিণামের মধ্যেই না লালকুঁয়র টেনে এনেছিলেন রাজ্যেশ্বর স্বামীকে তাঁর! স্বামী-ই বলবেন আজ তিনি—জাহান্দার শা তাঁকে ছাড়া আর কাউকেই জীবনে এত ভালবাসেন নি, সুখে দুঃখে জীবনের অংশভাগিনী করেন নি। হৃতসর্বস্ব বন্দী অবস্থায় যেদিন এই পাষাণ কারাগারে ঢোকেন—সেদিনও তিনি শুধু একটি ভিক্ষাই জানিয়েছিলেন।—লালকুঁয়রকে কাছে চেয়েছিলেন। লালকুঁয়র এসে পৌঁছতে আনন্দের কী অনির্বচনীয় হাসিই না ফুটে উঠেছিল বাদ্‌শার মুখে! বলেছিলেন, রক্ষীদের সামনেই বলেছিলেন—'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। আর কোনও চিন্তা নেই আমার—আর কিছুই চাই না।'

উঃ, সেদিনের কথা মনে হ'লে বুক ফেটে যায় লালকুঁয়রের।

লালকুঁয়রই সেজন্য দায়ী। ঘোড়ার পিঠের ওপর থেকে তিনিই জোর ক'রে টেনে নামিয়ে এনেছিলেন জাহান্দার শাকে। তারপর চুল-দাড়ি-কামানো ছদ্মবেশী বাদ্‌শাকে নিয়ে পালিয়ে এসেছিলেন এমনিই এক বয়েলগাড়িতে চেপে। সেদিন যদি যুদ্ধক্ষেত্রেই প্রাণ দিতেন বাদ্‌শাহ—মৃত্যুর অধিক এত অপমান সইতে হ'ত না অন্তত।

যেমন জোর ক'রে নিয়ে পালিয়ে এসেছিলেন, তেমনি যদি জোর ক'রে নিয়ে দূরে কোথাও চলে যেতে পারতেন—বহুদূর দেহাতে কোথাও, যেখানে উচ্চাশা আর উচ্চাভিলাষ পথে পথে এমন সর্বনাশের জাল পেতে রাখে না—সেখানে দুজনকে নিয়ে দুজনে তাঁরা অনায়াসে বাকী জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারতেন। আসবার পথে গাজীমণ্ডীতে একান্ত নিঃস্ব যে তরুণ দম্পতিটিকে তিনি দেখে এসেছিলেন—তাদের মতো—স্বচ্ছন্দে না হোক, শান্তিতে ও সুখে।

কিন্তু তা তিনি পারেন নি। জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে বাদ্‌শার ইচ্ছাকে পদদলিত ক'রে নিজের ইচ্ছার রথচক্রে পিষ্ট করেছিলেন—কেবল ঐ দিনটি ছাড়া, যেদিন ধূলিধূসরিত, ক্লান্ত, হতোদ্যম জাহান্দার শা একাকী লজ্জাবনত শিরে তাঁরই বান্দা আসাদ খাঁ আর জুলফিকর খাঁর দোরে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। আর সেই একান্ত আস্থা এবং নির্ভরতার বদলে পেয়েছিলেন চরম বিশ্বাসঘাতকতা।

উঃ, মানুষ এমন অমানুষও হয়!

মাথার ওপর খোদা আছেন বৈকি! সকলের মাথার ওপরই আছেন

তিনি। যেমন লালকুঁয়রের মাথার ওপরও ছিলেন—তেমনি ওদেরও। জাহান্দার শা'র অপরাধ কম, তাই অল্পের ওপর দিয়েই কেটে গেল। লালকুঁয়র রইলেন সারা-জীবন-ব্যাপী স্মৃতির তুষানলে দগ্ধ হয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে—তাঁর হিমালয়-সমান পাপ ও দম্ভের।

সান্ত্বনা এই, বেইমান-জুটো হাতে-হাতেই বকশিশ পেয়ে গেছে তাদের বেইমানির। বাপ ও বেটা। ওদের বেলাও খোদার এতটুকু হিসাবে ভুল হয় নি।

জুলফিকর খাঁ নাকি এতটা করতে রাজী হন নি। এমন কি তিনি বাদ্‌শাকে নিয়ে মুলতানে কি গুজরাটে কি বিজাপুরে—কোথাও পালিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, সেখান থেকে আবার সৈন্য সংগ্রহ ক'রে জাহান্দার শা'র সিংহাসন পুনরুদ্ধার করার প্রস্তাবও করেছিলেন। কিন্তু ঐ বৃদ্ধ আসাদ খাঁর জন্যেই তা সম্ভব হয় নি। বুড়ো বাপের বুদ্ধি আর হুকুম বহুদিন ধ'রে মানতে অভ্যস্ত জুলফিকর খাঁ অবশেষে আত্মসমর্পণ করেছিলেন বাপের কাছে। তাই জুলফিকর খাঁ অল্পেই রেহাই পেলেন প্রাণটা দিয়ে। জাহান্দার শা'র মতোই সরল বিশ্বাসে এসেছিলেন নতুন বাদ্‌শার দরবারে। আর সেখানে—নিজে যা দিয়েছিলেন তাই ফিরে পেলেন জুলফিকর খাঁ। মিছরির মতো মিষ্টিকথার ভেতর দিয়ে নেমে এল ঘাতকের তীক্ষ্ণ ছুরি তাঁর গলায়!···

কিন্তু জুলফিকর খাঁর এই পরিণতির জন্যেও কি এই হতভাগিনী রাক্ষসী লালকুঁয়র দায়ী নয়?

সেই ইতিহাস আর কেউ না জানুক, লালকুঁয়র জানেন বৈকি!

এসব খবর তিনি ত্রিপোলিয়া ফটকের কারাগারে বসেই পেয়েছেন। আজই পেয়েছেন। চোরের মতো এসেছিল হিদায়ৎ কেশ। কাঁপছে সে, ঝড়ের-মুখে-কাঁপা-বেতের ডগার মতোই কাঁপছে। শাহ্‌জাদা মির্জা মহম্মদ করিমের মৃত্যুর কারণ সে—একথা সে ভোলে নি। সম্ভবত নতুন বাদ্‌শাও ভুলবেন না। চুলে বাঁধা তরবারি ঝুলছে তার মাথার উপর। তাই সে ইমতিয়াজ-মহলের কাছে এসেছিল শেষবারের মতো অনুগ্রহ প্রার্থনা করতে। বেগমসাহেবা যদি দয়া ক'রে একটু কাগজে লিখে দেন যে, হিদায়ৎ কেশ মহম্মদ করিমকে ধরিয়ে দিয়েছিল—এ কথাটা ঠিক নয়, তাঁরাই খবর পেয়ে ওকে হুকুম করেছিলেন করিমকে ধরে নিয়ে আসতে!

নির্বোধ হিদায়ৎ কেশ! এখনও সে ওঁকে ধরে 'তরে' যাওয়ার আশা করে! ফুটো নৌকায় চেপে তুফানের মাঝে সাগর পার হ'তে চায়। জানে না যে ওঁর

সমর্থনই তার বিরুদ্ধে প্রধান সাক্ষী হয়ে দাঁড়াবে হয়তো। ইমতিয়াজ মহল তাকে রক্ষা করতে চান, সেইটেই অপরাধের বড় প্রমাণ বলে গণ্য হবে—

তাছাড়া প্রকাশ্য বিচার হবে—এটাও কি সে আশা করে এখনও? জুলফিকরের ভাগ্য দেখেও শিখল না সে? এ বাদ্‌শা জাহাঙ্গীর নন, শাজাহান নন—প্রকাশ্য বিচারের ভানও করবেন না ইনি।

তবু দিয়েছিলেন লিখে। দুঃখের মধ্যেও হাসি পেয়েছিল তাঁর, তবু লিখে দিয়েছিলেন। না দিয়ে পারেন নি। লোকটা কাঁপছিল। বেতের মতোই কাঁপছিল। ভয়ে একটুকু হয়ে গিয়েছে। ক্ষুদ্র বুদ্ধি, ক্ষুদ্র প্রাণ! তা নইলে সামান্য একটু অনুগ্রহের আশায় ছত্রমলের ছেলে ভোলানাথ হিদায়ৎ কেশ হ'ত না। স্বার্থে সে অন্ধ তাই যথার্থ স্বার্থ কোন্‌টা দেখতে পায় না। স্বার্থবোধ আছে, স্বার্থ-বুদ্ধি নেই। নইলে সদ্যবিধবা অনাথিনীর কাছে আসত না নিজের জন্যে সুপারিশনামা লিখিয়ে নিতে। প্রায় তখনই এসেছে সে—বাদ্‌শার ঐ শোচনীয় মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই।

হৃদয়হীন মূর্খ! তবু বাঁচবে না তবু বাঁচবে না। মির্জা মহম্মদ করিমের সেই শোচনীয় মৃত্যু তার অভিসম্পাতের কলঙ্ক-রেখা এঁকে দিয়েছে ওর ললাটে! সে দেখতে পাচ্ছে না—কিন্তু লালকুঁয়রের কাছে ওর ভবিষ্যৎ স্পষ্ট—প্রভাত-সূর্যের মতোই স্পষ্ট!

হিদায়ৎ কেশই বলে গিয়েছে খবরটা।

জুলফিকর খাঁ নাকি শেষ পর্যন্ত ইতস্তত করেছিলেন। কিন্তু বাদ্‌শার প্রেরিত দূত তকরাব খাঁ কোরান স্পর্শ ক'রে আশ্বাস দেন তাঁকে। অভয় এবং আশ্বাস। এতবড় শপথের পর চক্ষুলজ্জার খাতিরেও অন্তত জুলফিকর খাঁ আর সঙ্কোচ বা আশঙ্কা প্রকাশ করতে পারেন নি।

বেচারী তকরাব খাঁ! জুলফিকরের হত্যাকাণ্ডের পর নাকি তিনি পাগলের মতো হয়ে উঠেছেন। গত দুদিন তাঁর আহার নিদ্রা কিছুই নেই—একটু জল পর্যন্ত মুখে দেন নি তিনি। তাঁর মনে হচ্ছে যে, যে হাতে কোরান স্পর্শ ক'রে তিনি মিথ্যা শপথ করেছেন, সেই হাত তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই শুকিয়ে যেতে শুরু করেছে। তাঁর আর পরিত্রাণ নেই। ইহজন্মে তো নয়ই—পরজন্মেও আল্লার দরবারে এতটুকু করুণা পাবার পথ আর রইল না।

তকরাব খাঁ জানেন না—হয়তো কোনদিনই জানতে পারবেন না যে—তিনি মিথ্যা শপথ করেন নি! জানতে পারবেন না এই জন্যে যে, বাদ্‌শার মর্জির কৈফিয়ৎ নেবার অধিকার কারও নেই। তবু তো তিনি—জুলফিকর খাঁকে

আনতে যাবার আগে, বলতে গেলে চরম ধৃষ্টতারই পরিচয় দিয়েছিলেন। সোজাসুজি প্রশ্ন করেছিলেন বাদ্‌শাকে, 'সম্রাট কি আসাদ খাঁয়ের মৃত্যু চান?'

বাদ্‌শা উত্তর দিয়েছিলেন, 'নিশ্চয়ই না। তাঁরা সম্মানিতব্য ব্যক্তি। আমার আত্মীয়ের মতো। সসম্মানে নিয়ে এস তাঁদের। ব'লো যে কোন ভয় নেই। তাঁদের সম্বন্ধে আমার এতটুকু আর বিরূপতা নেই মনের মধ্যে।'

বাদ্‌শাও তখন আন্তরিক ভাবেই বলেছিলেন কথাটা। তবু অত নিঃসন্দেহে বলা উচিত হয় নি তাঁর—এটাও ঠিক। কারণ তিনি ঠিক নিজের মর্জির ওপর নির্ভর করেন নি এ ব্যাপারে। তাঁর বাপের পিসী মহামান্যা বাদ্‌শা-বেগমের কাছে মত চেয়ে পাঠিয়েছিলেন। তিনি হয়তো মনে করেছিলেন জিন্নত-উন্নিশা তাঁর বাবার স্নেহভাজন ও বড় ভাইয়ের শ্রদ্ধাভাজন আসাদ খাঁ বা তাঁর ছেলেকে ক্ষমা করবারই পরামর্শ দেবেন।

কিন্তু কার্যত তা হয় নি।

বাদ্‌শা বেগম জুলফিকর খাঁকে বধ করারই উপদেশ দিয়েছিলেন। সে উপদেশ অবহেলা করতে পারেন নি নতুন বাদ্‌শা।

বাদ্‌শা-বেগম কেন এই উপদেশ দিয়েছিলেন—তা কেউ জানে না। বাদ্‌শাও না। কিন্তু লালকুঁয়র জানেন। অন্তত অনুমান করতে পারেন।

হিদায়ৎ বলেছে তাঁকে। অশ্রুবিকৃত কণ্ঠে, ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে খবরটা দিয়েছে সে। সংবাদ সংগ্রহই পেশা তার। তুই পুরুষের পেশা। সে হ'ল শাহী দরবারের 'ওয়াকিয়া-নিগার-ই-কুল' *—'সংবাদ-সরবরাহ-কারক'। তার আগে তার বাবাও এই কাজ করত। সুতরাং খবর নেওয়াটা তার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। সম্ভবত ভুল হয় নি হিদায়তের।

সাংঘাতিক খবর দিয়েছে সে।

বাদ্‌শার চিঠি নিয়ে যে ব্যক্তি তাঁর পিতামহীর কাছে গিয়েছিল তার হাতে তিনি জবাব দেন নি—কথাটা ভেবে দেখতে সময় নিয়েছিলেন। চিন্তা করার পর তাঁর মতামত লিখে তিনি পাঠিয়েছিলেন তাঁরই মীর-ই-সামান্‌ সাহুল্লা খাঁর হাত দিয়ে।

সে চিঠি সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় দেয় নি সাহুল্লা খাঁ। আর কেউ না জানুক হিদায়ৎ বেশ জানে। চিঠি নিয়ে শাহী শিবিরে পৌঁছে ওরই মধ্যে একটু নির্জন স্থান বেছে নিয়েছিল সে। সেইখানে বসে কৌশলে মোহর ভেঙে আদ্যোপান্ত চিঠিটা পড়েছিল—তারপর, চিঠির যে অংশে ছিল 'না বায়াদ

* বর্তমান স্টাফ রিপোর্টার বলতে যা বোঝায়।

কুশ্‌ত্‌' অর্থাৎ বধ করা ঠিক হবে না—সেই অংশের 'না' শব্দটি—তীক্ষ্ণধার ছুরির ডগা দিয়ে চেঁচে তুলে ফেলেছিল সাদুল্লা খাঁ। ফলে উপদেশটা দাঁড়িয়েছিল—'বায়াদ কুশ্‌ত্‌।' অর্থাৎ মেরে ফেলাই উচিত।

সাদুল্লা খাঁ খুবই নির্জনে বসে এ কাজ করেছিল। সে ভেবেছিল যে কেউ জানতে পারবে না তার জালিয়াতির কথা। বাদ্‌শার কাজের কৈফিয়ৎ চাওয়ার ধৃষ্টতা কারুর হবে না—সম্ভবত বাদ্‌শা-বেগমেরও না! তাছাড়া নানা ঘটনার আবর্তে হতভাগ্য জুলফিকর খাঁর মৃত্যুটা মানুষের মনে হয়তো চাপা পড়েই যাবে।

সে নিশ্চিন্ত হয়ে সেই জাল চিঠি বাদ্‌শা ফররুখশিয়ারের হাতে তুলে দিয়েছিল।

কেউ দেখে নি ভেবে নিশ্চিন্তে ছিল সাদুল্লা খাঁ। সে ভুলে গিয়েছিল যে সব অসৎ কাজেরই সাক্ষী রাখেন ভগবান—কাউকে না কাউকে। একজন দেখেছিল ঠিকই। হিদায়ৎ কেশ দেখেছিল ঘটনাটা, আদ্যোপান্তই দেখেছিল। প্রথম থেকে সাদুল্লা খাঁর মুখভাবটা ও লক্ষ্য করেছিল। মুখভাবে চাপা উত্তেজনা আর আশঙ্কা ঢাকতে পারে নি সাদুল্লা খাঁ। সেই মুখ দেখেই নিঃশব্দে ওর পিছু নেয় হিদায়ৎ। ছুঁচোর মতোই ছায়ায় ছায়ায় তার গতিবিধি—ছুঁচোর মতোই নিঃশব্দ তার চলন। এমন কি তার নাকি নিঃশ্বাসেরও শব্দ হয় না। তাই তার উপস্থিতি একটুও টের পায় নি সাদুল্লা খাঁ।

হিদায়ৎ কেশের নাকি এও একটা বড় অস্ত্র। তার বিশ্বাস সাদুল্লা খাঁ এবার উজীর হবে। প্রধান উজীরও হ'তে পারে হয়তো। লোকটার খুব বুদ্ধি, আর খুব করিতকর্মা ও। না পারে এমন কাজই নেই। ওর উন্নতি অবধারিত। আর সেই সময়—এই জালিয়াতির ইতিহাস রইল হিদায়তের হাতে—কাফেরদের ভাষায় ব্রহ্মাস্ত্র একেবারে।

তখন ওর মাথায় পা দিয়ে খুব উঁচুতে পৌঁছতেও হিদায়তের অসুবিধা হবে না।

জুলফিকর খাঁর ওপর সাদুল্লা খাঁর রাগের কারণও একটা বলেছিল হিদায়ৎ কেশ। বাহাদুর শার উজীর মুনিম খাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে মহব্বৎ খাঁর যখন সে পদ পাবার কোন আশা রইল না—তখন সাদুল্লা খাঁ উঠে-পড়ে লেগেছিল ঐ পদের জন্য। সেই সময় জুলফিকর খাঁও চেষ্টা করেছিলেন তাঁর বাপকে ঐ পদটা দেওয়াতে। আসলে আসাদ খাঁই তো উজীরী করে আসছেন—সেই আলমগীর বাদ্‌শার আমল থেকেই—শুধু অতি দীন অবস্থা

থেকে তিনি উঠেছিলেন বলেই 'উজীর' পদবীটা তাঁকে দেওয়া হয় নি। এবার এ পদবী তাঁর পাওয়া উচিত—জুলফিকর খাঁ এই কথাটাই বাহাদুর শাকে জানিয়েছিলেন।

অবশ্য আসাদ খাঁ পদবীটা পান নি—একই পরিবারের হাতে সাম্রাজ্য-শাসনের সব ভার তুলে দেওয়াটা পছন্দ হয় নি বাহাদুর শার। কিন্তু তবু ওদের জন্যই সাদুল্লা খাঁও (তখন তিনি হিদায়ৎ-উল্লা মাত্র) সে পদবী পান নি। জুলফিকর খাঁকে চটাতে সাহস হয় নি বাদ্‌শার, তাই স্বয়ং শাহ্‌জাদা আজিম-উশ্‌শান্‌কে, নামে অন্তত, উজীর-এ-আজম ক'রে সাদুল্লা খাঁকে ওয়াজারাত খাঁ উপাধি দিয়ে তাঁর অধীনে দেওয়ানের পদ দিয়েছিলেন।

সেই রাগই নাকি ভুলতে পারেন নি সাদুল্লা। সেই রাগ এবং ভবিষ্যতের আশঙ্কা! জুলফিকর খাঁকে যদি নতুন বাদশা ক্ষমা করেন তো প্রধান উজীরের গদীটা এবারও তাঁর নাকের সামনে থেকে ফস্‌কে যাবে হয়তো। তাই পথের কাঁটাটাই চিরদিনের মতো দূর করতে চেয়েছিলেন সাদুল্লা খাঁ।

সাদুল্লা খাঁর জালিয়াতির কারণ হিদায়েৎ কেশ যাই দিক, লালকুঁয়র জানেন আসল কারণ।

লালকুঁয়রই সেই কারণ। পরোক্ষভাবে তিনিই দায়ী।

লালকুঁয়রের রূপের সুরা যাদের একেবারে উন্মাদ করেছিল—হিদায়ৎ-উল্লা খাঁও তাঁদের একজন।

হ্যাঁ—উন্মাদই হয়ে গিয়েছিল হিদায়ৎ-উল্লা খাঁ।

তখনও জাহান্দার বাদ্‌শা হন নি, শাহ্‌জাদা মুইজ-উদ্দীন মাত্র, মুলতানের শাসনকর্তা।

কী একটা মেলা উপলক্ষে শাহ্‌জাদা লাহোরে এসেছিলেন। সেই সময়েই হিদায়ৎ-উল্লা খাঁ বা ওয়াজারাত খাঁ দেখা করতে আসে শাহ্‌জাদার সঙ্গে। লালকুঁয়র সঙ্গেই ছিলেন; ওঁকে ছেড়ে এক মুহূর্তও থাকা অসম্ভব ছিল মুইজ-উদ্দীনের পক্ষে, তাই তিনি ওঁর সম্বন্ধে কোন পর্দাই মানতেন না। রথে অথবা হাতীতে চড়ে প্রায়ই একত্রে বেড়াতে যেতেন, এমন কি বাজারেও যেতেন মধ্যে মধ্যে—সমস্ত বাদশাহী ঐতিহ্য লঙ্ঘন ক'রে। বাদ্‌শা হবার পরও লালকুঁয়রের ধৃষ্টতা তাঁকে ঐভাবে হাটে-বাজারে টেনে নিয়ে গেছে। আরও অসংখ্য উপায়ে বাদশাহী শালীনতা, মর্যাদাবোধ এবং আদবকায়দা ভঙ্গ করিয়েছিলেন তিনি।

কিন্তু সে কথা যাক্‌।—ওয়াজারাত খাঁর বিনয়-নম্র ব্যবহারে খুশী হয়ে

মুইজ-উদ্দীন লালকুঁয়রের একখানা গান শুনে যাবার আমন্ত্রণ জানিয়ে বসলেন! সে-ই ওঁদের দুজনের চে'খে চোখে মিলল। অথবা হিদায়ৎ-উল্লারই চোখে পড়ল জ্বলন্ত শিখার মতো একটি নারী-লাবণ্য। লালকুঁয়র শুধু ভাল নর্তকীই ছিলেন না, সুগায়িকাও ছিলেন। কিন্তু গান কী শুনেছিল তা ওয়াজারাত খাঁ আজও জানে না। সে অবাক হয়ে দেখেছিল, শুধুই দেখেছিল। তারপর সে মজলিশ থেকে বেরিয়ে এসেছিল মোহাচ্ছন্ন অভিভূতের মতোই। এমন কি বেরিয়ে আসবার সময় বাদশাজাদাকে কুর্নিশ করবার কথাও ভুলে গিয়েছিল সে। অবশ্য মুইজ-উদ্দীন তাতে রাগ করেন নি। তাঁর প্রিয়তমাকে দেখে ও তার গান শুনে বেচারীর মাথা ঘুরে গেছে – এই ভেবে বরং আনন্দই পেয়েছিলেন খুব। হা-হা ক'রে হেসেছিলেন অনেকক্ষণ ধরে। লালকুঁয়রের চিবুকটি ধরে একটু নেড়ে দিয়ে বলেছিলেন, 'দিলে তো বেচারীর জিন্দিগীটি নষ্ট ক'রে? যাহোক স্ত্রীপুত্র নিয়ে ঘর করছিল বেচারী—এখন মাথাটি এমন ঘুরিয়ে দিলে, ও কি আর কাজকর্ম ক'রে খেতে পারবে ভাবছ? বে-হোঁশ দিওয়ানা হয়ে পথে পথে ঘুরবে—তোমার নাম জপ করতে করতে!'

লালকুঁয়রও হেসেছিলেন খুব। তারপর বলেছিলেন, 'হাঁ, সবাই তোমার মতো কিনা! অমনি মেয়েছেলে দেখলে আর দিওয়ানা হয়ে গেল!'

'আচ্ছা ছাখো! বলি শুরুতেই তো মালুম পেলে!...দরবারের কায়দাই ভুলে গেল। আমার ঠাকুর্দার আমল হ'লে এখনই গর্দানা যেত।'

সত্যিই বেচারী ওয়াজারাত খাঁ যেন দিওয়ানা হয়েই গিয়েছিল।

কিন্তু এ আর একরকম।

জোর-জবরদস্তি নয়! ষড়যন্ত্র ক'রে জাহান্দারের সর্বনাশও করতে চায় নি। এমন কি প্রেম নিবেদন ক'রে লালকুঁয়রকে উত্ত্যক্ত ক'রেও তোলে নি। নীরবে একতরফাই ভালবেসে গেছে সে, নিঃশব্দে পূজা ক'রে গেছে। প্রতিদান চায় নি। শুধু চেয়েছে যতটা সম্ভব কাছে কাছে থাকতে। তাই থেকেওছে—কারণে অকারণে ছুতো ক'রে তাঁর চারপাশে ঘুরেছে অহরহ। শুধু দুটি চোখের দৃষ্টি অবিরাম তাঁর পায়ে এক মুগ্ধ হৃদয়ের কাকুতি নিবেদন করেছে। দেখেই খুশী ছিল সে, দেখে আর তাঁর হুকুম তামিল ক'রে। তুচ্ছাতিতুচ্ছ খেয়ালও চরিতার্থ করতে পারলে যেন অনুগৃহীত বোধ করত সে।

লালকুঁয়র ভক্তের এই বিনম্র আচরণে খুশী হয়েছিলেন। অবশ্য খুশির বেশী কিছু নয়। যে যাই বলুক—অনেকেই অনেক কথা বলে তা তিনি জানেন, লোকে মনে করে শুধুই অর্থলোভে, শুধুই সিংহাসনের লোভে নির্বোধ জাহান্দারের

ঘাড়ে চেপেছেন তিনি, তাঁকে দিয়ে বাঁদর-নাচ নাচিয়েছেন—কিন্তু আসলে তা নয়। লোভ ছিল তার—আজ কেন, কোন দিনই তিনি তা অস্বীকার করেন নি। শাহী তাজ তাঁর পায়ে লোটাবে, তখ্‌ৎ-এ-তাউস নিয়ে তিনি ছিনিমিনি খেলবেন—এ শুধু লোভ নয়—উদগ্র কামনাই ছিল তাঁর। কিন্তু তবু—জাহান্দার শার মতো সর্বগ্রাসী সর্ববিধ্বংসী প্রচণ্ড প্রেম না থাক, তাঁরও অন্তরের প্রেমের আসনটি তিনি জাহান্দার শাকেই দিয়েছিলেন, সে আসনে আর কোনদিনই কাউকে বসান নি। তার চেয়ে উচ্চ আসন হয়তো দিয়েছিলেন—সে তাঁর অহমিকাকে, কোন মানুষকে নয়। তাই ওয়াজারাত খাঁর আচরণে খুশী হয়েছিলেন বটে কিন্তু তা নিয়ে মাথা ঘামান নি। তাঁর আত্ম-অহঙ্কার তৃপ্ত হয়েছিল ওর পূজায়—ঐ পর্যন্ত। ভক্ত যে প্রসাদও প্রার্থনা করে, তা তিনি একবারও ভেবে দেখেন নি।

অবশ্য ওয়াজারাত খাঁও—আজ পর্যন্ত সে স্পর্ধা প্রকাশ করে নি—এটাও ঠিক। আজ সে পুরাতন মনিবকে পুরাতন পাদুকার মতোই ত্যাগ ক'রে নতুন মনিবের পাদুকা লেহন করতে গেছে বটে কিন্তু সে তো আরও অনেকেই গেছে। আত্মরক্ষা সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম। নিজের এবং নিজের স্বজনের জীবন-ধন-মান রক্ষা করতে যদি সে ডুবন্ত ফুটো নৌকো ত্যাগ ক'রে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য নতুন নৌকোয় পা দিয়ে থাকে তো দোষ দেওয়া যায় না একটুও। যতদিন জাহান্দার শা একেবারে না ডুবেছেন ততদিন তো সে ত্যাগ করে নি তাঁকে!

বরং—যে উজীরীর পদ নিয়েই জুলফিকর খাঁর সঙ্গে তার মনোমালিন্য—জাহান্দার শা সিংহাসনে বসার পর স্বাভাবিক ভাবেই যখন জুলফিকর খাঁ উজীরী নিলেন, তখনও সে তাঁদের ত্যাগ করে নি। সেও অনায়াসে সৈয়দদের মতো পুবের দিকে চলে যেতে পারত, পারত ফররুখশিয়রের পতাকাতলে গিয়ে সমবেত হ'তে। তাহ'লে আজ এমন অবিসংবাদীভাবে সৈয়দ আবদুল্লা খাঁ প্রধান উজীর হয়ে বসতে পারতেন না। অন্তত শেষ পর্যন্ত ওয়াজারাত খাঁর সঙ্গে আপস রফা করতে হ'ত একটা।

তা সে করে নি।

অনায়াসেই সে ছেড়ে দিয়েছে তার বহুদিনের ঈপ্সিত পদ জুলফিকরকে। এমন কি জুলফিকর খাঁর প্রাধান্যও মেনে নিয়েছে সে সবিনয়ে। অনেকেই বিস্মিত হয়েছিল এই আচরণে কিন্তু লালকুঁয়র হন নি। তিনি জানতেন কেন সে যায় নি, কেন বিদ্রোহ করে নি। কেন সে এত পদ থাকতে বাদশার খান-ই-সামানের পদটি চেয়ে নিয়েছে।

সে শুধু লালকুঁয়রের কাছে কাছে থাকবার জন্যে।

শুধু তাঁকে নিয়ত চোখে দেখবার সুযোগের জন্যেই। নিরবে নিঃশব্দে চোখে চোখে ভক্তের অন্তরের সর্বশ্রেষ্ঠ অর্ঘ্যটি নিবেদন করার জন্যে।

তার এই নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার তপস্যায় খুশী হয়েছিলেন তার দেবী। অবশ্য সর্বশ্রেষ্ঠ ফল, পরম সিদ্ধি তাকে দিতে পারেন নি—তবে কিছু বর দিয়েছিলেন বৈকি!

হিদায়ৎ-উল্লা খাঁর শুধু উজীর হবার বাসনাই ছিল না।

শাজাহান বাদ্‌শার বিখ্যাত উজীর সাদুল্লা খাঁর খেতাবটিও তার কাম্য ছিল।

ইতিহাসে সেও সাদুল্লা খাঁ নামে পরিচিত হবে। বহুদিন পরের ইতিহাস-পাঠকদের মনে দুই লোক এক নামে মিলেমিশে একাকার হয়ে যাবে—এ গোপন উচ্চাশাও ছিল বোধ হয়।

তাই দেওয়ানী পাবার পর সে ঐ উপাধিটি প্রার্থনা করেছিল বাদ্‌শার কাছে। কিন্তু মুক্ত-হস্ত উদার বাহাদুর শা তার বেলাতেই কৃপণ হয়ে গিয়েছিলেন, সে প্রার্থনা পূর্ণ করেন নি। দরখাস্তের কোণে স্বহস্তে লিখে দিয়েছিলেন—'নামে সাদুল্লা খাঁ হয়ে লাভ কি? কাজে হ'তে পারে?—সাদুল্লা খাঁ ইতিহাসে একজনই জন্মেছিলেন, সে খেতাব অত সহজ নয়। প্রার্থীকে সায়েদুল্লা খাঁ উপাধি দেওয়া গেল।'

সামান্য তফাৎ। তবু হিদায়ৎ-উল্লা খুশী হয় নি। নতুন উপাধি ব্যবহারও করে নি সে। ওয়াজারাত খাঁ নামেই স্বাক্ষর করত চিঠিপত্র ও দলিল।

তার মনের এই গোপন ক্ষতটির ইতিহাস জানতেন লালকুঁয়র। ওয়াজারাত খাঁই তার এই ক্ষোভ জানিয়েছে বহুদিন—কথা প্রসঙ্গে।

শাহী-তখ্‌ৎ করায়ত্ত হবার পর চারিদিকে যখন অবিশ্বাস্য অনুগ্রহ বর্ষণ করতে শুরু করেন লালকুঁয়র, তখন সর্বাগ্রে তাঁর এই ভক্তটিকেই মনে পড়েছিল। তাকে তার ঈপ্সিত উপাধিটি দান করেছিলেন।

হিদায়ৎ-উল্লা খাঁ উজীরী পেল না বটে—উপাধিটা পেল।

ছায়ার মতোই কাছে কাছে থাকত সাদুল্লা খাঁ—খান-সামান!

ছোটখাটো আদেশ পালন করতে পারলে, সামান্যতম খেয়াল মেটাতে

* খানসামা শব্দটি সম্ভবত এই থেকেই এসেছে। কিন্তু বাদ্‌শার খান-সামান বলতে বোঝাত Lord High Steward.

পারলেও নিজেকে কৃতার্থ মনে করত সে! অনেক সময় মুখে তা প্রকাশ করতেও হ'ত না, চোখের ইঙ্গিতেই ইচ্ছা বুঝে নিয়ে কাজে পরিণত ক'রে দিত।

আর তখন খামখেয়ালের শেষও তো ছিল না।

উন্মত্ত হয়ে উঠেছিলেন লালকুঁয়র। ক্ষমতার সুরা আকণ্ঠ পান ক'রে কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান হারিয়েছিলেন। মনে হয়েছিল আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপই বুঝি হাতে এসেছে। পথের ভিখারী বাদশার বাদশা হবার স্বপ্ন দেখেছিল, সে স্বপ্নও যখন মিটেছে তখন সবই মিটবে। এ সৌভাগ্যের শেষ হবে না কোনদিন। খোদা বিশেষ প্রসন্ন তাঁর ওপর—স্বয়ং খোদারই পরোয়ানা বুঝি তাঁর ললাটে! মাতাল যেমন মদের মাত্রা বাড়িয়ে যায়, তেমনি তিনিও ক্ষমতা-পরীক্ষার মাত্রা বাড়িয়েই যাচ্ছিলেন দিন দিন।

চরম হ'ল সেদিন।

হ্যাঁ—এই সেদিন, গত শ্রাবণ মাসে।

শুধু মনে হচ্ছে বহু যুগের কথা। বহু অতীত যুগ আগের।

শাওন-ভাদোঁর* জলকেলি তখনও শুরু হয় নি—অপরাহ্নের বিশ্রামের পালা চলেছে। সামান-বুরুজে বসে আছেন বাদশা ও তাঁর প্রেয়সী। সামনে যমুনা বয়ে চলেছে। শীত বা গ্রীষ্মের নীলসলিলা ক্ষীণাঙ্গী কিশোরী নয়—আষাঢ়-শ্রাবণের গৈরিকবর্ণা পূর্ণ-যুবতী যমুনা, উদ্দাম গতিতে বয়ে চলেছে তার পথে—অসংখ্য ছোটখাটো আবর্ত সৃষ্টি করতে করতে।

অলস অপরাহ্ন—শরবৎ, তামাক আর রসিকতায় কাটছে। মদের পালা তখনও আরম্ভ হয় নি। দিবানিদ্রার পর দুজনেই বেশ প্রকৃতিস্থ। সুতরাং অপ্রকৃতিস্থতার অজুহাত দেওয়ারও উপায় নেই।

সেই খরস্রোতা নদীতেও খেয়া পারাপার চলছিল। বিরাট একটি নৌকা-বোঝাই অসংখ্য নরনারী পার হচ্ছিল সে সময়। ওপারের গাঁ থেকে এপারে এসেছিল মাল বেচতে, গম দাল সব্‌জী, আরও কত কী। অন্য প্রয়োজনেও এসেছিল হয়তো। এখন ফেরত-যাত্রী সব। সবারই তাড়া আছে—ওপারে পৌঁছেও হয়তো বহুদূর গ্রামে হেঁটে যেতে হবে। দু'তিন ক্রোশ বা তারও বেশী। তাড়া না করলে সন্ধ্যার আগে পৌঁছতে পারবে না। পথঘাট ভালো নয়। জাঠ ডাকাতদের অত্যাচারে অল্প দু-চার সিক্কা টাকা নিয়েও সন্ধ্যার পর চলাফেরা করা নিরাপদ নয় ওপারে।

* লালকিলার প্রমোদ-উদ্যান। এখানে বাদশারা শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে রাত্রি যাপন করতেন জলকেলিও চলত।

তাই নৌকাটিতে যা লোক ওঠবার কথা, তার চেয়ে ঢের বেশী উঠেছিল। সত্তর-আশি জনের কম নয়। নৌকা আর সামান্যই জেগে আছে জল থেকে। মনে হচ্ছে জলের ওপরই বসে আছে লোকগুলো।

তা হোক। এমনিই প্রত্যহ যায় ওরা। আর কতক্ষণেরই বা পথ। বাতাস অনুকূল—পূর্ণপালে চলেছে নৌকা, এখনই ওপারে পৌঁছে দেবে। শান্ত নিরুদ্বিগ্ন সবাই।

বাদশাই কথাটা তুললেন, 'ছাখো লোকগুলোর কাণ্ড। এতগুলো লোক চাপিয়েছে নৌকোয়, একজনও যদি এদিক ওদিক নড়াচড়া করে তো নৌকো যাবে উল্টে। আর নদীর যা অবস্থা, বর্ষার ভরা নদী—ঐ স্রোতে পড়লে আর কাউকে বাঁচতে হবে না! আচ্ছা বেঅকুফ ওরা, ইজারাদার তো পয়সার লোভে লোক তুলবেই—ওদের প্রাণের ভয় নেই?'

লালকুঁয়রও চেয়ে ছিলেন সেদিকে। হঠাৎ বাদশার কোলের কাছে হেলে পড়ে বললেন, 'আমি কখনও নৌকাডুবি দেখি নি! তুমি দেখেছ শাহানশা?'

'দেখেছি বৈকি। পাঞ্জাবে ছিলুম,—ইরাবতী, শতদ্রু, বিপাশা, চন্দ্রভাগা, —সাংঘাতিক নদী সব। কত লোক মরে ফি-বছর নৌকোডুবিতে!'

'লোকগুলো ছট্‌ফট্‌ করে খুব? হাঁকড়-পাঁকড় করে আর জল খায়— না?'

'হ্যাঁ—তা করে।'

'ভারি মজা লাগে দেখতে, না? আমি কখনও দেখি নি! তুমি সব জিনিস বেশ একা একা ভোগ ক'রে নিয়েছ—আগে ভাগেই। যাও!'

কৃত্রিম অভিমানে ঠোঁট ফুলিয়ে করসির নলসুদ্ধ বাদশার হাতটা একটু নেড়ে সরিয়ে দেন ইমতিয়াজ মহল।

অপ্রতিভের মতো মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসেন বাদশা। বলেন, 'ভয় কি—এদের যা অবস্থা, এখানে বসে বসেই একদিন দেখবে!'

'হ্যাঁ—তাই নাকি! কবে ডুববে, হা-পিত্যেশ ক'রে বসে থাকি!'

বাদশা জবাব দিতে পারেন না।

পিছনেই ছায়ার মতো দাঁড়িয়ে ছিল সাদুল্লা খাঁ। শুনেছিল সবই। দয়িতার অভিমান-ক্ষুব্ধ কণ্ঠস্বর বুঝি কাঁটার মতো বিঁধেছিল বুকে!

নিঃশব্দেই সরে গিয়েছিল সে।—

পরের দিন সব আয়োজন তৈরী ছিল।

নৌকো-ভরা লোক যাবে। সে নৌকো মাঝ-নদীতে উল্টে দেওয়া হবে।

ইচ্ছা ক'রেই। স্বেচ্ছায় ডোবাতে হবে। সেইরকম হুকুম দেওয়া হয়েছে ইজারাদারকে।

না হ'লে তারই শুধু গর্দান যাবে না, তার সপুরী একগাড়ে যাবে।

ডোবাতে হবে মাঝি-মাল্লাদেরই। তাদের ওপর হুকুম হয়েছে—তারা সাঁতরে পারে চলে আসবে।

কিন্তু তাদের মুখ শুকিয়ে উঠেছে। সাঁতার জানে তারা, কিন্তু শ্রাবণের এই উন্মত্ত খর-তরঙ্গিণী নদীতে সাঁতার দেওয়া! আর এখনকার এই বিপুল প্রশস্ত নদী। সে কি মানুষের সাধ্য! মৃত্যু যে নিশ্চিত! তারা বেঁকে দাঁড়াল। রাতারাতি পালাবে তারা, যেখানে হোক। জঙ্গলে গিয়ে লুকিয়ে থাকবে। তারপর চলে যাবে দেহাতে কোথাও। তারা খেটে খেতে এসেছে, বেঘোরে জান দিতে আসে নি। যেখানে হোক খেটে খেতেও পারবে।

ইজারাদার চোখে অন্ধকার দেখলে। ওরা অনায়াসেই পালাতে পারে—কিন্তু সে কোথায় যাবে, ঘর-বাড়ি আত্মীয়স্বজন ছেড়ে?

সে লোকটি সারারাত ঘুমোতে পারল না। ভোরবেলাই ছুটল তার আত্মীয় মুনিম খাঁর কাছে। মুনিম খাঁ উজীরকে গিয়ে জানালেন।

তখন ঠিক তাঁর দরবারে আসবার সময়।

সেই মুখেই সংবাদটা শুনে ক্রোধে ও ঘৃণায় দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে চলে এসেছিলেন জুলফিকর খাঁ। জুলফিকর খাঁ তখন প্রায় সর্বশক্তিমান। কাউকেই ভয় করবার তাঁর কোন কারণ ছিল না।

অবশ্য বাদ্‌শার সামনে কি করতেন তা বলা যায় না। ভাগ্যক্রমে তখনও বাদ্‌শা দরবারে দেখা দেন নি। সারারাত্রির উন্মত্ত উৎসবের পরে সুরাপানোন্মত্ত বাদ্‌শার বেশ একটু বিলম্বই হ'ত ঘুম ভেঙ্গে উঠতে। ঠিক সময়ে দরবার নেওয়া কোনদিনই হয়ে উঠত না তাঁর।

বাদ্‌শা না এলেও সভাসদদের সভায় হাজির থাকতে হ'ত। সেদিনও ছিলেন সবাই। খান-সামান সাদুল্লা খাঁও ছিল। আর সভায় ঢুকতেই তাঁর সামনে পড়ে গেল সাদুল্লা খাঁ।

জুলফিকর খাঁ রাগ সামলাতে পারেন নি। সমস্ত আদবকায়দা ভুলে প্রচণ্ড একটি চপেটাঘাত করেছিলেন সাদুল্লা খাঁকে। সবাই অবাক! অনেকেই উঠে দাঁড়িয়ে পড়লেন আসন ছেড়ে। যতই হোক—পদস্থ আমীর সাদুল্লা খাঁ—তাঁকে এমন অপমান! অনেকেরই মুখ-চোখ লাল হয়ে উঠেছে সঙ্গে সঙ্গে।

সাদুল্লা খাঁ যুদ্ধ-ব্যবসায়ী নয়, যোদ্ধা তো নয়ই। তবু সেও তরবারিতে

হাত দিয়েছিল বৈকি।

কিন্তু চরম অবজ্ঞায় সেদিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে হাত তুলে বুঝি নিরস্ত করলেন জুলফিকর খাঁ। বললেন, 'ভাই সব, আমার অপরাধ নেই না। আমি যা করেছি, হঠাৎ করি নি, জেনে বুঝেই করেছি।...বরং বলা চলে একে চড় মেরে একটা অন্যায় কাজ করেছি, আমার হাতেরই অপমান করেছি। এ লোকটা অমানুষ— পশু, পশুরও অধম। এ কি করেছে জানেন?'

সেই মুহূর্তে বাদ্‌শা এসে পড়েছিলেন।

কথাটা তখনকার মতো স্থগিত রেখে সবাই অভিবাদনে নত হয়ে দাঁড়িয়েছিল—তবু সকলকার চোখে-মুখের উত্তেজনা বাদ্‌শার চোখ এড়ায় নি। তিনি আসনে বসেই কারণ জানতে চেয়েছিলেন সে উত্তেজনার।

জুলফিকর খাঁ সাদুল্লাকে কিছু বলবার অবকাশ দেন নি। নিজেই এগিয়ে এসে অভিবাদন ক'রে বলেছিলেন, 'শাহানশা, আমি এই লোকটাকে চড় মেরেছি।'

'সে কি? আমার খান-সামানকে? কেন? কী আশ্চর্য! এ আপনার কি মতিগতি?' বাদ্‌শা সবিস্ময়ে প্রশ্ন করেছিলেন।

'শুনুন জনাবালি, কাল নাকি আপনার সামনে মাননীয়া ইমতিয়াজ মহল কি লঘু আলাপপ্রসঙ্গে বলেছিলেন যে তিনি কখনও নৌকাডুবি দেখেন নি। হঠাৎ নৌকোডুবি হ'লে লোকগুলো কেমন হাঁক-পাঁক করতে করতে মরে—সেই বিষয়ে অলস কৌতূহল প্রকাশ করেছিলেন। সেইখানে ছিল ঐ ইতরটা, সে কথা শুনে তাঁর মনোরঞ্জন ক'রে ইহকালে নিজের কিছু সুবিধা ক'রে নেওয়ার জন্য ঐ লোকটা কি করেছে জানেন? খেয়াঘাটের ইজারাদারকে হুকুম দিয়েছে যে আজ বিকেলে আপনারা যখন সামান-বুরুজে বসে থাকবেন তখন এক নৌকা-যাত্রীসুদ্ধ মাঝ-দরিয়ায় নৌকো ডুবোতে হবে।...দু'চারজন হ'লে চলবে না, নৌকো-ভরা লোক থাকা চাই, অন্তত সত্তর-আশিজন!'

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে যে অস্ফুট গুঞ্জন উঠেছিল তার মধ্যেকার ধিক্কারের সুরটুকু কান এড়ায় নি বাদ্‌শার। তাই প্রেয়সীর খুশিভরা মুখের কথা চিন্তা ক'রেও এতবড় অন্যায়ে সায় দিতে পারেন নি তিনি। ঈষৎ অপ্রতিভ ভাবে দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে বলেছিলেন, 'না, এটা তোমার একটু বাড়াবাড়িই হয়ে যাচ্ছিল সাদুল্লা খাঁ। মাননীয়া বেগম সাহেবা ওটা—কী বলে এমনিই বলেছিলেন, তুমি এই কাণ্ড করেছ শুনলে তিনি খুশী হতেন না নিশ্চয়।...যাক্ গে যাক্, আপনিও কাজটা ভাল করেন নি উজীর সাহেব।

সাদুল্লা খাঁ মানী ব্যক্তি—এমন ভাবে প্রকাশ্যে অপদস্থ করাটা ঠিক হয় নি।··· যাক্ এখন আপনারা ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলুন।···সাদুল্লা, উজীর সাহেব তাঁর কাজের জন্য খুবই অনুতপ্ত। তিনি ক্ষমা প্রার্থনাই করছেন। তুমিও কিছু মনে রেখো না।'

অগত্যা জুলফিকর খাঁকেও ক্ষমা প্রার্থনা করতে হয়েছিল। লোক-দেখানো ক্ষমাও করতে হয়েছিল সাদুল্লা খাঁকে। দুজনে আলিঙ্গনও করেছিলেন দুজনকে. শেষ পর্যন্ত!

কিন্তু সে অপমান কি সত্যই ক্ষমা করেছিল সাদুল্লা খাঁ!

নিশ্চয় করে নি। আর সেইদিনের সেই ঘটনার ফল স্বরূপই জুলফিকর খাঁকে আজ প্রাণ হারাতে হ'ল। ইতিহাস না জানুক—লালকুঁয়র জানেন—একথা!

জুলফিকর খাঁ!

অকস্মাৎ যেন শিউরে উঠলেন লালকুঁয়র, কথাটা মনে পড়ে গিয়ে। একটা অস্ফুট আর্তস্বরও বেরিয়ে এল তাঁর গলা চিরে।

'কী হ'ল?' গাড়োয়ান ভয় পেয়ে গিয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে প্রশ্ন করে।

রক্ষীরাও কাছে এগিয়ে আসে।

'কী হয়েছে, বাই-সাহেবা?'

ভাগ্যিস বোরখায় ঢাকা ছিল মুখ, নইলে সে মুখের পাংশু বিবর্ণতা দেখলে ওরা হয়তো আরও ভয় পেত।

কোনমতে কষ্টে উচ্চারণ করলেন কথা ক'টা, 'আমরা, আমরা কোন্ দরওয়াজা দিয়ে বেরুব এখান থেকে? দিল্লী-দরওয়াজা নয় তো?'

'না, না।' তাড়াতাড়ি আশ্বস্ত করে গাড়োয়ান. 'আমরা তো লাহোরী দরওয়াজা দিয়ে বেরিয়ে এসেছি! কিলা থেকে বেরিয়ে এসেছি অনেকক্ষণ।'

তাও তো বটে।

বহুক্ষণই তো প্রাসাদ-দুর্গ ছেড়ে চলে এসেছেন তাঁরা—তাঁরই তো ভুল!

আশ্বাস পেলেন বটে, কিন্তু সান্ত্বনা পেলেন না।

চোখ ফেটে হু-হু ক'রে জল বেরিয়ে এল এবার।

শাহান্‌শাহ বাদ্‌শা, রাজাধিরাজ স্বামী তাঁর। সুন্দর সুপুরুষ, দুনিয়ার মালিক।

ওঁকে মেরেও তাদের আশা মেটে নি। তাঁর বাহুবন্ধনের মধ্যে থেকে

ছিনিয়ে নিয়ে তাঁরই চোখের সামনে গলা টিপে হত্যা করেছে। তবুও বুঝি প্রাণ বেরোয় নি—তৈমুরের রক্ত, জেঙ্গিজ খাঁর রক্ত মিশেছে ওঁদের ধমনীতে, অফুরন্ত প্রাণশক্তি নিয়ে জন্মান ওঁরা, সহজে ওঁদের প্রাণ বেরোয় না। তাই, তাই—অয়্ খোদা—শেষ পর্যন্ত জুতোসুদ্ধ, লোহার-নাল-বাঁধানো নাগরা-জুতো-পরা পায়ে, পেটেরও নিচে—লাথি মেরে মেরে মেরেছে ওঁকে—বান্দার বান্দা পথের কুকুর কতকগুলো!

তবুও মরতে পারে নি হতভাগী। সে দৃশ্য দেখেও পাথরে মাথা কুটে মরবার মতো সৎসাহস জাগে নি ওঁর। এত প্রাণের মায়া!…

আর ওদেরও আশা মেটে নি।

রাজ্যেশ্বরের মুণ্ডহীন কবন্ধ হাতীর লেজে বেঁধে মিছিলের আগে আগে নিয়ে ঘুরেছেন নতুন বাদ্‌শা ফরুরুখশিয়ার।

ওরে মূঢ়, ওরে নির্বোধ, তোরই কৃতকর্মের মধ্যে থেকে শিক্ষা নিতে পারলি না? বাদ্‌শাহীর এই পরিণাম, রাজশক্তির এই অসহায় অবস্থা চোখে দেখেও সেই বাদ্‌শাহীর আনন্দে এবং গর্বে বুক ফুলিয়ে মিছিল ক'রে বেড়াতে ইচ্ছা হ'ল!

আসবে, ওরও পুরস্কার আসবে খোদার কাছ থেকে!

তা লালকুঁয়র জানেন। আরও সাংঘাতিক, আরও শোচনীয়। আরও অপমানকর কোনও পরিণতি ওর জন্য অপেক্ষা করছে।

নতুন বাদ্‌শার পরিণাম—সে তো স্পষ্ট রক্তের অক্ষরে লেখা রয়েছে ঐ বালির ওপর—ঐ দিল্লী-দরওয়াজার সামনে, যেখানে জাহান্দার শা আর জুলফিকর খাঁর দলিত পিষ্ট খণ্ড-বিখণ্ড শবদেহ পড়ে আছে অবহেলায়—শৃগাল-কুকুরের ভক্ষ্য হয়ে—

সবাই পড়েছে হয়তো সে লিপি অন্ধ ঐ নতুন বাদ্‌শা ছাড়া।

হায় মূঢ়, সম্মান পাবার লোভ আছে, কিন্তু সে সম্মানের মূল্য জানো না? নিজের জ্যেষ্ঠতাত এবং বাদ্‌শা—তাঁর মৃতদেহটা সমাধি দেবার সহজ সৌজন্যটুকুও মনে পড়ল না?

ক্ষোভ নয়, উষ্মা নয়—ফরুরুখ্‌শিয়ারের জন্য অনুকম্পাই বোধ করছেন লালকুঁয়র।

গাড়ি কখন চলছে এবং কখন থামছে—লালকুঁয়র তার খবরও রাখেন নি। খাওয়া? না, তাঁর খাওয়ার দরকার হয় নি। শুধু জল একটু একটু

চেয়ে খেয়েছেন মধ্যে মধ্যে।

কোথায় যাচ্ছেন তা তিনি জানেন।

সোহাগপুরা!

পুড়ে-নিঃশেষ-হয়ে-যাওয়া তুবড়ির খোলাগুলোকে যেমন ঝাঁট দিয়ে একটা ঝুড়িতে তুলে রাখা হয়, কোন এক অবসর সময়ে বাইরের মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার অপেক্ষায়—তেমনি ঐ 'বেওয়াখানা'তেও বাদ্‌শার হারেমের শ্রেষ্ঠ সুন্দরীরা গিয়ে বাসা বাঁধেন একে একে, চরম ডাক পড়ার দিনটির অপেক্ষায়। তাঁরাও মাটিতে যাবার জন্যেই বসে থাকেন ওখানে—জীবনের বাকী ক'টা দিন, যতদিন না আল্লার করুণা মৃত্যুরূপ মুক্তির মধ্য দিয়ে নেমে আসে। সামান্য কিছু কিছু খাদ্য আর মাসিক হাত খরচা—এই বরাদ্দ, আর মাথা গোঁজার মতো একখানা ঘর।

সেটুকুও যে জোটে তাই ভালো।

নইলে হয়তো আজ হাত পেতে ভিক্ষাই করতে হ'ত।

বাদ্‌শার ঘরণীরা অনেকেই আছেন সেখানে। বিবাহিতা স্ত্রী বেশির ভাগই। সেখানে লালকুঁয়রের থাকার ব্যবস্থা—একটা বিশেষ অনুগ্রহই বলতে হবে।

মনে আছে প্রথম যখন এই জায়গাটির নাম শুনেছিলেন—তখন শুধু একটু কৌতুকই অনুভব করেছিলেন। কথাটা কী প্রসঙ্গে উঠেছিল তাও মনে আছে। আজিম-উশ-শানের পতনের পর—তাঁর হারেমের কী হ'ল, তারা কোথায় গেল—অলস কৌতূহলে প্রশ্ন করেছিলেন লালকুঁয়র। তার জবাবে সদা-বিনীত ওয়াজারাত খাঁ জানিয়েছিলেন, 'তাঁদের প্রায় সকলকেই সোহাগপুরায় পাঠানো হয়েছে। শুধু তাঁদের কেন—জাহান শা, রফি-উশ-শান—এঁদের হারেমও বেশির ভাগই ঐখানে পাচার করা হয়েছে।'

'সোহাগপুরা! সেটা আবার কি?' বঙ্কিম-ভ্রূ ঈষৎ বাঁকিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন লালকুঁয়র।

'আজ্ঞে—বেওয়া-মহল। মানে লালকিলায় তো অত জায়গা হয় না। কতকগুলো অনাথা বেওয়া মেয়েছেলে রেখেই বা লাভ কি? ঝগড়া করবে আর ষড়যন্ত্র করবে বৈ তো নয়। সে কিচিকিচি কি ভাল? তাই শাজাহান বাদ্‌শার আমল থেকেই এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। সামান্য কিছু খোরাকী দেওয়া হয়, তাইতেই তাদের বাকী দিন কটা চলে যায়।'

খুব খানিকটা হেসেছিলেন লালকুঁয়র। আশ্চর্য! তখন কিন্তু একবারও

একথাটা মনে আসে নি—কল্পনার সুদূরতম সম্ভাবনাতেও—যে একদা হয়তো তাঁর ভাগ্যেও ঐ পরিণাম অপেক্ষা করছে!

. . .

সোহাগপুরা! বেশ নামটি। কী চরম অপমানই না মিশে আছে ঐ নামটিতে, কী মর্মান্তিক বিদ্রূপ। কোন্ হৃদয়হীন পিশাচ এ নাম দিয়েছিল কে জানে!

অথবা—যা সত্যকার সোহাগ, যার ক্ষয় বা রূপান্তর নেই—সেই আল্লার সোহাগের জন্য তপস্যা করার সুযোগ মেলে এখানে, এই ইঙ্গিতই লুকিয়ে আছে ঐ নামটিতে। কে জানে!···

লালকুঁয়র তা জানেন না, এত মাথা ঘামাতেও রাজী নন। জীবন ফুরিয়ে গেছে তাঁর, আছে শুধু প্রাণ। সেইটুকুও নিঃশেষে ফুরিয়ে যাবার জন্যে অপেক্ষা করতে হবে, যেখানে হোক এক জায়গায় বসে। সেখানকার নাম কি তা ভেবে লাভ নেই। সামনে পিছনে, ডাইনে বামে যতদূর দৃষ্টি যায় ধু ধু করছে সবটা—মরুভূমির বালির মতোই ধূসর পাণ্ডুর তাঁর ভাগ্য। ঐ যে বালির ওপর পড়ে আছে শাহান্‌শার প্রাণহীন মৃতদেহটা—ঐ বালির মতোই।

অবসন্ন, ক্লান্ত চোখে চেয়ে আছেন লালকুঁয়র বাইরের প্রকৃতির দিকে। শীতজর্জর রাত্রি নেমেছে দু'দিকের দিগন্তজোড়া মাঠে। অন্ধকারে একাকার হয়ে গেছে মাঠ ঘাট সব। বহুক্ষণ বিশ্রামের পর আবার গাড়ি ছেড়েছে—আরও খানিকটা চলে কোন এক সরাইতে গিয়ে থামবে তারা বাকী রাতটুকুর মতো। রক্ষীদের তাড়া আছে দিল্লী ফিরে যাবার। সেখানে নতুন বাদ্‌শা—নতুন সরকার। মুঠো মুঠো টাকা উড়ছে সেখানের বাতাসে। এই 'মুর্দা' আগলে মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়ানোতে রুচি নেই তাদের।

লালকুঁয়র কিছুই বলেন নি।

চলা আর থামা দুই-ই তাঁর কাছে আজ সমান। অবসাদ ক্লান্তি সব যেন অর্থহীন হয়ে পড়েছে। ঘুম নেই চোখে। ঘুম আসবে না আরও বহুকাল। ঘুমোতে সাহসও হয় না, যদি ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখেন—আর স্বপ্নে সেইসব সাংঘাতিক দৃশ্য দেখতে হয়! তার চেয়ে বাকী সারা জীবনটা জেগে কাটানোও ভালো যে।

হঠাৎ একসময় চোখে পড়ল—দূরে একটা আলো জ্বলছে।

এটা কি সেই গ্রাম? গাজীমণ্ডী? সেই আলো?

আজও কি সেই দম্পতি তেমনি ব'সে দশ-পঁচিশ খেলছে?

সেই চরম দুর্দিনের আগের দিনটি—দিল্লী পৌছবার আগের দিন রাত্রে এমনি এক বয়েলগাড়ি ক'রে যাচ্ছিলেন ওঁরা, হয়তো এই পথ দিয়েই, কে জানে! এমনি দূরের একটা আলো দেখে এগিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর বিশ্বস্ত সেবক মহম্মদ মিয়া ছিল সঙ্গে—সে রাজী হয় নি থামতে, কিন্তু বাদশার পিপাসা পেয়েছিল এই অজুহাতে তাকে সম্মত করেছিলেন শাহান্‌শাহ। আসলে—কথাটা মনে পড়তেই দুই চোখ জ্বালা ক'রে তপ্ত অশ্রু গড়িয়ে পড়ল আজও—আসলে একভাবে বসে বসে লালকুঁয়রের—তাঁর প্রিয়তমার পিঠ ব্যথা করছিল ব'লেই পিপাসার কথাটা তুলেছিলেন বাদশা, নইলে ক্ষুৎ-পিপাসা দমন করতে তৈমুর-বংশীয়েরা ভালরকমই জানেন। লালকুঁয়রের অসুবিধার কথা তুললে মহম্মদ মিয়া গাড়ি থামাতে দিত না—কিন্তু ওঁর সামান্য অসুবিধাও যে শাহান্‌শাহের কাছে অসহ্য!—তাই ঐ অভিনয়টুকু করতে হয়েছিল।

হায় রে নাচওয়ালী! এই ভালবাসা পাবার এতটুকু যোগ্যতাও যদি তোর থাকত!

অকস্মাৎ সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে লালকুঁয়র সাগ্রহে প্রশ্ন করলেন গাড়োয়ানকে, 'তুমি এ অঞ্চলটা চেনো? ঐ-যে দূরে আলো দেখা যাচ্ছে—ওখানে কি কোন গ্রাম আছে?'

'জী, মালেকান! আমার বাড়িই এদিকে। যতদূর মনে হচ্ছে ওটা গাজীমণ্ডী।'

'গাজীমণ্ডী'!

সেদিন অপমানাহত হয়ে চলে যাবার সময়ও—বোধ করি সে অপমান এত বিচিত্র জ্বালা ও অনুভূতির সৃষ্টি করেছিল বলেই—ওদের কথা ভোলেন নি, মহম্মদ মিয়াকে বলে গ্রামের নামটা সংগ্রহ করেছিলেন।

হ্যাঁ ঠিকই মনে আছে—গাজীমণ্ডী।

লালকুঁয়র যেন অস্থির হয়ে পড়লেন। নিশ্চয়ই সেই আলো ···সেই ছেলেটি আর তার সেই বৌ। ছেলেমেয়ে দুটি সারারাত জেগে আজও হয়তো দশ-পঁচিশ খেলছে। কে কোথায় বাদশা হ'ল আর কে কোথায় মারা গেল—কার বাদশাহী কবে ফুরোল এবং কার বাদশাহীর শুরু হ'ল, কিছুরই ধার ধারে না ওরা। কারুর তোয়াক্কা রাখে না। নিজেদের নিয়েই নিজেরা মশগুল। ঘরে পুরো বছরের খোরাকও থাকে না, সম্বলের মধ্যে একটি গোরু। তবু কী আনন্দে থাকে! ঐ আনন্দের একটুও যদি পেতেন তিনি!

মিনতির সুর ফুটে ওঠে লালকুঁয়রের কণ্ঠে, 'গাড়িওয়ালা, ঐ গাঁয়ে একবার একটু নামবে? ঐ যে আলোটা যেখানে জ্বলছে?···ওরা আমার জান-পছানা লোক। ওখানে একটু জল খেয়ে নিতাম।'

গাড়োয়ান ইতস্তত ক'রে বললে, 'আমি তো থামতেই পারি মালেকা, বয়েল দুটোকে একটু জল খাওয়াতে পারলে ভালোই হ'ত। কিন্তু সিপাহীজীরা নারাজ হবেন না তো?'

লালকুঁয়র আরও মিনতি করেন। খুব চুপি চুপি বলেন, 'তুমি একটু বুঝিয়ে বলো না। বলো যে, নইলে বলদ আর চলতে পারছে না। আমি তোমাকে বকশিশ দেব আলাদা।'

তবু গাড়োয়ানের দ্বিধা কাটে না, 'দেখবেন মালেকা, আমি কোন ফ্যাঁসাদে পড়ব না তো?'

'না না। আমি তোমাকে জবান দিচ্ছি, খোদা কশম।'

হায় রে! ফ্যাসাদ বাধাবার মতো এতটুকু ক্ষমতাও যদি কোথাও অবশিষ্ট থাকত!

গাড়োয়ান অগত্যা রক্ষীদের ডেকে থামার প্রস্তাব করল। সামান্য একটু তকরারও লাগল বৈকি—কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওরা যেন অল্পেই রাজী হয়ে গেল; হয়তো ওদেরও একটু বিশ্রাম দরকার হয়ে পড়েছিল। তার ফলে একসময় 'বহল'-খানা প্রশস্ত রাজপথ ছেড়ে মাঠ ধরল।

আগ্রহে অধীর হয়ে উঠলেন লালকুঁয়র।

কেমন আছে ওরা কে জানে! হয়তো তেমনিই আছে।

তিনিই না ওদের কোনও বিপদে ফেলেন শেষ পর্যন্ত! সশস্ত্র রক্ষী দুজন সঙ্গে আছে। মেয়েটিও অপূর্ব সুন্দরী।

দুর্ভাগ্যের মজাই হচ্ছে এই। অভাগা শুধু নিজেই জ্বলে না, আরও বহু লোককে জ্বালায়। যেখানেই যায়—নিজের গায়ের আগুন চারিদিকে লাগিয়ে বেড়ায় সে।

কিন্তু ভগবান বুঝি শেষ পর্যন্ত মুখ তুলে চাইলেন।

রক্ষীদের একজন একটু কেশে গলা সাফ ক'রে এগিয়ে এল গাড়ির কাছে।

'বেগমসাহেবা!' কণ্ঠে যেন প্রার্থনারই সুর ওর। এখনও তাঁর কাছে কারুর কিছু প্রার্থনার আছে নাকি?

'বলো, ইরাদৎ খাঁ।'

'ইয়াসিন বলছিল, এখানে নাকি খুব ভালো শরাব পাওয়া যায়। বড্ড জাড়াও

পড়েছে। যদি কিছু মেহেরবানি হ'ত আপনার—'

তাঁর মেহেরবানি ? তার সঙ্গে—

ও হো, ওরা টাকা চাইছে কিছু।

কামিজের জেবে হাত ঢুকিয়ে একটা সোনারই টাকা বার করলেন লাল-কুঁয়র।

'কিন্তু তোমাদের আবার কোথায় পাবো ? মদ খেয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকবে কোথায়—'

'তাই কখনও পারি ? দু'দণ্ডের মধ্যেই আমরা এসে এই বড় বটগছাটার তলায় হাজির হবো। তারপর আপনার মর্জি, যখন খুশি আসবেন আপনি।'

অস্ফুট কণ্ঠে অদৃষ্টকে ধন্যবাদ দেন লালকুঁয়র। বহুদিন পরে ধন্যবাদ দেওয়ার মতো একটা কারণ পাওয়া গেল।…

আলোটা ক্রমেই কাছে এগিয়ে আসে।

সত্যিই কি ঐ আলোটা ওদেরই ?

কী যেন নাম ওদের ?

মনে পড়েছে। সেবার গাড়িতে ওঠবার পর গাড়োয়ান জানিয়েছিল। তাঁর খেয়াল হয় নি কিন্তু সে জেনে নিয়েছিল ওদের নাম। হাসতে হাসতেই বলেছিল সে। ঝব্বু বুঝি ছেলেটার নাম। আর ওর বৌ-এর—? হাঁা, হাঁা—গুল্লু।

গুল্লু। তা গোলাপের মতোই সুন্দর গুল্লু। কে ওর এমন নাম রেখেছিল কে জানে, হয়তো কোন কবিই হবে।

ওর রূপ দেখে সে-রাত্রে লালকুঁয়র—বাদশার পেয়ারের বেগম ইমতিয়াজ-মহল—যেন অনুগ্রহ ক'রেই ওকে বাদশার হারেমে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, সেদিন গুল্লুও তার জবাব দিয়েছিল মুখের মতো। বলেছিল, এক রাজার মেয়ে কিংবা নাচওয়ালী ছাড়া হারেমে কারও যাওয়া উচিত নয়।…তবু চৈতন্য হয় নি ইমতিয়াজ-মহলের। নিজের গলার বহুমূল্য মুক্তার মালা দিতে চেয়েছিলেন ওদের ; সে মালাও সমান তাচ্ছিল্যের সঙ্গেই প্রত্যাখ্যান করেছিল গুল্লু।

আজ বুঝেছেন যে ওরাই বুদ্ধিমান।

ওরা ঢের বেশী সুখী। সত্যকার ঐশ্বর্য—সুখ বা শান্তি—বাদশার প্রাসাদে নেই। আছে ওদেরই কাছে।…

আজও 'বহল'-এর আওয়াজ পেয়ে ছুটে বেরিয়ে এল ঝব্বু আর গুল্লু। মুখে

ওদের আজও তেমনি উদ্বেগ আর আশঙ্কা।

লালকুঁয়র ব্যাপারটা আন্দাজ ক'রেই, তাড়াতাড়ি বোরখাটা খুলে ফেললেন। ম্লান চেরাগের আলো—তবু গুল্লুব চিনতে অসুবিধা হ'ল না। আশ্বাসের ও অভ্যর্থনার হাসিই ফুটে উঠল তার মুখে।

'আসুন, আসুন! ইস্, এ কী চেহারা আপনার ক দিনেই? কোন বেমারীতে পড়েছিলেন কী? আপনার খসম কোথায়?'—

লালকুঁয়র ম্লান হাসলেন একটু। কথাটা ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্যই পাল্টা প্রশ্ন করলেন, 'তোমার শাস্ কোথায়? ঘুমুচ্ছে আজও?···তোমরা কি করছিলে—দশ পঁচিশ খেলছিলে বুঝি তেমনি?'

লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে গুল্লু। অপ্রতিভ ভাবে হেসে বলে, 'তা আজ তেমন রাতও হয় নি। আমাদের তো খাওয়াই হয় নি এখনও···ভালোই হয়েছে—সেদিন আপনাকে কিছু খেতে দিতে পারি নি, আজ রুটি তৈরি আছে। বেজোরের রুটি আর ঠেঁটির চাট্‌নি। পিঁয়াজও বোধ হয় দু'চারটে আছে ঘরে।'

গাড়োয়ান বয়েল খুলছিল পিছনে দাঁড়িয়ে। হঠাৎ সে ব'লে উঠল, 'কাকে কি বলছ, মুল্‌কী বহুন?–ওঁকে চেন?' তারপর ব্যাকুলল'লকুঁয়র কোনরকম বাধা দেবার আগেই ব'লে শেষ ক'রে দিল, 'উনি হলেন মালেকা-ই-জমান ইমতিয়াজ-মহল বেগম-সাহেবা—! উনি তোমার বেজোরের রুটি আর ঠেঁটির চাট্‌নি খাবেন?'

গুল্লুর মুখ ছাইয়ের মতো সাদা হয়ে গেল নিমেষে। বিস্ময় বিস্ফারিত ওর দুটি চোখে ফুটে উটল এক অবর্ণনীয় বিহ্বলতা। আর ঝব্বু যেন পা টিপে টিপে কয়েক পা পিছিয়ে গেল।

লালকুঁয়র এগিয়ে যাচ্ছিলেন গুল্লুকে জড়িয়ে বুকের মধ্যে টেনে নিতে—কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে আবেগ দমন করলেন তিনি। মালেকা-ই জমান তো উপহাস! ইমতিয়াজ-মহলের আসল পরিচয় পেলে ওরা হয়তো ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেবে।

লালকুঁয়র—পথের নাচওয়ালী।

দুনিয়ার মালিককে—শাহান্‌শাকে যে এই পাঁকে নামিয়ে এনেছে, কোটি কোটি প্রজার জীবন নিয়ে যে খেলেছে ছিনিমিনি—এতবড় সাম্রাজ্যকে ঠেলে দিয়েছে জাহান্নমে—তার মতো ঘৃণার পাত্রী কে আছে! তিনি জানেন, আজ থেকে বহুকাল অবধি, হয়তো বা অনন্তকাল, মানুষ তাঁর নাম স্মরণ ক'রে

অভিসম্পাত বর্ষণ করবে !

মাথা হেঁট ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন ইমতিয়াজ-মহল ।

অনেকক্ষণ সময় লাগল গুল্লুর নিজেকে সামলে নিতে ।

তারপর সে যেন অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে শুষ্ককণ্ঠে উচ্চারণ করল, 'বে-বেগম সাহেবা ? মালেকা-ই-জামান্ ! আমাদের মাফ করবেন, অত না বুঝেই বলেছি—'

ইমতিয়াজ-মহল চোখ তুললেন, দুই চোখে তাঁর এবার ভাদ্রের বন্যা নেমেছে । গাঢ় অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, 'কিন্তু আমার যে বড়ই ভুখ লেগেছে বহন ! আমাকে খেতে দেবে না কিছু ?'

গুল্লুর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল । বললে, 'খাবার তো রয়েছে, মালেকান্, কিন্তু সে যে আমাদের ঘরে-ভাঙা চোখড়সুদ্ধ আটার রুটি, সে তো আপনি খেতে পারবেন না ! অবশ্য ঘিউ আছে ঘরে—'

'খুব পারব, বহন । তুমি এখনই দাও । আজ ক'দিন কালো পোড়া রুটি ছাড়া আর কিছুই যে জোটেনি । কাল থেকে তাও পেটে পড়ে নি ।'

ঝব্বু এগিয়ে এসে একরকম ধাক্কা দিয়েই গুল্লুকে সক্রিয় ক'রে তুলল, 'তুই যা দিকি, খাবার সাজিয়ে দে । গাড়িবান ভাইয়াকেও দিস্ এক সান্কি । কিন্তু—'

এবার তার মুখেও বিপন্ন ভাব ফুটে ওঠে, 'বসতে দেব কোথায় ? ঐ চারপাইটায় কি বসতে পারবেন ?'

সে ছুটে গিয়ে খেজুরপাতার অদ্বিতীয় চাটাইখানা পেতে দেয় তার ওপর । তারপর ছুটে চলে যায় কুয়া থেকে জল তুলতে ।

লালকুঁয়র শ্রান্তভাবে বসে পড়েন চারপাইটাতেই । এতক্ষণ কোন ক্লান্তি, কোন শারীরিক ক্লেশের বোধ ছিল না—কিন্তু এবার যেন পা ভেঙে আসছে ।

একটা পেতলের থালা ক'রে খানকতক মোটা মোটা ঘি-মাখানো রুটি আর তার ওপর পলাশপাতায় খানিকটা চাট্নি, পিঁয়াজ-কুঁচি, নুন আর লঙ্কা এনে গুল্লু তাঁর সামনে নামিয়ে রাখল । ঝব্বু ততক্ষণ বড় একটা লোটা ভরে জল নিয়ে এসেছে ।

আঃ ! ঠাণ্ডা কনকনে জল মুখে মাথায় অনেকক্ষণ ধরে থাব্ড়ে থাব্ড়ে দিলেন লালকুঁয়র । খেলেনও খানিকটা । খালি পেটে ঠাণ্ডা জল পড়ে যন্ত্রণায় পেটটা কুঁচ্কে কুঁচ্কে উঠতে লাগল - কিন্তু উপায় কি, গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে ছিল, সে গলা দিয়ে শুক্নো রুটি নামত না ।

খেতে খেতে খেয়াল হ'ল লালকুঁয়রের।

'কিন্তু তোমাদের তৈরী রুটি তো আমরা খেলাম, তার পর?'

খিলখিল ক'রে হেসে উঠল গুল্লু। তার তখন ভয় অনেকটাই ভেঙে গেছে। সে হেসে বললে, 'বেশ লোক তো আপনি! খেয়েদেয়ে এখন খবর নিচ্ছেন? ভয় নেই—আমাদের অনেক ছাতু ভাঙা আছে ঘরে, ভাল ক'রে মাখব আর দুজনে নুন-লঙ্কা আচার দিয়ে খাবো তোফা।'

ঝব্বু পেছনে দাঁড়িয়ে হাত কচ্‌লাচ্ছিল—সে এবার প্রশ্ন না ক'রে থাকতে পারল না। বলল, 'কিন্তু এভাবে একা কোথায় যাচ্ছেন, হজরৎ বেগম-সাহেবা?'

মুহূর্তকাল পাথরের মতো বসে রইলেন লালকুঁয়র। তারপর বললেন, 'সোহাগপুরা।'

'সোহাগপুরা!' সবিস্ময়ে ব'লে উঠল ঝব্বু, তারপর—সতর্ক হবার কোন প্রয়োজন আছে কিনা বোঝবার আগেই—তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'বেওয়া-মহল?'

মাথা হেঁট ক'রে রুটি চিবোতে লাগলেন লালকুঁয়র।

গুল্লুর এতক্ষণে খেয়াল হ'ল। সে কেমন একটু উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললে, 'আচ্ছা সে-রাত্রে আপনার সঙ্গে যিনি ছিলেন—তিনি, মানে তিনিই কি—?'

'হ্যাঁ গুল্লু বোনটি, তিনিই তোমাদের বাদ্‌শা ছিলেন, তখনও পর্যন্ত। বাদশাকেই জল খাইয়েছিলে সেদিন।'

'ছিলেন মানে—? তিনি আর নেই বাদ্‌শা?'

'কেন, তোমরা শোন নি কিছু?'

'আমরা আর কি শুনব মালেকান্? লড়াই চলছে খুব জোর—এই শুনেছি; দিনরাত ভয়ে ভয়ে থাকি। আর কি শুনব?'

'বাদ্‌শা জাহান্দার শা—মানে, আমার মালিক—আর বাদ্‌শা নেই। ফররুখ্‌শিয়ার এখন নতুন বাদ্‌শা।'

'তাই নাকি?...তাহ'লে তিনি—মানে আপনার মালিক, তিনি—?'

থালাটা নামিয়ে উঠে দাঁড়ান লালকুঁয়র।

'তাঁকে কাল খুন করেছে বেইমানের বাচ্চারা। তিনি আর নেই। তাই তো আমি বেওয়া-মহলে চলেছি, বোন!'

ঠোঁট-দুটো কাঁপতে থাকলেও, যতদূর সম্ভব সহজ কণ্ঠেই কথাগুলো বলেন লালকুঁয়র।

ঝব্বু হায়-হায় ক'রে ওঠে, 'করলি কি মুখপুড়ী, মালেকানের খাওয়াটা পণ্ড ক'রে দিলি ?'

গুল্লু তার আগেই ছুটে এসে ওঁর হাত দুটো চেপে ধরেছে। তারও দুই চোখে জল, 'আমি মাফ চাইছি, মালেকান্. রুটি ফেলে উঠবেন না। দোহাই আপনার !'

ম্লান হেসে বাঁ-হাতে ওকে জড়িয়ে ধরে বললেন লালকুঁয়র, 'আমার খাওয়া হয়ে গেছে, বোন। আর কত খাবো ?'

গাড়িতে বয়েল জুড়ে অসহিষ্ণু গাড়োয়ান তাড়া দিচ্ছে। আর দেরি করা চলবে না কিছুতেই। লালকুঁয়র উঠে দাঁড়ালেন।

'একটা কথা বলব, মালেকান্ ? এত মেহেরবানি করছেন ব'লেই বলছি।'

'বলো, বোন !'

'কী হবে বেওয়া-মহলে গিয়ে ? এইখানেই থাকুন না ! আমরা দুজন আপনার বান্দা আর বাঁদী হয়ে থাকব। আরাম পাবেন না গরীবের ঘরে ঠিক কথা—কিন্তু সেবা পাবেন।'

'কী বলছিস, গুল্লু ? উনি থাকবেন এই ঘরে ?' মৃদু ধমক দেয় ঝব্বু।

'ঝব্বু ভাইয়া, এ-যে কতবড় লোভের কথা আমার কাছে, তা তুমি বুঝবে না। আমিও একদিন পথের মেয়েই ছিলাম,—খুব বেশীদিন শাহী ইমারতে বাস করি নি।·· আর করলেও অরুচি ধরে যেত এমনিতেই। তার চেয়ে এই আমার কাছে স্বর্গ। তাই তো ছুটে এসেছি। কিন্তু—' দূর অন্ধকার শূন্যের দিকে চেয়ে যেন কী একটা কল্পনানেত্রে প্রত্যক্ষ করেন লালকুঁয়র, শিউরে ওঠে তাঁর দেহ। বলেন, 'না না, দরকার নেই, ভাইয়া। আমার সর্বাঙ্গে এখনও সে-নরকের গন্ধ লেগে আছে—আমার নিঃশ্বাসে আছে সর্বনাশ ! কে জানে তোমাদের কাছে থাকলে হয়তো স্বর্গেও আগুন লাগবে। তার চেয়ে আমি যাই এখন—আমি যাই ! আবার আসব বহন, এমনি হঠাৎ এসে হঠাৎ চলে যাবো। আমাকে একেবারে ভুলে যেয়ো না।'

'আমাকে নেবেন মালেকান্ সঙ্গে ? বাঁদী কেউ না থাকলে বড় অসুবিধা হবে না ?' গুল্লু বলে।

'ছি ! তুমি তোমার স্বামীর ঘর সুখে আর সৌভাগ্যে ভরিয়ে তোলো। আমার দুর্ভাগ্যের বাতাস না লাগে তোমার সংসারে—'

লালকুঁয়র গাড়ির কাছে এসে দাঁড়ালেন। কিন্তু তখনই ঠিক উঠতে পারলেন

না। কী যেন একটা বলতে গিয়েও বলতে পারছেন না। অনেকটা ইতস্তত ক'রে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'সেদিন আমার কাছ থেকে মুক্তোর মালা নাও নি, বহেন;—ঠিকই করেছিলে। কিন্তু আজ আমাকে কি কিছু একটা দিতে পারো না? কোন একটা স্মৃতিচিহ্ন তোমাদের?'

'আমাদের? আমাদের কী আছে?'

বিপন্ন মুখে দুজনে দুজনের দিকে তাকায়।

নিরবে আঙুল দিয়ে গুল্লুর হাতের অনামিকাটা দেখিয়ে দেন লালকুঁয়র: ক্ষয়ে-যাওয়া সামান্য একটি চাঁদির আংটি।

লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠে গুল্লু, বলে, 'এ জিনিস কিছুতেই আপনার হাতে তুলে দিতে সাহস হবে না, মালেকান! এ বড়ই সামান্য, যা-তা একেবারে!'

'তবু তোমার হাতের ছোঁয়া আছে তো!'

লালকুঁয়র নিজেই খুলে নিলেন ওর হাত থেকে। তারপর সেই সামান্য বেঁকে-যাওয়া আংটিটা সযত্নে সন্তর্পণে নিজের আঙুলে পরলেন—জাহান্দার শার দেওয়া বড় লাল পাথরের আংটিটার পাশাপাশি

॥ দশ ॥

পাঁচিলে ঘেরা অনেকটা জায়গা—তারই মধ্যে খুপরি খুপরি বাড়ি—একটা বড় দোতলা টানা বাড়িও আছে, অসংখ্য ঘর তার, সেও অমনি খুপরি খুপরি—এই হ'ল মুঘল রাজবংশের বেওয়া-মহল বা সোহাগপুরা। এরই এক একটি ঘরে বাস করতে দেওয়া হয় এক-একজন মহিলাকে, যিনি হয়তো কিছুদিন আগেও অসংখ্য দাসদাসী নিয়ে লালকিলার প্রাসাদদুর্গে বাস করেছেন। বাদ্‌শা বা বাদ্‌শাজাদাদের স্ত্রী আর সেই সব প্রধানা রক্ষিতা—যারা উপপত্যন্তর গ্রহণ করতে চায় নি—তাদের এখানে পাঠানো হয়, বাকী জীবনটা কাটাবার জন্য। নতুন বাদ্‌শার দয়া হ'লে দু' দশ সিক্কা বা তঙ্কা মাসোহারাও মেলে। নইলে শুধু এই আশ্রয়টুকু এবং একজনের মতো সিধা। জ্বালানি কাঠও নিজেদের কিনতে হয়, অথবা যোগাড় করতে হয়। তবে যাঁরা আসেন তাঁদের সঙ্গে গহনাপত্র, ক্ষেত্রবিশেষে কিছু নগদ টাকাও থাকে, তাইতেই কোনমতে বাকী জীবনটা শুধু প্রাণধারণ ক'রে থাকতে পারেন।

দিল্লী থেকে আগ্রা যাবার পথে যমুনা বহু জায়গাতেই খুব বেশীরকম এঁকে-বেঁকে গেছে। তারই একটা বাঁকের মুখে এই বিচিত্র উপনিবেশ। যমুনার

ধার দিয়ে দিয়েই চওড়া বড় শাহীসড়কটা চলে গিয়েছে বটে, কিন্তু অনেক জায়গায় এই আকস্মিক বাঁক এড়িয়ে যতটা সম্ভব সোজা রাখার জন্য পথটা নিয়ে যাওয়া হয়েছে নদী থেকে বেশ একটু দূর দিয়েই। এমনিই একটা জায়গায়— নদী ও সড়কের মাঝামাঝি এই সোহাগপুরা উপনিবেশ। সড়ক থেকে অনেকখানি নেমে এসেছে এই জমিটা। বেশ নিচু, বর্ষাকালে যমুনা যখন রণ-রঙ্গিণী সংহারিণী মূর্তি ধারণ করে তখন হামেশাই এই পাঁচিলে ঘেরা উপনিবেশের মধ্যে জল চলে আসে। তখন প্রায় দ্বীপের মধ্যে বাস করে এই বেওয়ারা। দুর্গতির শেষ থাকে না।

কিন্তু তবু বেঁচে তো থাকে।

দীর্ঘদিনই বেঁচে থাকে কেউ কেউ। নিত্য নানা দুর্গতি সয়ে ওদের জীবনীশক্তি যেন বেড়েই যায়।

আর এই বাঁচতে পেরেই যেন ওরা কৃতার্থ। এর জন্যই, এই কোনমতে বাঁচবার সৌভাগ্যটুকু দেওয়ার জন্যেই শাহী দরবারের কাছে ওরা কৃতজ্ঞ।

স্যাঁৎসেতে ভিজে জমি, বর্ষাকালে সাপ মশা বিছের আবাদে পরিণত হয় বলতে গেলে, চারিদিকে নিবিড় অরণ্য—নয়তো কিছু কিছু জাঠ চাষীদের গ্রাম—তবু আশ্রয়! আশাহীন, আনন্দহীন, ভবিষ্যৎহীন কয়েকটি জীবনের দীর্ঘকালব্যাপী মৃত্যুর সাধনা-কেন্দ্র।

মরণেরই তপস্যা করে ওরা—বেঁচে থেকে।

এখানে প্রথম প্রথম যারা আসে, তাদের কারুরই বিশ্বাস হয় না কথাটা। ভাগ্যের এই একেবারে বিপরীত পরিবর্তন মন মানিয়ে নিতে পারে না কিছুতেই। দিনরাত তাদের কাটে একটা ঘোরের মধ্যে দিয়ে। এ পরিবেশ, এই জীবন এবং জীবনধারণের এই সামান্য উপকরণ সবই অবিশ্বাস্য মনে হয়। মনে হয়, 'না না, এ হতে পারে না, এ ঠিক নয়—এটা দুঃস্বপ্ন। এখনই এ স্বপ্ন ভাঙবে, নিষ্কৃতি পাবো আমরা।'

তারপর একটু একটু ক'রে কাল সেই নির্মম সত্যটিকে উদ্‌ঘাটিত করে। একটু একটু ক'রে সয়ে আসে জীবনটা। তারপর সত্য অবস্থাটা বিশ্বাস করতে এক সময় আর কোন অসুবিধাই থাকে না।

লালকুঁয়রও প্রথমটা বিশ্বাস করতে পারেন নি। সত্যিই কি এই তাঁর পরিণাম হল! সত্যিই এইখানে, এই অবস্থায়, এই পরিবেশে তাঁকে জীবনটা কাটাতে হবে—হয়তো বা দীর্ঘ জীবনই?

না—না। তা হ'তে পারে না। এ কখনও হ'তে পারে না। আর একটা কিছু ঘটবেই ; এমন একটা কিছু—যাতে ওলট্-পালট্ হয়ে যাবে সব !

নইলে, নইলে পাগল হয়ে যাবেন যে তিনি !

তা কখনও হ'তে পারে?

কখনও সম্ভব ?

কাল যে ছিল সকলের মাথার উপরে, আজ সে-ই, দৈহিক সম্পূর্ণ সুস্থ থেকেও—এমন ক'রে অজ্ঞাত, অবজ্ঞাত জীবন্ত সমাধিতে সমাহিত হবে, চিরদিনের মতো ?···

কিন্তু দিন, সপ্তাহ, মাস—বৎসর চলে যায়। কিছুই হয় না, কোন অঘটনই ঘটে না। ক্রমশ আরও বুঝতে পারেন যে অঘটন কিছু ঘটলেও তাঁর কোনও পরিবর্তনই আর হবে না। বাদ্‌শা বদল হ'তে পারে, উজীর বদল হ'তে পারে,—কিন্তু তাতে তাঁর আর কোনও ক্ষতি-বৃদ্ধিই নেই। তাঁর অবস্থার কোন পরিবর্তনই আর হওয়া সম্ভব নয়। হলেও—আরও খারাপ কিছু হওয়াই সম্ভব। আরও অসহ কোন জীবন হয়তো যাপন করতে হবে তখন।

পাগল ?

না, পাগল হবার হ'লে সেই দিনই হয়ে যেতেন। ত্রিপোলিয়া ফাটকের সেই সাংঘাতিক ঘটনার সময়েই।

চরম সর্বনাশে, সেই মর্মান্তিক দুঃসহ আঘাতেও যখন মাথা খারাপ হয়ে যায় নি—তখন এই সামান্য দৈহিক দুঃখেও হবে না !

লালকুঁয়র হাসেন।

ওরে সর্বনাশী, শেষ পর্যন্ত পাগল হয়ে তোর পাপের শাস্তি এড়াতে চাস ?··· এত সহজে অব্যাহতি পাবি ?

বিশ্বাস হয়েছে। সয়েও গেছে। তবু এখনও এক একদিন এমন হাঁফ ধরে কেন ?

এক একদিন যেন মনে হয়, দুর্ভাগ্য বুকে চেপে বসে গলা টিপে ধরেছে। মনে হয় এই কুশ্রী পরিবেশ ঘৃণ্য ক্লেদাক্ত আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরেছে তাঁকে, সে নাগপাশের মতো বাহুপাশে নিঃশ্বাস আটকে যাচ্ছে তাঁর !

এই রকম মুহূর্তগুলিতে আর এই জানালা-দরজাহীন কোটরের মতো ঘরে কিছুতেই আবদ্ধ থাকতে পারেন না তিনি—ছুটে বেরিয়ে চলে যান একেবারে যমুনার ধারে। কয়েকটা ক্ষেত পার হয়ে, বড় দুটো আম-বাগান পেরিয়ে

অনেকটা যেতে হয়—তবু যান। আর কেউ এখানকার পাঁচিল পার হয় না—বেওয়া-মহলের কোন বাসিন্দা। লজ্জা ও পূর্ব গৌরবের এই অভিমানটুকু এখানে এসেও ছাড়তে পারে নি কেউ।...তারা লালকুঁয়রের এই আচরণে হাসাহাসি করে। নাম দিয়েছে ওর 'পাগলী বাঁদী'। বলে, 'হাজার হোক, পথে পথে নাচার অভ্যেস ছিল তো এককালে, পর্দা আর আব্রু শিখবে কোথায় ?'

তা বলুক! লালকুঁয়রের তাতে কিছু আসে যায় না! তিনি মেশেনও না কারুর সঙ্গে। কথাও বলেন না। ওদের বাঁকা মন্তব্য এবং চোখে-চোখে হাসি যে গোচরে আসে না তা নয়—উপেক্ষা ক'রে চলে যান তিনি। কোন-দিনই অপরের মতামত নিয়ে মাথা ঘামান নি, সে মতামতকে বরং দ'লে মাড়িয়ে চলে গেছেন—তবু তখন জীবনে আশা ছিল, আনন্দ ছিল, ভবিষ্যৎ ছিল। আশা ও ভবিষ্যৎ থাকলেই আশঙ্কার কারণ থাকে। আজ যখন কিছুই নেই—সামনে যতদূর দৃষ্টি চলে সব অন্ধকার—সেই চরম অন্ধকারে মিশে যাওয়ার দিনটি পর্যন্ত, তখন আর ওদের মন্তব্যকে গ্রাহ্য করতে যাবেন কী দুঃখে, কোন্ আশঙ্কায় ?

অবশ্য বে-আব্রু হবার মতো, বে-ইজ্জৎ হবার মতো কেউই থাকে না ওখানে—নদীর ধারে। আশে-পাশে গ্রামই বিরল, যে গ্রামও আবার জনবিরল। যারা আছে—তারা কদাচিৎ নদীর ধারে আসে। নির্জন বলেই ছুটে যান সেখানে লালকুঁয়র। নিস্তব্ধ শান্ত মুক্তির মধ্যে গিয়ে নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচেন। নদী আর তিনি—ধূ-ধূ বালুবেলা আর গাঢ়-নীল জল—আর কিছু নেই সেখানে, কেউ নেই। এইখানে বসে আশ মিটিয়ে চোখের জল ফেলেন লালকুঁয়র—চোখের জল ফেলে বাঁচেন। ওখানে চোখের জল ফেলতে লজ্জা করে—এখানে করে না। কারণ এখানে সে অশ্রুর কোন সাক্ষী থাকে না। শুষ্ক তৃষার্ত বালু সে জল নিঃশেষে শুষে নেয়,—নিশ্চিহ্ন ক'রে দেয় লজ্জার সেই ইতিহাসকে।

কেঁদে শান্ত হয়ে—আবার ঐ অন্ধকার কোটরে ফিরে যান একদা-মহিষী মহামান্যা ইমতিয়াজ-মহল। ভাগ্যের কাছে আত্মসমর্পণে যাত্রা করার পাথেয় সঞ্চয় করে নিয়ে যান ঐ নদীর ধার থেকে।

এখানে মধ্যে মধ্যে আসে আর একটি প্রাণী।

এক যাযাবর বেদের মেয়ে।

নাম বলে না সে, নাম জিজ্ঞাসা করলে হাসে। বলে, 'আমার আবার

নাম। আমার নামে কি হবে? কেউ হয়তো কোনকালে নাম রাখেই নি আমার। আমি বেদেনী।'

সুশ্রী তরুণী মেয়ে—তবু যেন লালকুঁয়রের মনে হয়—সেও অকালে বুড়িয়ে গেছে তাঁর মতো। তাঁরই মতো কোন সুগভীর দুঃখ বহন করছে সে।

প্রশ্ন করলে হাসে হা-হা ক'রে। বলে, 'হায় হায়—বেদেনীর আবার দুঃখ! আমাদের কোন দুঃখ থাকতে পারে নাকি? ভিখিরী ভবঘুরে—আমাদের কী আছে যে দুঃখ থাকবে।'

এটুকু বোঝেন লালকুঁয়র যে সে একা। একাই ঘুরে বেড়ায়, যেখানে-সেখানে। সে নাকি হাত দেখে বেড়ায়, হাত দেখাই তার পেশা। সেই জন্যেই নাকি মাঝে মাঝে শহরে যায়, আগ্রা দিল্লী লাহোর—সব জায়গাতেই যায় সে। তবে দিল্লীতেই যায় বেশী, রাজধানী জায়গা, বড় বড় 'রইস' লোকেরা থাকেন, রোজগার হয় বেশী। কিন্তু বেশীদিন থাকে না কোথাও, কিছুদিন চলবার মতো দু-চার-পয়সা কামাতে পারলেই পালিয়ে আসে এদিকে। গাঁয়ে-পাহাড়ে, নদীর ধারে ঘুরে বেড়ায় একা।

কেন?

প্রশ্ন করলে আবারও সেই হাসি হাসে, 'কেন কি? ভাল লাগে তাই।'

'ভয় করে না?'

'ভয়? বেদের মেয়ের আবার ভয় কি?'

বুকের কাছ থেকে একটা ছোরা বার ক'রে দেখায়, 'এই দোস্ত্ থাকতে বেদেনী আমরা কাউকে ভয় করি না!'

পাৎলা লিক্‌লিকে তার পাত্‌টা বিদ্যুতের মতো ঝিলিক্ দিয়ে ওঠে বাইরের আলোয়।

'এখানে আসো কেন?'

'এই বেওয়া-মহল দেখতে। খুব মজা লাগে আমার!'

'কতকগুলো বিধবা বেওয়ার দুঃখ দেখতে কী এমন মজা?'

'তা নয়, এদের দেখি আর অতীত দিনের কথা মনে পড়ে। কত শক্তি ছিল এদের, কত দম্ভ। তখন কেউ এই দিনটার কথা ভাবে নি। কেউই ভাবে না বোধ হয়।'

তারপর হঠাৎ হয়তো বলে বসে, 'খুব বেঁচে গিয়েছি, জানো? আমিও চাই কি এই সোহাগপুরার বাসিন্দা হ'তে পারতুম।...বিশ্বাস হয়?'

হয় বৈকি! খুবই হয়। ওর দিকে ভাল ক'রে তাকিয়ে দেখলে সংশয়ের

কোন কারণই থাকে না। বোধ হয় আর্মানী রক্ত গায়ে আছে মেয়েটার—কিম্বা ইরাণী। খুবই সুশ্রী। কোমল একহারা ভঙ্গুর দেহ। ময়লা ঘাঘরা ও ছেঁড়া কাঁচুলিতে সে রূপ ঢাকা পড়ে না।

'কোন বাদ্‌শার নজরে পড়েছিলে বুঝি? না কোন শাহ্‌জাদার?'

কিন্তু সে কথার কোন উত্তর দেয় না। পীড়াপীড়ি করলে হঠাৎ উঠে পালিয়ে যায় হাসতে হাসতে।

এই বেদেনীর কাছেই মাঝে মাঝে রাজধানীর খবর পান লালকুঁয়র। এই মেয়েটি যেন ওঁর অন্ধ কারাজীবনে, এই জীবন্ত মৃত্যুর মধ্যে এসে প'ড়ে মাঝে মাঝে জীবনের দিকের বাতায়নটা খুলে দিয়ে যায়।

শুধু রাজধানীরই খবর নয়—রাজপ্রাসাদেরও।

শুনতে যে তিনি ঠিক চান তা নয়—বেদেনী নিজেই বলে। কিন্তু একেবারে সে দিকে উদাসীন থাকতেও পারেন না। মনের আগ্রহ ও কৌতূহল চাপতে পারেন না কিছুতেই। এই জীবনই তো ওঁর জীবন। সে জীবন তিনি বেশী দিন ভোগ করেন নি এটা ঠিক—কিন্তু বাইরে থেকেও ঐ জীবনেরই তো সাধনা করেছেন তিনি। বলতে গেলে সারাজীবনই—আশৈশব। এখনও তাই সিংহাসন আর তার চারপাশে যারা আছে, তাদের কথা শুনলে প্রায়-নিভে-যাওয়া মনের আগুন আবার নতুন করে জ্বলে ওঠে। রক্তে জাগে নতুন চেতনা, নতুন উন্মাদনা।

বেদেনী বলে, 'পচে গেছে, বুঝলে? মুঘলদের ঐ শাহী বংশের মূলেই পচ ধরেছে। ডাল পালা পাতা—সব শুকিয়ে ঝরে যাবে, কেউ থাকবে না। ওর ফুল আর ফুটবে না, ফলও ধরবে না। শুধু পচে গলে পড়ে যাবে অতবড় গাছটা। বহু পাপ, ওর প্রতিটি পল্লবের শিরায় পাপের বিষ জড়ো হয়েছে যে!···কিছুই থাকবে না।···আর হলও তো অনেকদিন। যাবার সময় এমনিই হয়।

আবার বলে, 'ঐ পচনের ছোঁয়াচ লাগছে যাদের, ঐ পাপের সংস্পর্শে যারা আসছে তারাও মরবে। মরাই ভাল, স্তূপাকার হয়ে উঠেছে যে পাপ! পাহাড়ের মতো জমে উঠেছে—'

কথাটা ঠিক। তা লালকুঁয়রও বোঝেন।

পাপের সংস্পর্শে যারা আসবে তারাই মরবে। এ-পচনের সাংঘাতিক বিষ।

পাপ তাঁরও জমা হয়েছিল, স্তূপাকার হয়ে উঠেছিল। সে পাপের পাহাড়ে

যে পা দিয়েছে সে-ই মরেছে। বিষের সরোবর কাটিয়েছিলেন তিনি, তাতে ছিল সোনার সিঁড়ি, ফুটেছিল মরীচিকার পদ্মফুল। সেই লোভে যারা ঝাঁপ দিয়েছে তারাই মরেছে। বাদ্‌শা থেকে শুরু ক'রে তাঁর খান-সামান পর্যন্ত।

নতুন বাদ্‌শা—জাহান্দার আর তাঁর উজীর জুলফিকারের রক্তে স্নান ক'রে সিংহাসনে বসেছেন, সে রক্তস্নান আজও বন্ধ হয় নি। বহুলোকই প্রাণ দিয়েছে, তার মধ্যে ফকীর ও নারীও বাদ যায় নি। সেই সঙ্গে—

সাদুল্লা খাঁও—!

হ্যাঁ, সাদুল্লা খাঁ। অথচ জাহান্দারের মৃত্যুর পর সেবা ও তোশামোদে লোকটা নতুন বাদ্‌শাকে প্রায় বশ ক'রেই ফেলেছিল। একমাস। সবে বোধ হয় একটু নিশ্চিন্ত হয়েছিল সে। তারপর হঠাৎ একদিন তাকে কারাগারে পাঠানো হ'ল, তার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়ে গেল—বেচারীর স্ত্রী-পুত্ররা পথের ভিখারী হয়ে গেল। কিন্তু তাতেও আক্রোশ মিটল না বাদ্‌শার—কারাগারের মধ্যেই তাকে মেরে দেহটা বাইরের মাঠে ফেলে দেওয়া হ'ল—প্রাক্তন বাদ্‌শা ও তাঁর উজীরের মতো। সেদিক দিয়ে অবশ্য সম্মান মন্দ পায় নি লোকটা।

অপরাধ ?

জালিয়াতি করেছিল। বাদশা-বেগমের চিঠি নাকি জাল করেছিল। ভেবেছিল কেউ কোনদিন জানতে পারবে না। খুবই মাথা খাটিয়েছিল। একটি মাত্র অক্ষর মুছে দিয়ে জুলফিকর খাঁর মুক্তির সুপারিশ-পত্রকে মৃত্যুর পরোয়ানা ক'রে বাদ্‌শার হাতে দিয়েছিল। ভেবেছিল বাদ্‌শার কাছের কৈফিয়ত নিতে স্বয়ং বাদশা-বেগমও সাহস করবেন না। কিন্তু সম্রাট আলমগীরের দুহিতা পৌত্রকে ভয় করবেন না, এটা ভাবা উচিত ছিল তার।...আর তাই-ই-তো হ'ল—

রাজ্যি শুরু করার মাত্র মাসখানেক বাদেই পিতামহীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন বাদ্‌শা।

প্রাথমিক অভিবাদন সম্ভাষণ ইত্যাদি সারা হবার পরই জিন্নতউন্নিশা সোজাসুজি প্রশ্ন করেছিলেন বাদ্‌শাকে, 'তুমি জুলফিকরকে মারলে কেন?...সে থাকলে আজ আর এমন ক'রে সৈয়দদের হাতের পুতুল সাজতে হ'ত না তোমাকে। তারা সাহস করত না বাদ্‌শার ওপর এই ভাবে বাদ্‌শাহী চালাতে। সিংহাসনে বসতে এসেছ—রাজনীতির অ-আ-ক-খ জানো না?...কাঁটায় কাঁটা তুলতে হয় তাও বোঝো নি? অত বড় একটা শক্তিমান লোক, তোমার

তঁাবে থাকলে কত সুবিধা হ'ত বল দেখি! ওরা দু'দলই দু'দলকে ভয় করত, সেই সুযোগে বাদ্শা নিজের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করতে পারতেন!'

এক নিঃশ্বাসে বলে গিয়েছিলেন কথাগুলো। প্রথমটা জবাব দেবার সুযোগই পান নি বাদ্শা, তারপরই সবিস্ময়ে বলে উঠেছিলেন, 'কী মুশকিল · যা করেছি আপনার মত নিয়েই তো করেছি!'

'কখনও না। আমি কী বলেছিলুম!'

বাদ্শা-বেগমের চিঠিখানা নাকি সঙ্গে নিয়েই গিয়েছিলেন বাদ্শা—জেব্ থেকে বার ক'রে দিয়েছিলেন ওঁর হাতে। আর তখনই ধরা পড়েছিল সাদুল্লা খাঁর কারসাজী! বাদ্শা-বেগম আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে বাদ্শার নজরে পড়েছিল—'ন' শব্দটি ছুরি দিয়ে চেঁচে তোলা!

মেঘের মতো মুখ ক'রে ফিরে এসেছিলেন বাদ্শা। এসেই হুকুম দিয়েছিলেন সাদুল্লা খাঁর গ্রেপ্তারীর। এক দণ্ডও দেরি সয় নি তাঁর!

এ ইতিহাস অবশ্য লালকুঁয়র জানতেন। এই জালিয়াতির ইতিহাস। হিদায়ৎ কেশ খবর দিয়েছিল।

হিদায়তেরও পরিণাম শুনলেন এই বেদেনীর মুখে।

হিদায়ৎ জানত সাদুল্লার এই ইতিহাস, চোখেই দেখেছিল। কিন্তু ভবিষ্যতে কাজে লাগাবে বলে চেপে রেখেছিল কথাটা। সে ভেবেছিল জুলফিকর বাঁচলে তার কোন আশা নেই কিন্তু সাদুল্লা যদি কখনও উজীর হয় তো সে উজীরের উজীর হ'তে পারবে—এই একটি মন্ত্রে। এই মন্ত্রে চিরদিনের মতো বশীভূত থাকবে সাদুল্লা।

অদূরদর্শী, মূর্খ

বড়ই লোভ ছিল লোকটার, বড় বেশী লোভ!

অপেক্ষা করতে পারে নি। দু-চার দিন দেখেই, সাদুল্লা খাঁ বাদশার সুনজরে পড়েছে দেখা মাত্রই, ও সেই মন্ত্র প্রয়োগ করতে গিয়েছিল। ধূর্ত সাদুল্লা তখনকার মতো মিষ্টবাক্যে ওকে তুষ্ট ক'রে বাদ্শাকে মনে করিয়ে দিয়েছিল মির্জা মহম্মদ করিমের মৃত্যুর কথাটা।

তারপর আর কয়েক দণ্ড মাত্র বেঁচে ছিল হিদায়ৎ!

এক পাপ আর এক পাপকে আশ্রয় করে। এক মিথ্যা আর এক মিথ্যাকে ডেকে আনে।

পরিণাম একই। বিধাতা সামনে বসে আছেন নিক্তি নিয়ে। নিক্তির তৌলে চলে তাঁর বিচার। যার যেটুকু প্রাপ্য সুদসুদ্ধ উশুল দেন তাকে।

একটি মাত্র প্রাণীর বিষাক্ত রোগের ছোঁয়াচ যেমন বহুদূর ছড়ায়—বহুলোকের মৃত্যুর কারণ হয়, একটি মানুষের পাপও তেমনি।…

লালকুঁয়র নিজের ললাটে করাঘাত করেন বার বার। মাঝে মাঝে যমুনা-তটের বালিতে মাথা কোটেন!

॥ এগারো ॥

আরও বহু খবর দেয় বেদেনী।

প্রাসাদ-দুর্গের নানা বিচিত্র সংবাদ।

হাত দেখার দৌলতে অবাধ গতিবিধি তার। এক এক সময়ে শুধু চুপ ক'রে বসেও থাকে। তার ফলে তুচ্ছাতিতুচ্ছ বহু কাহিনীতে তার ঝুলি ভরে ওঠে। সে সব তুচ্ছ কথা একমাত্র নারীই সংগ্রহ করতে পারে এবং নারীতেই তা শোনে আগ্রহ করে।

এমনিই একটি কাহিনী অকস্মাৎ লালকুঁয়রের রক্তে বহুদিন পরে জ্বালা ছড়িয়ে দিয়েছে। শীতল রক্তে আগুন ধরেছে আবার। আর তার ফলে বহুদিনের হিম-আবাস ছেড়ে সর্পিণী আবার মাথা তুলেছে তাঁর মনের গোপন গুহায়।

ফররুখশিয়রেরও এক প্রিয়তমা জুটেছে।

পার্বতী, হিমালয়-দুহিতা। নগাধিরাজের একেবারে পাদ-পীঠে কিস্তোয়ার* রাজ্য। পাহাড়ী দেশ, পাহাড়ী রাজা। তাঁরই কন্যা। তুষার-মণ্ডিত হিম-গিরির মতো তার গাত্র-বর্ণ। পার্বত্য-কুসুমের পেলবতা তার ত্বকে, হিমালয়ের অন্তহীন রহস্য তার দৃষ্টিতে।

অপূর্ব রূপসী সেই মেয়েকে—মেয়ের বাবা স্বেচ্ছায় এসে পৌঁছে দিয়ে গেছেন বাদশার তাঁবুতে।

তা নইলে নাকি উপায় ছিল না আর। শৃগালের ভক্ষ্য হওয়ার চেয়ে সিংহের ভক্ষ্য হওয়াই ভাল এই ভেবে মরীয়া হয়েই এ কাজ করেছিলেন। নইলে লাহোরের সুবাদার আবদুস সামাদ খাঁর লুব্ধ দৃষ্টি থেকে নাকি কিছুতেই বাঁচানো যেত না সে মেয়েকে। সেই পার্বত্য-দুহিতার অপরূপ লাবণ্যের খ্যাতি বহু শত যোজন পার হয়েও তাঁর কানে পৌঁছেছিল, তিনি শিকারের নাম ক'রে স্বয়ং

---

* চর্মণ্বতী বা চেনাবের পাড়ে, সমুদ্রতীর থেকে ৫০০০ ফুট উঁচুতে এক উপত্যকার ওপর অবস্থিত ক্ষুদ্র শহরকে কেন্দ্র ক'রে ছোট একটি রাজ্য।

গিয়েছিলেন কিস্তোয়ারে। মেয়েকে দেখতে পান নি নাকি, আড়াল থেকে শুধু দেখেছিলেন তার দুখানি হাত, আর দেখেছিলেন তার গতিভঙ্গী—তাইতেই প্রায় ভূতগ্রস্তের মতো আচ্ছন্ন হয়ে ফিরে এসেছিলেন সুবাদার। তারপর কিস্তোয়ারের রাজার কাছে প্রার্থনা করেছিলেন ঐ দেবদুর্লভ দুখানি হাত ধরবারই অধিকার। হ্যাঁ, পাণিগ্রহণ করতেই চেয়েছিলেন তিনি।

কিন্তু ঐটুকু পার্বত্য দেশের রাজা হ'লেও তিনি সামান্য সুবাদারের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিতে রাজী হন নি। বাদানুবাদ ও কয়েকবার দূত প্রেরণের পর আবদুস সামাদ খাঁ ভয় দেখিয়েছিলেন সমস্ত কিস্তোয়ার রাজ্য ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে চেনাবের জলে ধুয়ে সমভূমি ক'রে দেবেন তিনি। সেখানে আপেলের চাষ করাবেন।

ঠিক সেই সময় শিকার করতে দিল্লী ছেড়ে কর্নালের সীমানা পার হয়ে কাছাকাছি এসে পড়েছিলেন বাদ্‌শা। সেই সংবাদটা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রাজা মন স্থির ক'রে ফেললেন। তরুণ, রূপবান, উদার বাদ্‌শা ফররুখশিয়র। যদি মুসলমানের হাতে দিতেই হয় তো সর্বশ্রেষ্ঠ পাত্রের হাতেই দেবেন তিনি। সূর্য হাতের কাছে থাকতে খদ্যোতের কাছে কোন্ কমলিনী আত্ম-সমর্পণ করে?

পাছে সংবাদটা ছড়ায় এবং সুবাদার বাধা দেন—এই ভয়ে কাউকেই তিনি জানান নি, এমন কি কন্যার মাকেও নয়। এক সন্ধ্যারাত্রিতে চুপিচুপি মেয়েকে আর জন-পাঁচেক মাত্র সশস্ত্র বিশ্বস্ত অনুচর নিয়ে ঘোড়ায় চেপে রওনা হয়েছিলেন। এবং সেদিন সারারাত এবং পরের দুটো দিন ও রাত শুধু মধ্যে মধ্যে সামান্য বিশ্রামের সময় বাদ দিয়ে—ঘোড়া ছুটিয়ে তাঁরা বাদ্‌শাহী তাঁবুতে এসে পৌঁছেছিলেন তৃতীয় দিন শেষ রাত্রিতেই।

তখনও বাদ্‌শা রাত্রির বিশ্রাম গ্রহণ করেন নি, মধ্যরাত্রির প্রমোদ বিলাস সবেমাত্র তখন শেষ হচ্ছে—এমন সময় দূত এসে জানাল স-কন্যা কিস্তোয়ার-রাজ দর্শন-প্রার্থী। এখনই যদি অনুগ্রহ হয় তো—

বিস্মিত বাদ্‌শা তখনই দরবারী তাঁবুতে এসে দেখা দিলেন। রাজা অভিবাদনে শির নত ক'রে দাঁড়িয়েছিলেন, বাদ্‌শার আশ্বাস ও অভয় পেয়ে এখন মাথা তুলে চাইলেন। তারপর নিঃশব্দে কন্যাকে সামনে এনে তার মুখের ওপর থেকে ওড়নাটা সরিয়ে দিয়ে শুধু বললেন, 'আমার বংশের ও আমার দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ কুসুম আপনাকে নিবেদন করতে এনেছি জাঁহাপনা, দয়া ক'রে গ্রহণ করুন!'

হোক্ দীর্ঘরাত্রি পর্যন্ত ব্যসন ও সুরাপানে আরক্ত চক্ষু—তবু তাঁর দৃষ্টি এত ক্ষীণ হয় নি যে সেই অপরূপ লাবণ্য তাঁর অনুভূতিকে উদ্দীপ্ত করবে না। তিনি এই পূজা গ্রহণ করেছিলেন প্রসন্ন চিত্তেই।

কৃতজ্ঞ বাদ্‌শা তখনই খাবাসদের ডেকে রাজার বিশ্রামের ব্যবস্থা করবার আদেশ দিলেন। পরের দিন সকালে তাঁকে খিলাৎ ও খেতাব উপহার—এবং সেই সঙ্গে কিছু জায়গীর দেবারও প্রতিশ্রুতি দিলেন। সুরা ও রূপে উন্মত্ত বাদ্‌শা প্রগল্‌ভ হয়ে উঠেছিলেন।

বিবাহ?

না, বিবাহের প্রশ্ন তখন ওঠে নি কোন পক্ষেই।

স্থান কাল ও পাত্র হয়তো কোনটাই সে রকম ছিল না।

নিবেদিত পুষ্পার্ঘ্য বাদ্‌শা তখনই—সেই মুহূর্তেই গ্রহণ করেছিলেন। কোন অনুষ্ঠানের বিলম্ব তাঁর সহ্য হয় নি।

আদর ক'রে বাদ্‌শা তাঁর পার্বতী প্রিয়ার নাম রেখেছিলেন নূরমহল!

নূরমহল নামেই তিনি প্রাসাদ আলো ক'রে অধিষ্ঠান করছেন। আজও তাঁর সেই অলোক-সাধারণ রূপের ঘোর বাদ্‌শার দৃষ্টি থেকে মুছে যায় নি। তাঁর অসংখ্য দাসী, একাধিক মহিষী এবং আরও নানা প্রমোদ-সহচরের মধ্যে আজও নূরমহলই প্রধান এবং তাঁর প্রিয়তমা।

নূরমহল!

জাহাঙ্গীর বাদ্‌শা আদর ক'রে তাঁর প্রেয়সীর ঐ নাম রেখেছিলেন। কিছু-দিন পরেই নূরমহল হয়েছিলেন নূরজাহাঁ!

হয়তো এই নূরমহলও সেই আশা পোষণ করে মনে-মনে। অন্তত তার গর্বিত আচরণে ও বাক্যে—সেই কথাটাই প্রকাশ হয়ে পড়ে।

হায় বুদ্ধিহীনা নারী!

ভুলে গেছে যে সে-কাল পাল্‌টেছে। সে বাদ্‌শাও আর নেই।

জাহাঙ্গীরের মতো শক্তিধর বাদ্‌শার পক্ষেই সম্ভব হয়েছিল অজ্ঞাত-কুলশীলা এক নারীকে, শের আফগানের বেওয়াকে এতবড় সাম্রাজ্যের সমস্ত লোকের মাথার ওপর বসাবার।

ফররুখশিয়র জাহাঙ্গীর নয়। এ বাদ্‌শার বাদ্‌শাহী শুধু কল্পনাই।

কিন্তু নূরমহলের অত বুদ্ধি নেই।

কিছু বুদ্ধি থাকলেও সে মাত্র পাঁচবছর আগের অপর এক স্পর্ধিতা নারীর

পরিণাম দেখে সতর্ক হ'তে পারত।

তারও তো ঐ পথ ছিল, দ্বিতীয় নূরজাহাঁ হবার।

তবু বাদ্‌শা জাহান্দার শা ঠিক তাঁর অমাত্যদের হাতের পুতুল ছিলেন না।

লালকুঁয়রের পরিণাম থেকে সতর্ক হতে পারে নি এ বালিকা—কিন্তু সে তাঁর কথা শোনে নি বলে নয়। ভাল ক'রেই শুনেছে। অসম্ভব আগ্রহ ও কৌতূহল তার সেই নাচওয়ালী মহিষী সম্বন্ধে। সমস্ত কাহিনী শুনতে চায় সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে।

প্রাসাদ-দুর্গের তাতারী প্রহরিণীদের ডেকে সে পদসেবা ক'রতে বলে—আর তাদের কাছে প্রশ্ন ক'রে ক'রে জানে। ওর সমস্ত কৌতূহল শুধু যেন লালকুঁয়র সম্বন্ধেই।

শোনে আর হেসে লুটিয়ে পড়ে!

এই বেদেনীর সামনেই এ দৃশ্য অভিনীত হয়েছে অনেক বার।

লালকুঁয়রের অপদার্থ ভাইরা এসে জুটেছিল তাঁর সৌভাগ্যের সময়। তাদের খেতাব ও জায়গীর দেওয়া হয়েছিল। সেই সঙ্গে দেওয়া হয়েছিল সম্ভ্রান্ত ওমরাহ্‌দের সমান অধিকার। মূর্খ অপদার্থ ভাই তিনটিকেই ইমতিয়াজ-মহল প্রশ্রয় ও দাক্ষিণ্যে উন্মত্ত ক'রে তুলেছিলেন!

আজ তারা কোথায়?

এই প্রশ্ন নিজেই করে নূরমহল, নিজেই তার উত্তরে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপে ফেটে পড়ে!

'আমি কিন্তু এত বোকা নই তা ব'লে বাপু! ইচ্ছে করলে সারা কিল্লোয়ারের লোকদের ডেকে এনে মসনব্ বিলোতে পারতুম—কিন্তু তা করি নি। অবশ্য আমার মালিকও তাঁর জ্যাঠামশাইয়ের মতো অত নির্বোধ নন। তিনি এমন একটা কিছু করবেন না—যাতে হাস্যাস্পদ হন।'

এমনি ছোট ছোট প্রসঙ্গ। তুচ্ছাতিতুচ্ছ কথা।

কোন্ পরিচিত এক সারেঙ্গীকে সুপারিশ ক'রে পাঠিয়েছিলেন লালকুঁয়র জুলফিকর খাঁর কাছে, বড় একটা চাকরির জন্যে। পথে পথে বাজিয়ে বেড়ায় যে—হুকুম হয়েছিল তাকে বার্ষিক এক লক্ষ টাকা মাইনের চাকরি দিতে হবে! জুলফিকর খাঁর সাহস হয় নি সোজাসুজি তাকে প্রত্যাখ্যান করবার। তিনি বলেছিলেন, 'বাপু হে, বড় চাকরি পেতে হ'লে সরকারে নজর দিতে হয়, তা জানো তো? তুমি কি নজর দেবে?' সে ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করেছিল, 'কী দিতে

হবে বলুন? আমার সম্পত্তি বলতে তো এই সারেঙ!' 'তাই তো! তাহ'লে কী আর দেবে। বরং তুমি হাজার খানেক সারেঙ্ই জমা দাও সরকারী খাজাঞ্চীখানায়।' মুখ টিপে হেসে বলেছিলেন জুলফিকর খাঁ। সে লোকটি অনেক চেষ্টা ক'রেও, বহু লোককে প্রলোভন দেখিয়ে চড়া-সুদে টাকা ধার করেও শ-খানেকের বেশী সারেঙ্ কিনতে পারে নি। বহু কষ্টে অর্জিত সেই সারেঙ্ সরকারী খাজাঞ্চীখানায় জমা দিয়ে জুলফিকর খাঁর সঙ্গে দেখা করলে। কিন্তু উজীর বললেন, 'বাকী ন'শও জমা দিতে হবে—নইলে ও চাকরি পাওয়া যাবে না!' বেচারী হতাশ হয়ে ফিরে গিয়ে নালিশ করেছিল লালকুঁয়রের কাছে। লালকুঁয়র ক্রুদ্ধ হয়ে কথাটা জানিয়েছিলেন স্বয়ং বাদশাকে। কিন্তু উন্মত্ত হলেও জাহান্দার শা আলমগীরের পৌত্র। জুলফিকর খাঁ মৃদু হেসে যখন ঐ পদের দায়িত্ব ও পদপ্রার্থীর যোগ্যতার কথা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন—তখন বাদশাও লজ্জাবোধ না ক'রে পারেন নি।

ঘটনাটা নিয়ে তখনও শাহী দফতরে অনেক হাসাহাসি হয়েছিল। কিন্তু সেটা তখন অত আঘাতের কারণ হয় নি। কারণ তখনও সর্পিণীর যথেষ্ট বিষ ছিল। শক্তিমানরা সামান্য উপহাসে বিচলিত হয় না! শক্তি হারালে বেশী লাগে।

তাই—এতকাল পরে, সব হারিয়ে যখন সমস্ত ভবিষ্যৎ অন্ধকার একাকার হয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছিল, মনে হচ্ছিল যে ইহলোকের কোন কিছুই আর আঘাত করবে না—তখন এই সংবাদটা উত্তপ্ত ছুরির ফলার মতোই একসঙ্গে কেটে ও পুড়িয়ে চলে গেল বুকের মধ্যে—অনেকখানি পর্যন্ত।

এই সারেঙ্গীর কাহিনী সবিস্তারে শুনে এমন হেসেছে নূরমহল যে প্রায় একদণ্ডকাল সে-হাসি থামাতে পারে নি, তার ফলে নাকি তার শরীর খারাপ হয়ে গেছে।

অনেক কষ্টে, অনেক পরিচারিকার অনেক চেষ্টার ফলে হাসি থামতে প্রশ্ন করেছিল নূরমহল, 'ঐ বদ্ধ পাগলীর মধ্যে কি দেখেছিলেন জাহান্দার শা? অবশ্য মেয়েটার খুব দোষ দেওয়াও যায় না, ছিল পথের ভিখিরী, একেবারে বাদশার হারেমে এসে পড়ল, মাথা তো খারাপ হতেই পারে।...এই জন্যেই বলে বাদশার অন্তঃপুরে দাসী আনতে হ'লেও খানদানী ঘর থেকে আনা উচিত!'

খান্‌দানী ঘর!

লালকুঁয়রের মুখে ম্লান হাসি ফুটে উঠল। তাই বটে। মিয়া তানসেনের

সাক্ষাৎ বংশধর তাঁর বাবা। তিনিই কি পথের ভিখিরী ছিলেন? পথে বেরোনো যে তাঁর সাধনা—তাঁর ব্রত। সিংহাসনের জন্যে তিনি সাধনা করেছিলেন।

লালকুঁয়র শুনেছেন হিন্দুদের এক দেবী তাঁর স্বামীকে পাবার জন্যে অ-পর্ণা হয়ে তপস্যা করেছিলেন। লালকুঁয়রেরও যে তাই। অজ্ঞান মূর্খ পাহাড়ী মেয়ে—কী বুঝবে তাঁর তপস্যার কথা।

ঐ হিন্দুদেরই পুরাণে নাকি এমন কাহিনী অনেক আছে। সুকঠোর সাধনার বর-স্বরূপ প্রচণ্ড শক্তি পেয়ে দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে বহু সাধক, তার ফলে তাদের পতনেরও দেরি হয় নি—প্রায় লালকুঁয়রের মতোই পতন ঘটেছে।

পতনটা সত্যি হ'তে পারে কিন্তু সাধনাটাও কম সত্যি নয়।

কানে গেল বেদেনী তখনও নূরমহলের সেই হাসির গল্প বলে যাচ্ছে।

পদসেবিকা তাতারিণীকে নাকি তারপর আবার প্রশ্ন করেছেন নূরমহল, 'তা সেই দ্বিতীয় নূরজাহাঁ বেগমের পরিণামটা কি? তিনি এখন কোথায় রাজত্ব করছেন?'

'ও মা, তাঁকে তো সোহাগপুরায় চালান করা হয়েছে।'

'সোহাগপুরা? সেটা আবার কি?'

'কেন, মুঘল বাদশাদের বেওয়া-মহল—জানেন না? ওঁর মতো মহিষীদের ঐখানেই চালান করা হয় যে! খেতে পায় আর থাকতে পায়—একখানা ঘরে। কিন্তু তাই-ই তো ঢের। ঐটুকুও যদি না মিলত তো কি দশা হ'ত ভাবুন দেখি।'

'তা বটে। বেচারী। তাহলে এই পরিণাম হয়েছে মহামান্যা বেগম ইমতিয়াজ-মহল সাহেবার? ভাল, ভাল!'

আর শুনতে পারেন নি লালকুঁয়র।

দুহাতে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছেন বেদেনীকে, 'তুই যা, তুই যা! সরে যা তুই, চলে যা!'

হাসতে হাসতে উঠে চলে গিয়েছে বেদেনী। সে হাসি নির্জন নদীতীরে অনেকক্ষণ পর্যন্ত প্রতিধ্বনিত হয়েছে—'হা-হা-হা-হা!'

॥ বারো ॥

ফিরিঙ্গিরা সত্যিই জিনিসটা তৈরী করতে জানে। এই আয়না জিনিসটা। এতে যে প্রতিচ্ছবি ফোটে তা যেমন উজ্জ্বল, তেমনি স্পষ্ট। আর হয়তো ঠিক সেই কারণেই—কিছুটা নিষ্ঠুরও।

আয়নাতে ফুটে-ওঠা নিজের মুখখানার দিকে অনেকক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন লালকুঁয়র। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অনেক রকম ক'রে দেখলেন। তারপর খাটিয়া থেকে উঠে খোলা দরজাটার সামনে এসে আরও ভাল ক'রে চাইলেন।

না। ভুল দেখেন নি তিনি। ঘরে আলোর অভাব আছে ঠিকই, ঝরোকা বা জানলাহীন ঘরে বাইরের মতো আলো থাকা সম্ভব নয়—কিন্তু তাতে যে অসুবিধাটা হচ্ছিল, সেটা দূর হওয়াতেও ওঁর কোন সুবিধা হ'ল না। যেটাকে তিনি দৃষ্টির অস্পষ্টতা বলে মনে করছিলেন—আসলে সেটা ওঁর জরা-চিহ্ন ছাড়া আর কিছু নয়। উজ্জ্বল আলোয় বরং আরও স্পষ্ট, মর্মান্তিক ভাবেই স্পষ্ট হয়ে উঠল—মিলিয়ে গেল না একটুও। ললাটে রেখা পড়েছে। চোখের নিচে, কপালেও। সামান্য—তবু অস্বীকার করা চলে না।

সেই উজ্জ্বল মসৃণ ত্বক্—যা দেখে একদা শাহজাদা মির্জা মুইজ্-উদ্দীনের দৃষ্টি মোহর্মাদর হয়ে উঠেছিল এবং সে মোহ আমরণ লেগেই ছিল তাঁর দৃষ্টিতে—সে ত্বকেও কেমন একটা কর্কশ আস্তরণ যেন। পূর্বের সে আশ্চর্য মসৃণতা আর একটুও অবশিষ্ট নেই। চোখের কোণেও পড়েছে কালি। যতটা কালি সুর্মা কি কাজলে ঢাকা যায়—তার চেয়ে অনেকটাই বেশী। চোখের কোলে সামান্য কালিমা কি কালিমার আভাস অনেক সময় পুরুষের চিত্তকে কামনা-চঞ্চল ক'রে তোলে, দৃষ্টিকে ক'রে তোলে বহ্নিশিখার মতো দীপ্ত। কটাক্ষকে তোলে শানিয়ে। কিন্তু এ আরও কালো। অল্প বয়সের উচ্ছৃঙ্খলতা স্বাস্থ্যোজ্জ্বল মুখে যেটুকু ছাপ রাখে তা নয়, অস্বাস্থ্য বা বয়সের চিহ্ন বহনকারী গভীর কালিমা এ।

দীর্ঘদিনের কান্নায় চোখের পাতা উঠে গিয়েছে। ভাল ক'রে আয়নায় তাকাতে গিয়ে এটাও চোখে পড়ল। সেই সুদীর্ঘ পক্ষ্ম—যা বহুদূর অবধি কপোলে ছায়া বিস্তার করত—তা এখন হৃত-গৌরব। একদা যা পুষ্পাচ্ছাদিত বনভূমির মতো ছিল, আজ তা মরু-প্রান্তরের মতো তৃণবিরল।

তা হোক—ভাল ক'রে কাজল টেনে দিলে এ দৈন্য হয়তো ঢাকা পড়বে—কিন্তু মুখের এই দাগগুলো, চোখের কোলের এই কালি ?

আয়নাখানা নামিয়ে লালকুঁয়র আবার ফিরে এসে খাটিয়ায় বসলেন। সঙ্কীর্ণ অপ্রশস্ত ঘর, আসবাব নেই বললেই চলে। হাতীর-দাঁতের-মীনা-করা আবলুশ কাঠের পালঙ্ক এবং ভেলভেটের শয্যা আজ স্বপ্নের মতো দুর্লভ এবং অবাস্তব মনে হয়। মনে হয় এই খাটিয়া এবং সামান্য শয্যাতেই তিনি আজীবন অভ্যস্ত।

তাই-ই তো ছিল। সামান্য ব্যবসায়ীর মেয়ে তিনি, নিজে বেছে নিয়েছিলেন রাস্তার অতি সাধারণ নাচওয়ালীর জীবিকা। শুনেছেন তানসেনের রক্ত আছে তাঁর ধমনীতে। সেই রক্তই নাকি তাঁর কণ্ঠস্বরকে দিয়েছে অফুরন্ত সুরৈশ্বর্য। কিন্তু আজ সে কথা ওঁর বিশ্বাস হয় না। পথের মেয়ে তিনি, পথের নাচওয়ালী। এই ধরণের শয্যাতেই অভ্যস্ত তিনি চিরকাল। বরং এমন দিন ঢের গেছে যখন এটুকুও জোটে নি তাঁর। পথেই কেটেছে—সতি-কারের আকাশের নিচে। পাকা বাড়ির নিরাপদ আশ্রয় এবং নিশ্চিন্ত নিরুদ্বিগ্ন জীবন যখন সুখ-স্বর্গ বলে মনে হ'ত। তার চেয়ে বেশী স্বাচ্ছন্দ্য ছিল কল্পনাতীত।

তার পর এল জোয়ার। সৌভাগ্যের জোয়ার। সামান্যা বাঁদী, চেয়েছিলেন ময়ূর-সিংহাসনে বসতে, চেয়েছিলেন দ্বিতীয় নূরজাহাঁ হ'তে। দুনিয়ার বাদ্‌শার তাজ পরলে চলবে না শুধু—সে তাজ পায়ে লোটানো চাই। এই ছিল তাঁর স্বপ্ন।

তাঁর এই দুঃসাহসিকতার, এই দুরাশার চরম পরীক্ষা হিসেবেই ভগবান বুঝি জীবনে দিয়েছিলেন সেই পরম সুখের দিনগুলি। প্রতিষ্ঠা, যশ, অর্থ, প্রতাপ—সবই দিয়েছিলেন তিনি, দিয়ে মনটা বুঝতে চেষ্টা করেছিলেন।

ওঃ, তখনও যদি থামতেন উনি, তখনও যদি খুশী থাকতেন। উনি চাইলেন আরও বেশী, আরও ঢের। বিধাতা হেসেছিলেন সেদিন ওঁর ধৃষ্টতায়, ক্রূর হাসি। দুনিয়ার বাদ্‌শা, রাজ্যেশ্বরকে ক'রে দিলেন ওঁর পদানত, পদাশ্রিত। সৌভাগ্যের নেশায় মাতাল হয়ে উঠলেন উনি, পাগল হয়ে গেলেন। ছিনিমিনি খেললেন তখ্‌ৎ নিয়ে, তাজ নিয়ে। চোখের ইঙ্গিতে কত ভিখারী হ'ল রাজা—রাজা হ'ল ভিখারী। তর্জনীহেলনে কত নির্দোষ নিরপরাধ মানুষের প্রাণ গেল, উন্মত্ত খেয়ালে খুনী আসামীরা পেল পরিত্রাণ। এত গোস্তাকী কি খোদা সইতে পারেন ?

তাছাড়া ময়ূর-সিংহাসন এবং কোহ্‌-ই-নূর—বাঁদীর কপালে সইবে কেন? মিলিয়ে গেল এক নিমেষেই, যেন চোখের পলক না ফেলতে ফেলতেই। পরিপূর্ণ সুখের তীব্র স্মৃতিই রইল শুধু। হিন্দুদের পৌরাণিক রাক্ষস রাবণের চিতার মতোই তা জ্বলতে লাগল বুকে। অনির্বাণ সে আগুনের পরিসমাপ্তি নেই—চিতাভস্মের স্তূপেও ঢাকা পড়ে না সে অনল।

যে জীবন ছিল ঈপ্সিত—আজ তা-ই দুর্বহ। ওঁর জন্য—শুধু ওঁর জন্যই ওঁর বাদশা ওঁর প্রেমিক, সহাতুর মালিক প্রাণ দিলেন। আর—হে খোদা, অতিবড় শত্রুরও যেন অমন মৃত্যু না হয়! অমন পৈশাচিক, ভয়াবহ মৃত্যু!

যেন ছট্‌ফট ক'রে উঠে দাঁড়ালেন লালকুঁয়র। ছুটে বাইরে এলেন। হাওয়া কি দুনিয়ায় কোথাও নেই? থাকলে তিনি নিঃশ্বাস নিতে পারছেন না কেন। সোহাগপুরা—বেওয়া-মহলের এই সঙ্কীর্ণ ঘরে হাওয়া ঢোকে না—তাই? কিন্তু এর চেয়েও ঢের বেশী সঙ্কীর্ণ ঘরেও তো তিনি এককালে থাকতে অভ্যস্ত ছিলেন। কৈ, তখন তো এমন ক'রে নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে নি তাঁর।

না কি—তাঁরই দুর্ভাগ্য, তাঁরই কৃতকর্মের ফল এসে তাঁর চারিদিকের হাওয়া বন্ধ ক'রে ঘিরে দাঁড়িয়েছে—তাই?

আঃ! না, এই যে বাইরে হাওয়া আছে। বেশ ঠাণ্ডা বাতাস। ঈশ্বরের আশীর্বাদের মতো। এই তো কি অফুরান ঐশ্বর্য! কৈ, এর জন্য তো কেউ মারামারি হানাহানি করে না। কেউ তো কেড়ে নিতে চায় না। অথচ এটুকু না থাকলে আর সবই তো অর্থহীন হয়ে যায়।

লালকুঁয়র সেই ঠাণ্ডা বাতাসে বার বার মাথাটায় ঝাঁকানি দিয়ে যেন প্রকৃতিস্থ হ'তে চেষ্টা করেন। না, অনুশোচনা আর হাহাকারে তিনি এমন ক'রে দিন কাটাবেন না। জীবন নিয়ে তিনি যখন খেলা করতেই চেয়েছিলেন—তখন একবার হেরেই আত্মসমর্পণ করবেন না দুর্ভাগ্যের কাছে।

আর একবার খেলবেন তিনি। খেল্ দেখাবেনও। না হয় আবারও হারবেন। এই চিতার আগুনের কথাটা ভাবতেই আজ প্রথম ওঁর কথাটা মনে পড়েছে। আগুন!—বেশ তো। এ আগুনে শুধু উনি-ই জ্বলবেন—জ্বালাতে পারবেন না? কেন, ওঁর প্রাণশক্তির বহ্নি কি নিভে গেছে একেবারে? আবারও আগুন জ্বালবেন। জ্বালাবেন আবারও।

কিন্তু—ঐ কিন্তুটাই যে মস্ত সমস্যা হয়ে উঠেছে। সংশয়টা মনে দেখা

দিয়েছিল বলেই বহুদিন পরে দাসীকে দিয়ে এই আয়নাটা কিনে আনিয়েছেনি।

তবু এত সহজে হাল ছাড়তে রাজী নন লালকুঁয়র।

শুনেছেন এই ফিরিঙ্গিদেরই কি সব প্রসাধন আছে, যা মাখলে চর্মের রুক্ষতা মিলিয়ে পেলবতা আসে, অকাল-জরার দাগ নিশ্চিহ্ন হয়—শুক্‌নো গালে আবার গোলাপ ফোটে। পাওয়া যায়, এই দিল্লী শহরেই পাওয়া যায়। কিন্তু নাকি বড় বেশী দাম।

বেগম-মহলের অধিবাসিনী তিনি, সোহাগপুরার বাসিন্দা। একটি ঘর, মাসিক দশ তঙ্কা নগদ আর দুজনের মতো আটা, ডাল, ঘি, এই তাঁর বরাদ্দ। পরিত্যক্ত জুতোর মতোই বাদশাহী হারেমের বাড়তি স্ত্রীলোক তাঁরা—এটুকু যে তাঁদের মেলে, পথে বসে ভিক্ষা করতে হয় না, এই তো যথেষ্ট, এর জন্যই তাঁদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। আরও কি চান তিনি? তিনি তো বিবাহিতা স্ত্রীও নন। নতুন বাদ্‌শা সোজাসুজি তাঁকে তাড়িয়ে দিতেও পারতেন—অথবা কোতল করাতে। তাঁর অপরাধ তো কম নয়। না, বাদ্‌শা অনুগ্রহই করেছেন।

তবু দশ টাকা দশ টাকাই। তার মধ্যে থেকে একটি ঝিয়ের মাইনে এবং খরচাও চালাতে হয়। এখনও এটুকু বিলাস ছাড়তে পারেন নি তিনি। একেবারে সোজাসুজি নিজের পোশাক নিজে কাচা—নিজের বিছানা নিজে রোদে দেওয়া—এটা এখনও অভ্যাস হয় নি।

আনতে পারতেন অনেক কিছুই—হয়তো শেষ মুহূর্তেও। কয়েকটা মোতির মালা আনলেও তার ঢের দাম পাওয়া যেত। কিন্তু তা তিনি পারেন নি। তাঁর মালিকের শেষ মুহূর্তগুলিকে সুধায় ভরে দিতে তিনিও যে ত্রিপোলিয়া ফটকের কাটকে আটকা ছিলেন। অবশ্য তাঁর কাছ থেকে হয়তো কেউ অলঙ্কার কেড়ে নিত না—কিন্তু সে সব কথা মনেও হয় নি সেদিন। সামান্য যা তাঁর গায়ে ছিল তাই নিয়েই সর্বহারা সর্বনাশিনী সেদিন পথে নেমে দাঁড়িয়েছিলেন। তারও অনেক কিছুই গেছে সেদিন পথে আসতে আসতে এবং এই ক'দিনে। একেবারে খুদিগুঁড়ি যা আছে—সেটা তিনি রেখে দিয়েছেন শেষ দিনের জন্য। যদি কোন দিন বাদ্‌শাহী খেয়ালে একেবারে পথেই দাঁড়াতে হয়—সেই দিনের সম্বল! অসুখ-বিসুখ অনেক কিছুই আছে তো।

সেই শেষ পুঁজি ভেঙেই আজকের এই খেয়াল মেটাবেন নাকি? ক্ষতি কি? আর একবার শেষবারের মতো জ্বলে উঠতে না হয় ইহকালের সব পুঁজিই শেষ হবে। তবু সেই-ই হবে বাঁচার মতো বাঁচা!

বাইরে অপরাহ্ণের আলো ম্লান হয়ে আসছে। এখনই দাসী আসবে চেরাগ নিয়ে। তার আগেই সেই গোপন তহবিল থেকে কিছু বার করতে হবে।

শুধুই ফিরিঙ্গি প্রসাধন-দ্রব্য নয়। আরও অনেক কিছু চাই। সাজ-পোশাক, অলঙ্কার—ঝুটো হ'লেও তার দাম পড়বে কিছু—আর দিল্লী যাওয়ার রাহাখরচ। দিল্লীতে থাকতেও হবে ক'দিন। অন্তত পঞ্চাশটি মোহর খরচ হবে। তা হোক। আজ আর কিছু ভাববেন না।

লালকুঁয়র উঠে অন্ধকারের মধ্যেই বিছানার তলায় হাতড়ান। উত্তেজনায় হাত কাঁপছে তাঁর। কাঁপছে তাঁর সর্বাঙ্গ। কাঁপছে তার মনও।

আবার বয়েল-গাড়ির যাত্রা। লালকুঁয়র আর দাসী। আবার দিল্লী। ধূলিধূসরিত ক্লান্ত দেহে আবারও একদিন শাজাহানাবাদের এক সঙ্কীর্ণ গলিতে এসে পৌঁছনো। আজও তাঁর এ পথঘাটগুলো মনে আছে, এটাই আশ্চর্য! আসলে ক'দিনেরই বা কথা। এতগুলো বিপর্যয়, ভাগ্যের এমন বিচিত্র উত্থান-পতন—এত দ্রুত ঘটে গেছে তাঁর জীবনে যে, সেই জন্যেই মনে হচ্ছে বহুদিনের কথা হ'ল। বয়সই বা কত তাঁর? এরই মধ্যে বেওয়া-মহলে সর্বস্বান্ত নির্বাপিত সমাহিত জীবন যাপন করার কথা নয়।

ফাতিমা নাচওয়ালীর বাড়ি খুঁজে বার করা গেল বৈ কি!

সে বুড়ী আজও তেমনি আছে। চোদ্দ-পনেরো বছর আগেও যেমন দেখে-ছিলেন লালকুঁয়র—ঠিক তেমনিই। পাকাচুলে তেমনিই মেহেদীর ছোপ, চোখের পাতায় তেমনি গাঢ় কাজলের দাগ, ভাঙ্গা দাঁতে পানের কষ এবং মুখে কড়া তামাকের গন্ধ। সব ঠিক ঠিক—তেমনি আছে। আজও যে সে তার পুরোনো ব্যবসা—ছোট ছোট মেয়েদের কিনে এনে পুষে নাচ শিখিয়ে বিক্রি করা বা বাদশা-নবাব-ওমরাহ্‌দের হারেমে সরবরাহ করা—ছাড়ে নি, তা তার বাড়ির বাইরে থেকেই, ঘুঙুরের আওয়াজে এবং কিশোরীদের কলকণ্ঠে টের পাওয়া যায়।

দাসী মারফৎ খবর পেয়ে বুড়ী বেরিয়ে এল। চেরাগের আলোতে ভুরু কুঁচকে চেয়েও চিনতে একটু দেরি হ'ল—কিন্তু সেই ক্ষীণ দৃষ্টি এবং বিস্মৃতির কুয়াশা কাটিয়ে পরিচয়টা মনের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠতেই, যেন ভূত-দেখার মতো ভয় পেয়ে তিন পা পেছিয়ে গেল সে। তারপর প্রাণপণ চেষ্টায় একটা দেওয়াল ধরে নিজেকে সামলে নিয়ে কোনমতে কম্পিত হাতে কুর্নিশ করার একটা ভঙ্গী করতে করতে বহু কষ্টে উচ্চারণ করলে, 'মা-মা-মালেকা! আপনি! সত্যিই আপনি?'

লালকুঁয়র এগিয়ে এসে হাতটা চেপে ধরলেন ফতিমার—'চুপ চুপ! মালেকা নয়। বেগম নয়। বেওয়া, বাঁদী। আজ কিছুই নেই আমার। না ক্ষতি করার ক্ষমতা, না উপকার করার। অর্থ-সামর্থ্য সব গেছে। আজ আমিই তোমার সাহায্যপ্রার্থী। দ্যাখো—আশ্রয় দেবে, না পথের মানুষ পথে গিয়ে দাঁড়াব?—মন খুলে বলো। এতটুকু ক্ষোভ রাখব না, এতটুকু অভিযোগ করব না। চক্ষুলজ্জার কোন কারণ নেই। বলো—।'

ফাতিমা ততক্ষণে সামলে নিয়েছে নিজেকে। আর কোন সংশয় নেই। গলার স্বর, কথা বলার ভঙ্গী—পরিচিত যে তার, অতি পরিচিত।

সে 'লালী'র হাত ছাড়িয়ে আভূমি-নত হয়ে সেলাম করলে ওঁকে। বললে, 'এ বুড়ী আজও আপনার বাঁদী মালেকা। এ গরীবখানা আপনারই বাঁদী মহল। আসুন, ভেতরে আসুন।'

'তোমার বাড়িতে আমাকে গোপনে আশ্রয় দিতে পারবে তো ফাতিমা? আমার পরিচয়, আমার অস্তিত্ব কেউ না জানতে পারে—এমন ভাবে?'

ফাতিমা আবারও একবার অভিবাদন করলে—'এ কাজ বাঁদীর কাছে প্রথমও নয়, নতুনও নয় হুজরৎ!'—সে লালকুঁয়রের হাত ধরে ভেতরে নিজস্ব নিভৃত ঘরটিতে নিয়ে গেল।

স্নান ও বিশ্রামের পর লালকুঁয়র তাঁর ইচ্ছাটা জানালেন ফাতিমাকে। ফাতিমা অনেকক্ষণ অবাক হয়ে চেয়ে রইল ওঁর মুখের দিকে। সে কি ভুল শুনছে, না ভুল বুঝছে? অতিকষ্টে অবশেষে উচ্চারণ করল সে, 'আপনি? আপনি যাবেন?' স্পষ্ট অবিশ্বাস তার কণ্ঠে।

'হ্যাঁ। আমিই যাব ফাতিমা। আমি যে সব পারি—তা কি আজও তুমি জানো না?—একদিন রাস্তার নাচওয়ালীদের সঙ্গে তোমার দোরে এসে দাঁড়িয়েছিলুম—সেদিনও তুমি দেখেছিলে আমাকে। আবার যেদিন দুনিয়ার বাদ্‌শার সঙ্গে তোমাকে দেখা দিতে এসেছিলুম—সেদিনও দেখেছ। আবার আজ এই—ভিখিরীর বেশে এসে দাঁড়িয়েছি—কিন্তু তাতে কি, আমি সেই আমিই—আজও চেষ্টা করলে অঘটন ঘটাতে পারব।'

'কিন্তু মালেকা' শুকনো ঠোঁটে জিভটা বুলিয়ে নিয়ে বলে ফাতিমা, 'ফররুখ-শিয়র বড় কড়া বাদ্‌শা। সিংহাসনে বসার দিন থেকেই রক্তপান শুরু করেছে সে—তবু তার তৃষ্ণা যেন মিটছে না। আর তেমনি তার যোগ্য সহচর হয়েছে—রাক্ষসের বন্ধু পিশাচ—মীরজুমলা।—যদি ধরা পড়ো মালেকা, মেয়ে-

ছেলে বলে, চাচী বলে রেয়াৎ করবে না।'

'তা জানি ফাতিমা। সে জন্য প্রস্তুত হয়েই যাচ্ছি! আর তাতে ক্ষতিই বা কি, যে কটা দিন বাঁচতুম—নাই বা বাঁচলুম! জীবনটাকে নিয়ে একটু খেলেই দেখি না। সোহাগপুরার এ জীবন, এ তো সমাধির নিচে বেঁচে থাকা। এর ওপর আমার লোভ নেই।'

'কিন্তু মালেকা'—আবারও বলতে যায় ফাতিমা।

লালকুঁয়রও বাধা দিয়ে বলেন, 'জানি। তাও জানি। ধরা পড়লে শুধু আমার নয়, তোমারও প্রাণ নিয়ে টানাটানি হবে। কিন্তু এমন একটা ব্যবস্থা করতে পারো না—যাতে তুমি নিজেকে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে রাখতে পারো? আর কারুর সঙ্গে যোগাযোগ ক'রে—কোনমতে খোজা জাবিদ খাঁর চোখ এড়িয়ে পারো না লালকিলার ঐ নরককুণ্ডে, ঐ শাহী-হারেমে ঢুকিয়ে দিতে?'

'তা হয় তো পারি মালেকা। আজও তোমার মেহেরবাণীতে সে ক্ষমতা হয়তো রাখি। কিন্তু কি দরকার? মিছিমিছি আর কেন এ সাংঘাতিক ঘূর্ণির মধ্যে এসে পড়ছ?'

সোজা হয়ে বসেন লালকুঁয়র—'ভুলতে পারি না যে ফাতিমা, কিছুতেই যে ভুলতে পারি না! আমার মালিক, আমার বাদশাকে কি নিষ্ঠুর ভাবে মেরেছে ওরা, কি অপমান করেছে! বাহাদুর শার বড় ছেলে সে—এ তখ্‌তের ন্যায্য মালিক। আমার অপরাধ যাই হোক, তারই তো তখ্‌ৎ। তবু ফররুখশিয়রের রাগ বুঝতে পারি, জাহান্দার শা তার বাপের মৃত্যুর কারণ। কিন্তু ঐ সৈয়দ আবদুল্লা, ঐ সৈয়দ হুসেন—ওরা কেন এ কাজ করলে? কি অনিষ্ট করেছিল জাহান্দার শা তাদের? ওদের এই বেইমানীর শোধ দেবই আমি ফাতিমা। আজ কিছুই নেই হয়তো—তবু এই দেহটা তো আছে। এই দেহটাতেই তিনি ভুলেছিলেন—আমার শাহানশাহ্‌। এর জন্যেই তিনি ইহকাল, ভবিষ্যৎ, রাজ্য সিংহাসন, মান সম্মান—সমস্তই ভুলেছিলেন। সে দেহে এখনও, আজও কিছু আগুন আছে—হয়তো খুবই সামান্য, হয়তো নিতান্ত স্ফুলিঙ্গ, তবু স্ফুলিঙ্গ থেকেও তো বৃহৎ অগ্নিকাণ্ড হয় ফাতিমা। দেখাই যাক না। যদি এ চেষ্টায় মরি, তবু আমার দুঃখ নেই। বুঝব এ দেহটা তাঁর কাজেই দিতে পেরেছি। মালিকের অফুরন্ত স্নেহের ঋণ কিছু তো শোধ হবে।'

দুটো কাঁধের বিচিত্র ভঙ্গী ক'রে ফাতিমা বললে, 'সে ছাখো মালেকা, তোমার মর্জি!'

কথাটা মনে প'ড়ে ক্রোধটাকে আরও দুঃসহই ক'রে তোলে ; শুধু অধীর ভাবে নিজের ঠোঁট নিজে কামড়ে রক্তাক্ত করেন বাদ্‌শা। হাত মুঠো করতে করতে নখ বিঁধিয়ে দেন নিজেরই হাতের তালুতে—

'তুমি মেয়েছেলে না হ'লে তোমার গোস্তাকীর জবাব এখনই দিতুম! কেন, কেন হাসছ তুমি? কী এমন তোমার দাম যা হিন্দুস্তানের বাদ্‌শা দিতে পারেন না!'

হাসি বন্ধ হ'ল না। বরং আরও খিলখিলিয়ে উঠল সেই কলকণ্ঠ। হাসতে হাসতেই বললে সে, 'গোস্তাকীর জবাব কি দেবেন আলিজা, ক্ষমতার মধ্যে আপনার তো আছে জান নেবার ক্ষমতা শুধু—তাও আমার মতো অবলা জীবের, কিন্তু জানের পরোয়া যে করে না তাকে নিয়ে কি করবেন? আপনি হুকুম দিলে অকারণেই এই ছুরি নিজের বুকে বসিয়ে দিতে পারি, এতটুকু দুঃখ তার জন্যে করব না। বলুন, দেব বসিয়ে?'

বিদ্যুতের মতো ঝিলিক দিয়ে উঠল বাঁকা কিরীচখানা। হাতির-দাঁতের-কাজ-করা হাতলে এতটুকু সরু একটু জিনিস—কিন্তু তার দিকে চাইলেই বোঝা যায়—সাক্ষাৎ মৃত্যুর মতোই শাণিত আর অব্যর্থ!

ফররুখশিয়র যেন কঠিন একটা আঘাত পেয়ে খানিকটা প্রকৃতিস্থ হলেন। হতাশ হয়ে বসে পড়লেন দিওয়ানে। বললেন, 'কিন্তু আমাকে এত অবহেলা তোমার কিসের? আমাকে বিদ্রূপ করার মতো এত সাহস আসে কোথা থেকে?'

এবার স-রব হাসি বন্ধ হ'ল। নৃত্যারতা আগেই থেমেছিল, এবার অভিবাদন ক'রে স্থির হয়ে বসল। ইঙ্গিতে তবল্‌চী নিঃশব্দে অদৃশ্য হ'ল পর্দার আড়ালে।

নর্তকী হাসি-মুখেই বলল, 'অপরাধ নেবেন না শাহানশাহ্‌। অবহেলা ক'রে, বিদ্রূপ ক'রে হাসি নি। হেসেছি আপনার ছেলেমানুষিতে!—কী শাহী তখ্‌তে আপনি বসেছেন, তা আপনি এখনও বুঝতে পারেন নি আলিজা? কতটুকু ক্ষমতা আপনার? এই হারেমের বাইরে আপনি আর কোথায় যা-খুশি-তাই করতে পারেন? বাদ্‌শাহী করছে তো আপনার উজীর-এ-আজম, কুতুব-উল-মুলুক আর তার ভাই!—আপনি দাম দেবার কথা বলছিলেন শাহানশাহ্‌,—কী দাম দেবেন আপনি? বেশ, ধরা আমি দেব। এক ক্রোর টাকা আর সাতনরী মোতির মালা। দেবেন?'

মুখ শুকিয়ে ওঠে বাদ্‌শার। প্রতিকারহীন অপমানে রাঙা হয়ে ওঠেন।

ললাটে স্বেদবিন্দুর আভাস দেখা দেয়।

এক ক্রোর টাকা আর সাতনরী মোতির মালা! এত টাকা শাহী খাজানায় নেই। এর শতাংশও আছে কিনা সন্দেহ।

যুদ্ধের ফলে তাঁর কোষাগার নিঃশেষ। সিপাহীরা বহুদিনের বেতন পায় নি, রোজই গোলমাল করছে! বহু ঋণ সরকারের। আছে এক বেগমদের অলঙ্কার। সোনা-রূপোর বাসনগুলো পর্যন্ত লুঠ হয়ে গেছে। কৃপণ আজিম-উশ-শান বহু টাকা জমিয়েছিলেন কিন্তু সে সেই সর্বনাশা রাত্রিতেই, তাঁর পতনের সঙ্গে সঙ্গে, লুঠ-পাট হয়ে গেছে—এক কপর্দকও পান নি আজিম-উশ-শানের ছেলে ফররুখশিয়র।

শুক্‌নো ঠোঁটে জিভটা বুলিয়ে নিয়ে অসহায় ভাবে বাদ্‌শা বললেন, 'এ তুমি একেবারেই অসম্ভব দাম চাইছ! মাল না বেচবারই দাম এ তোমার। আমি কেন—আর কেউই দিতে পারবে না!'

তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ বেজে ওঠে সেই রজত-ঝরা কণ্ঠে, 'কে বলেছে আপনাকে শাহানশাহ্! এই শহরেরই একটি মানুষ রাজী হয়েছে এ দাম দিতে! আপনারই কুতুব-উল-মুলুক! সৈয়দ আবদুল্লা খাঁ ঢের বেশী পাঁসালো লোক আপনার চেয়ে। নির্বোধ আপনি শাহানশাহ্, গোস্তাকী মাফ করবেন, না বলে পারলুম না—জাফর খাঁর বাড়ি আর জুলফিকর খাঁর বাড়ি পেয়েছে তারা, ঐ দুটো বাড়িতে জহরৎ কত ছিল তা জানেন? জুলফিকর খাঁর আগে ও-বাড়িতে থাকতেন সায়েস্তা খাঁ—দু'জনেরই বহু পুরুষের ঐশ্বর্য ওখানে জমানো ছিল। বাহাদুর শার চার ছেলেরই বিষয় লুঠ করেছে বা করিয়েছে ওরা, সব ছিল ওখানে। শাহানশাহ্, এ জমানাতে টাকা যার, রাজত্ব তার! একথা ওরাও জানে, তাই ওরা বলে বেড়াচ্ছে যে, বাবরশাহী তখ্‌ৎ এবার ওদেরই—দু ভাই ভাগ ক'রে নেবে তখৎ-এ-তাউস!—তাই, ধরা যদি দিতেই হয় তো তাদের হাতেই দেব। কি বলেন?'

নিরুদ্ধ রোষে আবীরের মতোই লাল হয়ে উঠেছিল বাদ্‌শার মুখ—সে রক্তিমা কেটে এক রকমের রক্তহীন বিবর্ণতা ফুটে উঠল। যা সূক্ষ্ম বাষ্পের আকারে ছিল, এখন তা-ই বড় বড় জলবিন্দুতে পরিণত হ'ল ফররুখশিয়রের আশ্চর্য সুন্দর শুভ্র ললাট ক্রমে সে জলবিন্দুতে আচ্ছন্ন হয়ে গেল। তিনি কি যেন বলতে গেলেন কিন্তু তাঁর শুষ্ক কণ্ঠ ভেদ ক'রে তখনই কোন স্বর বেরোল না। বার দুই ঢোঁক গিলে অতি কষ্টে বললেন, 'নাচওয়ালী, তুমি কে তা আমি জানি-না। কিন্তু তুমিই আমার যথার্থ হিতাকাঙ্ক্ষিণী। আমার চোখ খুলে দিয়ে

কিন্তু ভয় নেই, ওদের ষড়যন্ত্রের যোগ্য ফল পাবে ওরা।'

নর্তকী অভিবাদন ক'রে উঠে দাঁড়াল। কুর্নিশ ক'রে নিঃশব্দে বেরিয়ে যাবার উপক্রম করতেই আকুল কণ্ঠে বাদ্‌শা আবার বলে উঠলেন, 'পিয়ারী পিয়ারী, তুমি এখনই চলে যেও না। আমি ঐ সৈয়দ আবদুল্লা আর হোসেন খাঁকে দলিত পিষ্ট করব, ওদের ঐ চুরি-করা ঐশ্বর্য সমস্ত এনে তোমার পায়ের তলায় ঢেলে দেব—তুমি প্রসন্ন হও, তুমি ধরা দাও।'

'যেদিন তা পারবেন সম্রাট, সেদিন যথাসময়ে এসে আপনার চরণে আশ্রয় নেব। আজ মাফ করবেন। এখন শুধু বখশিশটা পেলেই খুশী হবো!'

যেন প্রাণপণ চেষ্টায় বাদ্‌শা সামলে নিলেন নিজেকে। অপমানিত প্রত্যাখ্যাত হৃদয়াবেগের জ্বালায় দুই চোখও বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে এসেছিল—সেই বাষ্পের মধ্য দিয়ে সামনের এই মোহিনী নারীকে সর্পিণীর মতোই মনে হ'ল—তাকে সহ্য করাও যায় না, অথচ তার প্রভাবে বাইরেও যাওয়া যায় না যেন। কোনমতে গলা থেকে, সাতনরী নয়, একনরী এক মোতির মালা খুলে নর্তকীর গায়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে টলতে টলতে আবার এসে দিওয়ানে বসে পড়লেন—একান্ত অবসন্ন ভাবে।

অন্ধকার রাত্রে দ্রুতপায়ে মহলের পর মহল পেরিয়ে চলল নর্তকী। তার অবারিত, নিশ্চিত ও নিশ্চিন্ত গতি দেখে মনে হ'ল এখানে সে নবাগতা নয়—এ প্রাসাদের পথ-ঘাট অলি-গলি তার পরিচিত। একেবারে ত্রিপোলিয়া ফটকের সামনে এসে সে দাঁড়াল স্তব্ধ হয়ে।

এইখানকার ফাটকেই বাদ্‌শার বাদ্‌শা জাহান্দারকে বন্দী ক'রে রেখেছিল ওরা। তার পর এই মীরজুমলার পরামর্শে আর এই ফররুখ্‌শিয়রের হুকুমে—কুৎসিত, অপমানকর ভাবে মেরেছে। লাথি মেরে মেরে মেরেছে ওরা—কুত্তার কুত্তা বেইমান নৌকর একটা, জুতোসুদ্ধ লাথি মেরেছে তাঁকে।

অস্ফুটকণ্ঠে শুধু একবার একটা 'উঃ' শব্দ ক'রে উঠল নাচওয়ালী। সামান্য অব্যক্ত কাতরোক্তি, কিন্তু তবু দূর থেকে শাস্ত্রীদের পদচারণা সে-শব্দে বন্ধ হয়ে গেল। একজন বলে উঠল—'কে? কে ওখানে?'

এখনও এরা জেগে থাকবে এবং সত্যিই পাহারা দেবে—তা আশা করে নি। ত্বরিত বিদ্যুৎগতিতে নাচওয়ালী সরে এল সেখান থেকে।

পরোয়ানা আছে তার কাছে ঠিকই—নিরাপদে লালকিলা থেকে বেরিয়ে যাবে কিন্তু কী দরকার হাঙ্গামা বাধাবার!

অশিক্ষিত বর্বর পাহারাদার ওরা—এই দূর নির্জনতার মধ্যে সুসজ্জিতা তরুণী মেয়ে পেলে এখনই হয়তো নিমেষে পাগল হয়ে উঠবে।

বাদ্‌শাকে ঠেকানো যায়, কারণ তাঁর সম্মানবোধ আছে। এরা পশু—এদের ঠেকানো শক্ত!...

ওদিক দিয়ে ঘুরে নর্তকী একসময় দিল্লী ফটকের সামনে এসে পৌঁছল। বোধ হয় আগে থাকতে তাই বলা ছিল—তবলচী এইখানেই অপেক্ষা করছিল। সে নিঃশব্দে এগিয়ে এসে ওর সঙ্গ নিল।

তখন রাত শেষ হয়ে এসেছে। উষার খুব বেশী দেরি নেই। ঘুমচোখে বিরক্ত মুখে পাহারাদার পরোয়ানাখানা খুলে দেখল। স্বয়ং মীরজুম্‌লার হাতে লেখা পরোয়ানা—যে কোন সময় ফটক খুলে দিতে হবে। নাচওয়ালী ও তার তবল্‌চী কোন সময়ই বাইরে যেতে বাধা না পায়। জরুরী. বিশেষ পরোয়ানা

লণ্ঠনের অস্পষ্ট আলোতে পরোয়ানা চিনতে দেরি হয় না। বন্দুক নামিয়ে কোমর থেকে চাবির গোছা বার ক'রে ফটকের ছোট কাটা-দোরটা খুলে দেয় পাহারাদার। তার সঙ্গীরাও তন্দ্রাতে আচ্ছন্ন, এত রাত্রে দোর খুলে দেওয়ায় তারা বিস্মিত হলেও কোন প্রশ্ন করল না কেউ। একবার মাত্র চোখ খুলে দেখেই আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

নাচওয়ালীরা বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে আবার সেই কাটা-দোরটুকুও বন্ধ হয়ে গেল। নিশ্চিন্ত স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল নর্তকী!

রুক্ষ বালুময় মরুপ্রান্তরের মতোই পড়ে আছে সমস্তটা। শেষরাত্রের বাতাস যমুনার তীর থেকে আরও বালি উড়িয়ে নিয়ে আসছে। হু হু ক'রে হাওয়া বইছে নদীর দিক থেকে—একটা হাহাকার, একটা দীর্ঘনিঃশ্বাসের মতোই শোনাচ্ছে শব্দটা। ধূ ধূ করছে মাঠ। সেই অস্পষ্ট আব্‌ছায়ায় জায়গাটা খুঁজে বার করা শক্ত। তবু মেয়েটি খুঁজে পায় জায়গাটা।

হ্যাঁ। তার অন্তত কোন সন্দেহ নেই। এই—এইখানেই শাহানশাহের কাটা কবন্ধ এবং মুণ্ডটা পড়ে ছিল। গলিত দুর্গন্ধ শব—শৃগাল কুকুরের ভক্ষ্য—তবু তা এককালে, তার বাদ্‌শা তার প্রিয়তমেরই দেহ ছিল। নদীর বালি উড়ে এসে ঢাকা পড়েছে তবু চিনতে অসুবিধা নেই। ঐ বালি সরালে এখনও হয়তো রক্তের আভাস, পচা মাংসের সঙ্গে জট-পাকানো বালির ডেলা মিলবে—

এই তো—এইখানে

ছুঁড়ে ফেলে দিল নর্তকী তার ওড়না মুখ থেকে! ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল

সমস্ত অলঙ্কার গা থেকে! বহুমূল্য সাটিনের কামিজও খুলে ফেলে দিল। তার ভিতরে সামান্য সুতীর যে জামাটা ছিল—সেইটে রইল শুধু, তারপর সেই সাধারণ দীনবেশে দীনা হৃতসর্বস্বা রমণী বালির উপর লুটিয়ে পড়ল—ভগ্ন হৃদয়ের আর্ত হাহাকারে। বালি—রুক্ষ, শুষ্ক, তীক্ষ্ণ বালিতে মুখ রগড়ে রাজ্যেশ্বরেরও লোভনীয় সেই অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানা রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত ক'রে তুলল—

'শাহানশাহ্—জাহাঁপনা—মাপ করো আমাকে, মাপ করো। যেন আল্লার দরবারে পৌঁছে তোমাকে পাই আবার, যেন অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করবার অবসর পাই।'

বুক-ফাটা কান্না। নদীর ধার থেকে আসা বাতাসের হাহাকারের সঙ্গে মিশে সেই নিস্তব্ধ নির্জন রাত্রের অন্ধকারে সে কান্নার শব্দ বহুদূর পর্যন্ত প্রান্তরকে প্রতিধ্বনিত ক'রে তুলল। সে প্রতিধ্বনি ঘুরতে ঘুরতে লাল-কিলার পাষাণ-প্রাচীরে ঘা খেয়ে অদ্ভুত বিচিত্র আর এক শব্দের সৃষ্টি করতে লাগল। যেন কোন পিশাচ সেই রাত্রির বুক চিরে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করতে চাইছে—

তবল্‌চী তার বাঁয়াতবলার পুঁটলি নামিয়ে দ্রুত ছুটে এসে বালির ওপরই নর্তকীর পাশে বসে পড়ল। জোর ক'রে তার মুখটা তুলে নিল নিজের কোলের ওপর।

'মালেকা, মালেকা— এ কি ক'রছেন! এখনই সকলে জানতে পারবে যে। এতক্ষণের এত চেষ্টা সব ব্যর্থ ক'রে দেবেন? শান্ত হোন, চুপ করুন!'

অনেকক্ষণের অনেক চেষ্টায় নিজেকে সামলে নিলেন লালকুঁয়র। উঠে বসে মুখের ওপর থেকে বিস্রস্ত কেশভার সরিয়ে কেমন এক রকমের বিহ্বল কণ্ঠে বললেন, 'ঠিক বলেছ ফাতিমা। আর কাঁদব না। কাঁদলে সব ব্যর্থ হয়ে যাবে। আর কাঁদবার দরকারও নেই। আমার শাহানশাহের মৃত্যুর শোধ নিয়েছি আমি। ফররুখশিয়রের সিংহাসন টলিয়ে দিয়ে এসেছি। সৈয়দদের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে পারবে না ও— তা আমি জানি। কেউই পারবে না। মুঘল সিংহাসনকে জাহান্নমে পাঠাতেই এসেছে ওরা। ফাতিমা, আমি আজ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি ফররুখশিয়রের পরিণাম। কেউ বাদ যাবে না। খোদার বিচার নিক্তির তৌলে নামে। জুলফিকর খাঁ আসাদ খাঁ তাদের বিশ্বাসঘাতকতার দেনা শোধ দিয়েছে কড়ায় ক্রান্তিতে। ফররুখশিয়রও তার পাপের দেনা শোধ দেবে। ঐ ত্রিপোলিয়ার ফাটকে ঠিক ঐ রকম ভাবেই প্রাণ দেবে—অকারণ নৃশংসতা আর অপমানের দাম উশুল হবে। না, আর আমি কাঁদব না।'

ফাতিমার কাঁধে ভর দিয়েই উঠে দাঁড়ান লালকুঁয়র। কিন্তু যেতে গিয়েও কি মনে পড়ে যায় আবার।

খুঁজে খুঁজে কুড়িয়ে নিয়ে আসেন বাদশার দেওয়া মোতির মালা—আর কুড়িয়ে নিয়ে আসেন দুটো পাথর। তার পর পাথরের ওপর পাথর ঠুকে পাগলের মতো রেণু রেণু ক'রে গুঁড়িয়ে ফেলেন সেই বহুমূল্য মোতির মালা।

গুঁড়োনো শেষ হ'লে সেই চূর্ণ দু'হাতে মিশিয়ে দেন সেইখানকার বালির সঙ্গে। আর অস্ফুট-কণ্ঠে বিড় বিড় ক'রে বলেন, 'প্রসন্ন হও, প্রসন্ন হও শাহানশাহ্—তৃপ্ত হও!'

পুবের আকাশে তখন রক্তিমাভা জেগেছে, দূরে এরই মধ্যে দু-একজন স্নানার্থীকে দেখা যাচ্ছে যমুনার চড়া ভেঙে চলতে। অসহিষ্ণু ফাতিমা এক-রকম জোর ক'রেই টেনে তোলে ওঁকে।—'চলুন মালেকা। বেলা হয়ে যাচ্ছে!'

আবার বয়েল গাড়ি। ধীর মন্থর তন্দ্রাতুর গতি তার! তেমনি কষ্টকর। তেমনি বৈচিত্র্যহীন।

আবার সেই সোহাগপুরা সামনে। জীবন্ত-সমাহিত সেই জীবন। দশ টাকা মাসোহারা এবং দুজনের মতো আটা-ডাল-ঘি।

তা হোক। লালকুঁয়র এবার পরিতৃপ্ত। তিনি তাঁর মালিকের শেষকৃত্য ক'রে আসতে পেরেছেন। আর কোন ক্ষোভ নেই।

॥ চৌদ্দ

১১৩১ হিজিরা : ১০ই জমাদি-অল* দিল্লীর নাগরিক ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিন হয়ে থাকবে।

সকাল হওয়ার আগেই খবরটা ছড়িয়ে পড়েছে। তাদের বাদশা— দরাজ-দিল, মুক্তহস্ত, দয়ালু বাদশা—রূপ এবং স্বাস্থ্যের জন্য বিখ্যাত তৈমুর বংশের মধ্যেও সর্বাপেক্ষা রূপবান ও শক্তিমান ফররুখশিয়র আর ইহলোকে নেই। রক্তলোলুপ নরপিশাচরা তাঁকে শেষ পর্যন্ত হত্যাই করেছে।

খবরটা বাতাসে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গেই দিল্লীর নাগরিকরা পথে বেরিয়ে পড়েছে। সকলের মুখেই শোকের ছায়া; আত্মীয়বিয়োগের ব্যথা অনুভব করছে এরা। শাসন-ব্যাপারে তিনি যতই অপটু হোন, আকবর-আলমগীর

* ২৯শে এপ্রিল, ১৭১৯

বাদ্‌শার সিংহাসনে বসবার তিনি যতই অনুপযুক্ত হোন—দিল্লীর নাগরিকদের কাছে তিনি প্রায় আত্মীয়ের মতোই ছিলেন। সেই ফররুখশিয়র নিহত হয়েছেন, তাঁরই উজীর-অমাত্যদের আদেশে, নিজের শ্বশুরের চক্রান্তে। এর চেয়ে শোকাবহ ব্যাপার আর কি হ'তে পারে ?

অবশ্য এটা ঠিক যে, আজকের এ পরিণাম দু'মাস আগেই অদৃশ্য লিপিতে ভবিষ্যতের আকাশপটে লিখিত হয়ে গিয়েছিল—যেদিন সৈয়দদের পিশাচ অনুচররা হারেমের বিশ্রামকক্ষ থেকে টেনে বার ক'রে আবদুল্লা খাঁর আদেশে খাঁয়েরই সুর্মা-আঁকা-কাঠি দিয়ে তাঁকে অন্ধ করে এবং ত্রিপোলিয়া ফটকের অন্ধ কারাগৃহে পাঠিয়ে দেয়—সেই দিনই।

কিন্তু তবু কোথায় যেন একটা ক্ষীণ আশা ছিল।

বাদ্‌শা বেঁচে আছেন এখনও। চোখে কাঠি বিঁধিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও তিনি নাকি একেবারে অন্ধ হন নি। এমন কি তাঁকে বিষ দিয়েও নাকি মারা যায় নি।

অতএব যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ।

নিত্য নানা গুজবও শোনা যাচ্ছিল। ওধারে নাকি 'সওয়াই-রাজা' জয়সিংহ এসে পড়েছেন প্রায়—তাঁর সঙ্গে আছেন তায়বর খাঁ আর রুহুল্লা খাঁ।—দুজন দুর্ধর্ষ সেনাপতি। এদের মিলিত বাহিনীর সামনে নাকি উড়ে চলে যাবে সৈয়দদের সম্মিলিত শক্তি। প্রায়শ্চিত্তের আর বেশী দেরি নেই ওদের।

আবার এ-ও শোনা যাচ্ছিল যে সৈয়দরাও না কি ওঁদের কৃতকর্মের জন্যে অনুতপ্ত হয়েছেন। আবদুল্লা ও হুসেন—এঁরা দুজনেই নাকি সে অনুতাপকে কার্যকরী করতে দৃঢ়-সংকল্প—তাঁরা নতুন রুগ্ন বাদ্‌শাকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে আবার ফররুখশিয়রকেই সেখানে স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত করবেন—তারপর দু ভাই ফকীর হয়ে বেরিয়ে যাবেন মক্কায়।

এমনি অসংখ্য গুজব। নিজেদের ইচ্ছা-কল্পনায় মেশা দিবাস্বপ্ন সব।

সে গুজব সৈয়দদের কানেও উঠেছিল বৈ কি !

আর তাঁরা যদি সে গুজবে শঙ্কিত হয়ে থাকেন তো, তাঁদের খুব দোষ দেওয়া যায় না। ফররুখশিয়ার উদার, মুক্তহস্ত, রূপবান—কিন্তু অকৃতজ্ঞ। সৈয়দদের-শৌর্যে-কেনা সিংহাসনে বসার পর তাঁদের প্রতি ঈর্ষাই তাঁর বাদ্‌শাহীকে কণ্টকিত ও বিষাক্ত ক'রে তুলেছিল। আর সেই ঈর্ষায় ষড়যন্ত্রের পর ষড়যন্ত্র করেছিলেন তিনি, সে কণ্টক দূর করতে। কিন্তু পারেন নি, কারণ তৈমুরশাহী বংশের সাহস, বুদ্ধি ও দূরদৃষ্টি,—যা তাঁর পূর্বপুরুষদের একেশ্বর নিঃশত্রু করেছিল, তার কোনটাই ছিল না তাঁর। নির্বোধ, দুর্বল ও দ্বিধাগ্রস্ত : কিন্তু তবু জন-

সাধারণের প্রিয়। যদি এই গুজবে দিল্লীর জনসাধারণ উত্তেজিত হয়—অথবা অপর কোন আমীর কি সেনানায়কের পুরাতন প্রভুভক্তি জাগ্রত হয় তো ফররুখশিয়রের আবার তখ্‌ৎ-এ তাউসে বসতে খুব বিলম্ব হবে না।

আর সেক্ষেত্রে—আর যার বা যাদেরই অব্যাহতি থাক—সৈয়দদের নেই। নিষ্ঠুর ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ নেমে আসবে— অব্যর্থ, অব্যাহত গতিতে, শুধু ঐ দু'জনের ওপর নয়, ওঁদের সমস্ত বংশের ওপর।

সুতরাং—

সে সম্ভাবনার মূলোৎপাটন করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

সৈয়দরাও তাই করেছেন।

কিন্তু দিল্লীর জনসাধারণ এত জানে না। তারা জানে তাদের প্রিয় বাদ্‌শাকে।

সেই বাদ্‌শা নিহত হয়েছেন কাল। তাঁর বিকৃত ক্ষতবিক্ষত শব একটা চাটাইয়ের ওপর ফেলে রাখা হয়েছিল ত্রিপোলিয়া ফটকের সামনে। আজ তাঁকে সমাধি দিতে নিয়ে যাওয়া হবে হুমায়ুঁ বাদ্‌শার সমাধি ক্ষেত্রে। যেখানে মাত্র সাত বছর আগে ওঁর পিতা আজিম-উশ-শানের দেহ সাময়িকভাবে সমাহিত করা হয়েছিল—মৃত্তিকার সেই বিশেষ ক্রোড়েই চির-বিশ্রাম নেবেন উনি।

ভোর থেকে দলে দলে লোক জমছে রাস্তায়। সকলেরই মুখ শুষ্ক, চোখ অশ্রুসজল। চাপা গলায় কথা বলছে সবাই। ধিক্কার দিচ্ছে নিজেদের অসহায়তাকে, অভিসম্পাত দিচ্ছে সৈয়দদের আর বাদ্‌শার শ্বশুর মহারাজা অজিত সিং রাঠোরকে।

ভিড়টা ফৈজ-বাজার এলাকাতেই বেশী। লালকিল্লার দিল্লী ফটক দিয়েই বেরোবে '<u>জানাজা</u>' বা শবযাত্রা। এই পথ। এইখানকার আকবরাবাদী মসজিদ—যেখানে বিজয়ী ফররুখশিয়রের আদেশে একদা ঘণ্টার পর ঘণ্টা হৃতসর্বস্ব বৃদ্ধ আসাদ খাঁকে বসে থাকতে হয়েছিল পথের ধুলোর ওপর—এইখানেই নাকি শেষ-কৃত্য সমাধা করা হবে, তারপর সে শব যাবে হুমায়ুঁ বাদ্‌শার সমাধিক্ষেত্রে।···

যথাসময়ে সে শবযাত্রা এসে পৌঁছল। শেষ-যাত্রার নমাজ পড়া হ'ল আকবরাবাদী মসজিদে। তারপর চলে গেল তা নগরের সীমানা ছাড়িয়ে—দূর পল্লীপ্রান্তে। কিন্তু ভিড় কোথাও কম নেই। এমন ভিড় যে বাদ্‌শাহী ফৌজেও পথ করতে পারে না কাফন নিয়ে যাবার। পথের দুধারে নিরন্ধ্র

জনতা। দুপাশের বাড়ি ও ছাদ লোকে পরিপূর্ণ। আর সেই বিপুল জনতা থেকে—নরনারী-বাল-বৃদ্ধ-শিশু নির্বিশেষে—অবিরত ধিক্কার উঠছে। সে ধিক্কারের সামনে সৈয়দদের কর্মচারীরা বিব্রত, নত-মস্তক। তারা যেন কোন-মতে পালাতে পারলে বাঁচে। দু-চারটে ইট-পাটকেলও এসে পড়ছিল মধ্যে মধ্যে। কিন্তু সে ধৃষ্টতার জবাব দেবার দুঃসাহস শাহী ফৌজের নেই। হোক তারা অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত, আর হোক এরা নিরস্ত্র। লক্ষ লোকের সামনে ক-টা অস্ত্রের মূল্য কি?···

হ্যাঁ! বাদশাহী শবযাত্রার যোগ্য আয়োজনও কিছু কিছু ছিল বৈকি! তাতে কোন ত্রুটি হয় নি। ছিল সঙ্গে সঙ্গে উটের পিঠে রুটির বস্তা, মিঠাই এবং তাম্র-মুদ্রার বড় ধামা। কিন্তু রুটির বস্তা তেমুনিই পূর্ণ রইল, মিঠাই কেউ স্পর্শও করলে না। পয়সা কিছু কিছু ছড়ানো হ'ল বটে—তবে তা তেমনি অনাদৃত ধুলোতেই পড়ে রইল—কেউ তার একটাও তুলে নিলে না।

না, ভিখারীর অভাব ছিল না। সেই বিপুল জনতার মধ্যে বহু সহস্র ভিক্ষুক ও দরিদ্র ছিল—কিন্তু তারা কেউ তাদের প্রিয় বাদশা ফররুখশিয়রের রক্তের মূল্যে ঐ দান গ্রহণ করতে রাজী হ'ল না। শুধু সেদিন নয়—তার পর বহুদিন পর্যন্ত, ফররুখশিয়রের মৃত্যুর সঙ্গে যারা সংশ্লিষ্ট ছিল এমন কোন রাজপুরুষের কোন দান কেউ গ্রহণ করে নি।

আশ্চর্য—সেদিন আকবরাবাদী মসজিদের সেই দুঃসহ ভিড়ের মধ্যে কালো বোরখা-মুড়ি দেওয়া একটি রমণী-মূর্তিও এসে দাঁড়িয়েছিল পথের পাশে। চারিদিকের ঠেলাঠেলি পেষাপিষির মধ্যেও এতটুকু সঙ্কুচিত হয় নি সে নারী, সরে পিছনে যায় নি। বরং সাগ্রহে সবাইকে ঠেলে সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। তার সে আচরণে বিস্মিত হয়েছিল চারিদিকের পুরুষরা—কিন্তু তখন তাকে নিয়ে মাথা ঘামাবার কারুর সময় ছিল না।

আরও আশ্চর্য, শবযাত্রা দৃষ্টিগোচর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জনতার বুক ফেটে যে হাহাকার উঠেছিল, তা এতটুকু প্রতিধ্বনি জাগায় নি এই রমণীর বুকে। কান্নার শব্দ তো পাওয়া যায়ই নি—বোরখার মধ্যে দৃষ্টি পৌঁছলে দেখা যেত যে তার দু চোখই আছে শুষ্ক, মুখের ভাব প্রশান্ত, নির্বিকার! বরং—বরং আরও লক্ষ্য করলে দেখা যেত যে একটা প্রচ্ছন্ন আত্মতৃপ্তির প্রসন্নতাই ফুটে উঠেছে সে মুখে।

বহু দূর থেকে এসেছে এই নারী।

এক যাযাবর বেদেনীর মুখে, ফররুখশিয়রের প্রাণ নেওয়ার পরামর্শ চলেছে, এই খবর পেয়েই চলে এসেছে। একদিন আগেই পৌঁচেছে, একদিন আগে থেকেই বসে আছে এই মসজিদের পাশে, অনাহারে, অনিদ্রায়। তা হোক, তাতে দুঃখ নেই তার। বরং তার সমস্ত দুঃখের অবসান হয়েছে। এখন আর বাঁচা না বাঁচা দুই-ই তার কাছে সমান।···

শবযাত্রা চলে গেল দূরে, তার লক্ষ্যপথে। সেই সঙ্গে অনুগমনকারী বিপুল জনতাও আকাশের বহু ঊর্ধ্ব পর্যন্ত ধূলির মেঘ সৃষ্টি ক'রে একসময় চোখের আড়াল হয়ে গেল। মিলিয়ে গেল দূর থেকে দূরান্তরে সেই বহু সহস্র বুক-ফাটা হাহাকার এবং স্বতঃ-উৎসারিত রোদনের ধ্বনি।

কিন্তু সেই রমণী তেমনিই দাঁড়িয়ে রইল সেখানে, বৈশাখ মধ্যাহ্নের খররৌদ্র মাথায় ক'রে। আর কৌতূহল নেই তার, নেই কোন ঔৎসুক্য। তৃপ্ত হয়েছে সে। মিটেছে তার তৃষ্ণা। কিন্তু সেই সঙ্গে বুঝি হারিয়ে গেছে তার জীবনের সহজ অনুভূতিগুলোও।

এখানে এসে অনেক সংবাদই সংগ্রহ করেছে সে রমণী।

যে ঘরে জাহান্দার শা ছিলেন—সেই গহ্বরেই রাখা হয়েছিল ফররুখশিয়রকে। কিন্তু ঢের—ঢের বেশী লাঞ্ছনার মধ্যে। অখাদ্য খেয়ে উদরাময় হয়েছে—জল পান নি একটু শৌচ করবার। অতিরিক্ত লবণাক্ত খাদ্য দেওয়া হয়েছে, দেওয়া হয়েছে বিষতিক্ত খাদ্য। তবু মরেন নি—কিন্তু মৃতের অধিক মৃত অবস্থায় ছিলেন তিনি। সান্ত্বনার মধ্যে ছিল মনে মনে কোরান-আবৃত্তি কিন্তু অশুচি অবস্থায় তাও নিষিদ্ধ বলে সেটুকুও শেষের দিকে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। জামা নেই, জুতো নেই, শয্যা নেই, আলো নেই—অন্ধ পাষাণ-কারায় এইভাবে দিন কাটিয়েছেন শাহানশা।

তবু মরেন নি ফররুখশিয়র।

অবশেষে গতকাল রাত্রে ঘাতক পাঠানো হয়েছিল। শ্বাসরোধ ক'রে মারা হয়েছে তাঁকে। গলায় দড়ির পাক দিয়ে দিয়ে। প্রাণপণে তবু শেষ অবধি বাঁচবার চেষ্টা করেছেন—চেষ্টা করেছেন এ অপমান এড়িয়ে পাষাণ-প্রাচীরে মাথা ঠুকে মরতে—কিন্তু কিছুই হয় নি।···শ্বাসরোধ হয়ে মরবার পরও তাঁর মৃত দেহটা অব্যাহতি পায় নি, অসংখ্য অস্ত্রাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত বিকৃত করা হয়েছে—রূপবান ও স্বাস্থ্যবান ফররুখশিয়রের দেহ!

'জাহান্দার শা, জাহান্দার শা—তুমি কি তৃপ্ত হয়েছ? শান্ত হয়েছে তোমার আত্মা?'

বার-বার অস্ফুট কণ্ঠে প্রশ্ন করে সেই অবগুণ্ঠিতা নারী।

কিন্তু না ভেতরে আর না বাইরে—বুঝি জবাব মেলে না।

তারপর বহুদূর পথের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে একসময় শিউরে ওঠে সে। সাগ্রহে বলে, 'কিন্তু তবু তোমার মুখ ম্লান কেন বাদ্‌শা, তুমি কি এ চাও নি? বলো, বলো। চুপ ক'রে থেকো না!'

'বেগমসাহেবা?'

চমকে ফিরে চান লালকুঁয়র। বেদেনী কখন নিঃশব্দে এসে পাশে দাঁড়িয়েছে।

'সোহাগপুরায় ফিরবে না? যাবে না এখান থেকে?···তোমার নতুন সঙ্গিনী যাচ্ছে যে একজন!' হাসে বেদেনী। অদ্ভুত বিচিত্র আনন্দ তার সে হাসিতে।

বিষাক্ত? তির্যক? হিংস্র? না—কিছুই না। বিচিত্র শুধু।

'কে রে? কে যাচ্ছে?'

'নূরমহল বেগম সাহেবা।' আবারও হাসে বেদেনী।

'হাঁ, হাঁ। যাবো। এখনই যাবো। সে কি বেরিয়েছে?'

'সন্ধ্যায় রওনা হবে—রোদ একটু পড়লে।'

দিল্লী দরওয়াজা দিয়েই 'বহল'খানা বেরোয়—নূরমহল বেগম সাহেবার। পর্দা-দিয়ে-ঘেরা গাড়িখানা দিল্লী শহরের রাজপথ ছেড়ে এক সময় শহরের উপান্তেও পৌছয়।

কোন তফাৎ নেই লালকুঁয়রের যাত্রার সঙ্গে। তেমনিই দুজন সশস্ত্র রক্ষী সঙ্গে. হয়তো নূরমহল বেগমের সঙ্গে কিছু মণিমাণিক্য বেশী আছে—হয়তো তাও নেই। সবই এক।

শহরের ফটক পার হয়ে গাড়ি দাঁড়ায় একবার। অতিরিক্ত কান্নার ফলে বেগম সাহেবার গলা শুকিয়ে গেছে, জল চাই একটু। রক্ষীদের একজন যায় জলের খোঁজে।

'মালেকান।' বোরখায় মুখ ঢাকা এক রমণীমূর্তি গাড়ির কাছে এসে দাঁড়ায়।

'কে?' চমকে প্রশ্ন করে নূরমহল।

'আমি আপনার বাঁদী।' বোরখা খুলে অভিবাদন ক'রে দাঁড়ান লালকুঁয়র। দুই রূপসী নারী দুজনের মুখের দিকে চেয়ে স্তব্ধ হয়ে থাকে।

'কে কে তু—আপনি ?' আবারও বিহ্বল ভগ্নকণ্ঠে প্রশ্ন করে নূরমহল।

'আমি আপনার বাঁদী। আমিও সোহাগপুরায় থাকি—এ বাঁদীর নাম লালকুঁয়র!'

'ইমতিয়াজ-মহল ?' সব ভুলে প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে নূরমহল।

লালকুঁয়র এসে ওর হাত দুটো চেপে ধরেন। মিনতির স্বরে বলেন, 'সে অভাগী মরে গিয়েছে। আমি সত্যিই বাঁদী। একদিন বিদ্বেষে ও ঈর্ষায় অন্ধ হয়ে তোমার অনিষ্ট কামনা করেছিলাম—প্রত্যক্ষে না হ'লেও পরোক্ষে। প্রতিহিংসায় অন্ধ হয়ে চেয়েছিলাম ফররুখশিয়রের সর্বনাশ। আজ আমার ভুল ভেঙেছে।...প্রতিহিংসায় মানুষের নিজের অনিষ্টের প্রতিকার হয় না, শুধু পাপ বাড়ে। এক প্রতিহিংসা সহস্র প্রতিহিংসার পথ খুলে দেয়। পাপ পাপকে ডেকে আনে—হিংসায় হিংসার বৃদ্ধি হয়। আজ সহস্র লোকের অশ্রুতে ফররুখশিয়রের কলঙ্ক ধুয়ে গিয়েছে—কিন্তু আমার কলঙ্ক বুঝি রয়েই গেল। তাই, তাই আজ চাইছি তোমার সেবার অধিকার! বড় কষ্ট সেখানে, যদি নিজের প্রাণপণ চেষ্টায় তোমার সেই কষ্ট কিছু লাঘব করতে পারি, তা'হলেই বোধ হয় আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে!'

কান্নায় ভেঙে আসে ওঁর কণ্ঠ।

গাড়ি থেকে নেমে এসে লালকুঁয়রের বুকে মুখ রেখে আবারও হু-হু ক'রে কেঁদে ওঠে নূরমহল!

বহু রাত্রে দূর থেকে আজও একটি আলো দেখা যায়। আজ আর কোন প্রশ্ন করেন না লালকুঁয়র, জানতে চান না স্থানটার নাম। শুধু আঙুল দিয়ে আলোটা দেখান নূরমহলকে, বলেন, 'ঐ যে আলো দেখছ—একটি দম্পতি বসে ওখানে এতরাতেও দশ-পঁচিশ খেলছে। ওরা দুজন দুজনকে শুধু ভালবেসেই সুখী। কে রাজা হ'ল আর কে বাদশা হ'ল, সে খবর ওরা রাখে না—পরোয়াও করে না। ওদের ঐ বাড়িতে আমি গেছি—ঐ ভাঙা কুটিরটিই পৃথিবীর মধ্যে আসল সোহাগপুরা—ওদের জীবনে প্রত্যেকটি রাতই সোহাগরাত!* যাবে, যাবে বেটি ওদের দেখতে?'

নূরমহল ঝাপ্সা বিহ্বল দৃষ্টি মেলে তাকায় একবার, তারপর প্রবল ভাবে ঘাড় নাড়ে। বলে, 'না চাচীজি, আমাদের চারিদিকে বিষ আছে, পাপ আছে। আছে অভিশাপ। আমরা গেলে ওদের সোহাগপুরাতেও হয়তো আগুন লাগবে—দরকার নেই!'

লালকুঁয়র স্তব্ধ হয়ে যান। একদৃষ্টে চেয়ে থাকেন সেই আলোটার দিকে। তারপর চারিদিকের গাঢ় অন্ধকারে একসময় সে আলোটাও মিলিয়ে যায়।

* ফুলশয্যা'র রাত

পরিচায়িকা

মুইজ-উদ্দীন ঃ মুঘল বাদ্‌শা ঔরংজেব বা প্রথম আলমগীরের পৌত্র, প্রথম বাহাদুর শা'র জ্যেষ্ঠপুত্র। পরে জাহান্দার শা নামে সিংহাসনে আরোহণ করেন।

মির্জা মহম্মদ করিম ঃ বাহাদুর শার মধ্যম পুত্র আজিম-উশ-শানের জ্যেষ্ঠ পুত্র; জাহান্দার শার ভ্রাতুষ্পুত্র। কথিত আছে সত্য-সত্যই নাকি ইনি যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলাইতে গিয়া পথ খুঁজিয়া পান নাই। নিজের তাঁবুর চারিপাশেই সারারাত ঘুরিয়াছিলেন।

ফররুখশিয়ার ঃ আজিম-উশ-শানের মধ্যম পুত্র।

আসাদ খাঁ ঃ তরুণ বয়সে ঔরংজেবের সংস্পর্শে আসেন ও তাঁহার আস্থাভাজন হন। কার্যত স্বল্পকালমধ্যে ইনিই প্রধান উজীর হইয়া ওঠেন—যদিচ অপর সম্ভ্রান্ত-বংশীয় ওমরাহ্‌গণের বিরাগ সৃষ্টির ভয়ে ঔরংজেব দীর্ঘকাল ইঁহাকে নামে প্রধান উজীর করিতে পারেন নাই।

জুলফিকর খাঁ ঃ আসাদ খাঁর পুত্র। সেনাপতি হিসাবে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। আজিম-উশ-শান বাহাদুর শার প্রিয়পাত্র ও বিশ্বাসভাজন ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনিই বাদ্‌শা হইবেন ইহাই কতকটা স্বতঃসিদ্ধ ছিল। মুইজ-উদ্দীন মধ্যম ভ্রাতার হাতে নিহত হইবার ভয়ে পিতার মৃত্যুর পর যখন পলায়ন করেন তখন তাঁহার সঙ্গে সামান্য কয়েকজন মাত্র অনুচর ছিল। অন্য সমস্ত ওমরাহ্‌ই আজিম-উশ-শানকে অভিবাদন জানাইতে যান—সে সময় জুলফিকরও আনুগত্য জানাইয়া একটা চিঠি লেখেন। আজিম-উশ-শানের জনৈক কেরানী সেই চিঠির উত্তরে অত্যন্ত ঔদ্ধত্যপূর্ণ এক পত্র দেন। তাহাতেই মর্মাহত হইয়া জুলফিকর সসৈন্যে জাহান্দারের সঙ্গে যোগ দেন। জুলফিকরের তখন এত খ্যাতি যে তিনি যোগ দিয়াছেন জানিয়া আরও বহু ওমরাহ্‌ সেই পক্ষে যোগ দিয়াছিলেন। জুলফিকরের পরামর্শে ও তাঁহারই

মধ্যস্থতায় মুইজ-উদ্দীন অপর দুই ভ্রাতাকে স্ব-দলে আনয়ন করেন। আগ্রার যুদ্ধে (১০ই জানুয়ারী, ১৭১৩ খৃঃ) জাহান্দার শার হস্তী আহত হইলে তিনি যখন ঘোড়ায় চাপিয়া পুনরায় যুদ্ধযাত্রা করিবেন, তখন লালকুঁয়র তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করেন এবং জোর করিয়া তাঁহাকে লইয়া পলাইয়া যান। জুলফিকর তাঁহাকে খুঁজিবার অনেক চেষ্টা করেন, সে সময়ে বাদ্‌শাকে পাইলে হয়তো তখনও যুদ্ধে জয়লাভ করা সম্ভব হইত।

সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ঃ সৈয়দ আব্‌দুল্লা খাঁ ও সৈয়দ হুসেন খাঁ। ইহারা বংশানুক্রমিক যুদ্ধ-ব্যবসায়ী। ঔরংজেবের মৃত্যুর পর বাহাদুর শার পক্ষে যুদ্ধ করিয়া যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করেন। কিন্তু বাহাদুর শা ইহাদের সহিত সদ্ব্যবহার করেন নাই। জাহান্দারের সিংহাসন আরোহণের সময় আবদুল্লা এলাহাবাদের শাসনকর্তা ও হুসেন পাটনার সহকারী শাসনকর্তা ছিলেন। জাহান্দারের দুর্ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া ইহারা ফররুখশিয়ারের সহিত যোগ দেন—এবং প্রধানত ইহাদের সাহায্যেই ফররুখশিয়ার সিংহাসন লাভ করেন। তাহার পর ইহারাই সর্বময় কর্তা হইয়া ওঠেন। ফররুখশিয়ার সহসা ইহাদের উপর সন্দিগ্ধ ও বিদ্বিষ্ট হইয়া ওঠেন ও অত্যন্ত অকৃতজ্ঞ আচরণ করিতে থাকেন। শেষে বিরক্ত হইয়া ইহারা ফররুখশিয়ারকে সিংহাসন হইতে অপসারিত করেন। প্রথমে তাঁহাকে অন্ধ করিয়া পরে জাহান্দার শার অনুরূপ অবস্থাতেই বধ করা হয়। তাহার পরও ইহারা ইচ্ছামতো পর পর কয়েকজনকে বাদ্‌শা করেন; কিন্তু সে নামেমাত্র, আসলে ইহাদেরই কর্তৃত্ব অটুট থাকে। মহম্মদ শার রাজত্বকালে ইহারা প্রধানত নিজাম-উল-মুলুকের ষড়যন্ত্রে নিহত হন।

লালকুঁয়রঃ নর্তকী! জাহান্দার শা ইহার রূপমুগ্ধ হন এবং একান্তভাবে বশীভূত হইয়া পড়েন। আদর করিয়া 'ইমতিয়াজ-মহল' উপাধি দেন। ইনি নাকি সঙ্গীত-সাধক তানসেনের বংশোদ্ভূতা। জাহান্দার বাদ্‌শা হওয়ার পর লালকুঁয়র যথেচ্ছাচার করিতে থাকেন। নূরজাহার মতো নিজের নামে নাকি মুদ্রাও ঢালাই করাইয়াছিলেন। ইহার ভাই ভগ্নিপতি তো বটেই, পূর্বপরিচিত বাজনদার, এমন কি সামান্য সব্‌জীওয়ালীকেও জায়গীর, খেতাব ও খিলাৎ বিতরণ করিয়াছিলেন। সামান্য পথের নর্তক ও বাজনদাররা নিমন্ত্রিত হইয়া বাদ্‌শার সহিত মদ্যপান করিত—সময়ে সময়ে পানোন্মত্ত অবস্থায়

বাদ্‌শাকেও যথেষ্ট লাঞ্ছনা করিত, প্রহারও করিত। লালকুঁয়রের বিরাগ-ভাজন হইবার ভয়ে তিনি প্রতিবাদ মাত্র করিতেন না।···জাহান্দার জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ইহার প্রেমে মুগ্ধ ছিলেন

সোহাগপুরা ঃ 'বেওয়া-মহল'। মৃত বাদ্‌শাদের অসংখ্য পত্নী ও উপপত্নীদের জন্য নির্মিত একটি মহল। Irvine-এর Later Mughals-এ আছে—Suhagpura (Hamlet of Happy wives) or the Bewa-khana (Widow-house) was one of the establishments (karkhana-jat) attached to the Court, "where in the practice of resignation they pass their lives receiving rations and a monthly allowance" (Dastur-ul-aml)। ইহার অবস্থান পরিষ্কার জানা যায় না। এ বিষয়ে আচার্য যদুনাথ সরকার মহাশয়কে পত্র লিখিলে তিনি জানান,—"সোহাগপুরা—যতদূর বুঝা যায়, কয়েকটি ঘর, বাহিরে প্রাচীর দিয়া ঘিরিয়া, ছোট একটি স্বতন্ত্র অন্তঃপুর গঠিত করা হয়। বাদ্‌শাহী প্রাসাদের অঙ্গ। আগ্রাতেও সোহাগপুরা ছিল, এরূপ মনুচী লিখিয়াছেন (যদি দিল্লী বলিতে ভুল করিয়া না থাকেন)। দিল্লীর লালকিলায় একটি অংশে (নাম 'সালাতীন') বন্দী রাজকুমারগণ থাকিতেন অত্যন্ত দুর্দশায়। এটা যমুনা-তীরের দেওয়ালের ভিতর। ২য় শাহ্ আলমের সময় দুবার ঐ স্থান হইতে কুমাররা পালায়। ব্রিটিশ সৈন্য মিউটিনির পর দিল্লী দুর্গে বসতি করে এবং ঐসব 'সালাতীন' জীর্ণ ঘরগুলি ভাঙ্গিয়া দিয়া, পরিষ্কার খোলা জায়গা ও ব্যারাক প্রস্তুত করে।···লালকিলার অনেক দক্ষিণে যমুনার পশ্চিম তীরে খওয়াসপুরা নামক এক মহল্লা ছিল, সেটাকে সোহাগপুরা ভাবিবার কোন কারণ নাই—যদিও দাসদাসীরা সেখানে বাস করিত। (when off-duty or retired on account of age)।" বর্তমান গ্রন্থে সোহাগপুরাকে লালকিলা ও দিল্লী হইতে কিছু দূরে একটি স্বতন্ত্র উপনিবেশ কল্পনা করা হইয়াছে।

সুপ্তিসাগর

উৎসর্গ

শ্রীগিরীন্দ্র সিংহ

কল্যাণীয়বরেষু

কেউ জানত না, তার কারণ ও-পথে এতকাল কেউ যায় নি। সহজে কেউ যায়ও না। সহজে যাবার মতো পথ নয় ওটা। সমুদ্রগর্ভ থেকে সতেরো হাজার ফুট উঁচুতে চির-তুষারে ঢাকা উত্তুঙ্গ গিরিশিখর—তার কোণে কোণে বাঁকে বাঁকে আছে মৃত্যু, আছে সর্বনাশ আত্মগোপন ক'রে। কোন্‌টা পথ আর কোন্‌টা বিপথ—হঠাৎ দেখে কেউ বুঝতে পারে না। পথ পাহাড় আর তার পাশে পাশেই অতলস্পর্শী খদ—সবই সেখানে তুষারের চাদরে ঢাকা। হাতী-ধরা খেদার মতো অনেক জায়গায় সেই সীমাহীন সুগভীর খদ বরফ দিয়ে ঢেকে রেখেছে প্রকৃতি—পথিক বুঝতে পারে না প্রায়ই, কোনখানটায় আছে কঠিন ভারবহ বিশ্বস্ত শিলাখণ্ড, আর কোনখানটায় আছে বিরাট অসীম অন্ধ শূন্যতা। পা দিলে পায়ের চাপে বরফ ভেঙে তলিয়ে যায়,—অথবা গড়িয়ে যায় মানুষটাকে নিয়ে কোথায় কোন্ অজানা আঁধারে—মৃত্যুতে। এ ছাড়া আছে তীক্ষ্ণ হিমবায়ু, তুষারঝটিকা। আছে হিমানী সম্প্রপাত। কখন কোন্ মুহূর্তে সামান্য বাতাসে অথবা সামান্যতর শব্দে কয়েকশত মণ তুষার নেমে আসবে অসতর্ক, অচেতন, অসহায় পথিকের মাথায় —তা কেউ জানে না।

না, ও পথ নিরাপদ নয় আদৌ, সহজগম্য তো নয়ই।

তাই এতকাল, হয়ত কয়েক শতাব্দী কারও চোখে পড়ে নি। ঐ অদ্ভুত ভয়াবহ দৃশ্য—অগণিত মানুষের, দুঃসাহসিক কিংবা ভাগ্যতাড়িত পর্বতযাত্রীর কঙ্কাল।

একদা যারা আমাদেরই মতো হাসত কাঁদত, আমাদেরই মতো ঈর্ষা-দ্বেষ, স্নেহ-প্রেম, সঙ্কীর্ণতা-উদারতায় গড়া মানুষ ছিল—এমনই কতকগুলি নরনারীর ইহজীবনের শেষ চিহ্ন—অস্থি-অবশেষ।

আমি বলছি রূপকুণ্ডের কথা।

হিমালয়ের বুকে মাথা-উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে থাকা দুর্গম দুরারোহ পর্বতচূড়া ত্রিশূল, তারই এক প্রান্তে চিরতুষারে ঘেরা স্বচ্ছ সরোবর একটু—রূপকুণ্ড।

সেই রূপকুণ্ডের পথে একদিন হঠাৎ আবিষ্কৃত হ'ল বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রব্যাপী অগণিত নর-কঙ্কাল। একজন নয় দুজন নয়—একশো আধশো নয়—অগণিত মানুষের অস্থি। সার সার পড়ে আছে সেই অস্থিগুলি—নিঃশব্দে, অসীম কৌতূহল এবং অনন্ত বিস্ময় জাগিয়ে।

বিস্ময় আর তার সঙ্গে অসংখ্য প্রশ্ন : কে এরা ? এ পথে কেন এল ? ক'জন এসেছিল ? কেন মারা গেল ? কি হয়েছিল এদের ? রোগ, না আর কিছু ? শত্রুর আক্রমণ ? আত্মকলহ ? না কি হিমানী-সম্প্রপাত ? কিংবা খাদ্যাভাব ?

এমনি অগণিত প্রশ্নের সামনে নিঃশব্দ কৌতুকে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে চিরতুষারে ঢাকা ত্রিশূল পর্বত, স্বচ্ছ ক্ষুর-পরশা রূপকুণ্ড, আর আছে ঐ কঙ্কালগুলো।

ওরাই বলতে পারে কি এর উত্তর—কী ঘটেছিল, কেন ঘটেছিল আর কতদিন আগে ঘটেছিল—এরাই জানে, সাক্ষী আছে সেদিনকার।

অবশ্য মানুষও চেষ্টা করেছে বৈকি। ছুটে গেছেন নৃতত্ত্ববিদ বৈজ্ঞানিকরা, ছুটে গেছেন ঐতিহাসিকরা, ছুটে গেছেন রাজনৈতিকের দলও। একটি বিখ্যাত ইংরেজী দৈনিক সংবাদপত্র থেকেও একদল লোক গিয়েছিলেন।

কত কী বললেন তাঁরা। একদল লোক বললেন যে, কাশ্মীরের সেনাপতি এক জোরাওয়ার সিং একদল লোক নিয়ে এই পথেই গিয়েছিলেন তিব্বত দখল করতে, মাত্র শ'খানেক বছর আগে—আর তাঁদের খোঁজ পাওয়া যায় নি। এ নিশ্চয় সেই বাহিনীরই শেষ চিহ্ন। হয়ত হিমানী সম্প্রপাতে চাপা পড়ে কিংবা খাদ্যের অভাবে কিংবা কোন মারাত্মক মহামারীতে মারা গিয়েছিল সেদিনকার সেই দুঃসাহসী বীর সৈনিকেরা।

কিন্তু বাঙালী নৃতত্ত্ববিদ্ মজুমদার মশাই প্রমাণ ক'রে দিলেন যে, তা সম্ভব নয়। কারণ, এর মধ্যে প্রচুর স্ত্রীলোকের অস্থি আছে। আর অস্থিগুলি এত অল্পদিনেরও নয়। অন্তত ছ-সাতশো বছর আগেকার এরা। হয়ত আরও বেশী।

কেউ কেউ এমনও বলেছেন যে, আগে এইখান দিয়ে নন্দাদেবীর বিখ্যাত মঠ পরিক্রমা ক'রে তিব্বতে যাবার এক গিরিবর্ত্ম ছিল—কোন এক দুর্ঘটনায় তা নষ্ট হয়ে যায়। আর সেই দুর্ঘটনারই ফলে এই ব্যাপক ও বহুবিস্তৃত মৃত্যু ঘটে।

কিন্তু সেটাও বিশ্বাসযোগ্য নয়, বলেছেন ভূতত্ত্ববিদ্ বৈজ্ঞানিকরা।

তবে ?

তবে কেন এই বিপুল একদল যাত্রী এই দুর্গম দুরূহ পথে এসেছিল—মৃত্যুকে একরকম অবধারিত জেনেও ?

কে এরা ? কেন এসেছিল ? কী হয়েছিল এদের ?

সেই অসংখ্য উত্তরহীন প্রশ্ন আর নিরুত্তর সেই তুষার, সেই কুণ্ড ও সেই অগণিত অস্থি! আজও এসব প্রশ্নের উত্তর মেলে নি, হয়ত কোনদিনই মিলবে না। হয়ত চিরকাল ধরে বিস্মিত কৌতূহলী মানবের এই প্রশ্ন নিরুত্তর সেই তুষার, হিমশীতল রূপকুণ্ডের জল এবং প্রায়-শিলীভূত ঐ অস্থিতে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে ফিরে আসবে তাদের কাছেই।

॥ দুই ॥

কিন্তু তাই বলে আমরা কি এমনি ক'রেই হার মানব?

ইতিহাস তো অনেক ক্ষেত্রেই কিছু তথ্য এবং কিছুটা—অনেক সময় বেশির ভাগই—কল্পনায় মিলে রচিত হয়। তথ্যের মাঝখানকার বিরাট বিরাট ফাঁক ভরাট করতে হয় অনুমান দিয়েই। এক্ষেত্রে তথ্য যখন একেবারেই অনুপস্থিত, তখন অনুমান বা কল্পনার রাশ ছেড়ে দিতে আপত্তি কি?

আমরা কল্পনা ক'রে নিই না—কী ঘটেছিল, কেন ঘটেছিল। কারা এরা—কী এদের পরিচয়।

আর আমরা কল্পনায় যা দেখছি তা যে সত্য নয়, তাই বা কে বলবে?···

ধরুন এখন থেকে প্রায় আটশো বছর আগেকার কথা। খ্রীষ্টিয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষের দিক সেটা।

ভারতে তখনও তেমন কোন স্থায়ী মুসলমান সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে নি—শুধু দুর্বার সমুদ্রের ঝড়ের মতো বার বার মধ্য এশিয়া থেকে দুর্দান্ত দস্যুর দল এসে তার বহুদিনের বহু শতাব্দীর সঞ্চিত ঐশ্বর্যরাশি লুটে নিয়ে গেছে, তার দেবমন্দির নষ্ট করেছে, তার জনপদ ধ্বংস করেছে এবং আসা-যাওয়ার পথে মহা-শ্মশান সৃষ্টি করেছে।

অর্থাৎ, তাকে ক্ষতবিক্ষত ও নিঃস্ব করেছে।

প্রথম যিনি এই কাজ করতে আসেন এবং বেশ কয়েকবার ধরেই করেন, সেই সুলতান মামুদের বংশধরদের কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাসে এই ভারতে এসেই শেষ পর্যন্ত আশ্রয় নিতে হয়।

সুলতান মামুদ শেষের দিকে বর্তমান পাঞ্জাবের খানিকটা পর্যন্ত নিজ শাসনের অন্তর্ভুক্ত ক'রে নিয়েছিলেন। এখানে স্থায়ী রাজ্যস্থাপনের প্রথম চেষ্টা সেটা। সেই সামান্য রাজ্যখণ্ড সম্বল ক'রেই প্রাণধারণের চেষ্টা করলেন খুসরু মালিক—মামুদবংশের শেষ সুলতান।

কিন্তু তাতেও তাঁর পূর্ব-পুরুষ-কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হ'ল না। ভারত পর্যন্ত তাঁর সন্ধানে এলেন মুইজউদ্দীন মুহম্মদ-বিন-সাম—পরবর্তী কালে যিনি মুহম্মদ ঘুরী নামে ইতিহাসে বিখ্যাত হয়েছিলেন।

ঘুর হ'ল পূর্ব ইরানের প্রান্তে আফগানিস্থানের সামান্য একটি জায়গা—সেখানকার সামন্ত সর্দাররা ক্রমশঃ মাথা তুলছিলেন গজনীর সুলতানদের সামনেই। সে ঔদ্ধত্য তাঁদের সহ্য হয় নি, অথবা প্রবল শত্রুকে অঙ্কুরেই বিনাশ করতে চেয়েছিলেন খুসরু মালিকের পিতামহ বাহ্‌রাম শা। ঘুরের কুতবউদ্দীন আর সৈফউদ্দীনকে নৃশংসভাবে পুড়িয়ে মারলেন তিনি। ভেবেছিলেন, হয়ত এবার ভয়ে মাথা নিচু করবে ওরা চিরকালের মতো।

কিন্তু তা হ'ল না, এর কয়েক মাস পরেই এই অকারণ হত্যাকাণ্ডের শোধ তুললেন ওঁদেরই এক ভাই আলাউদ্দীন হুশেন'শাহ্—সাত দিন সাত রাত ধরে অবিরাম গজনী শহর লুঠ ক'রে এবং প্রায় গোটা শহরটা পুড়িয়ে দিয়ে। তাঁর এই কাজের জন্যে জনসাধারণের কাছে তাঁর খেতাব মিলল 'জাহান্-সুজ' বা বিশ্বদাহকারী।

তবু বাহ্‌রাম শা'র বংশধররা রেহাই পেলেন না।

বাহ্‌রাম শার ছেলে খুসরু শাহকে গজনী থেকে তাড়ালেন ঘুর-এর তুর্কী সর্দাররা। তার পরও, তাঁদেরই কাছে তাড়া খেতে খেতে এসে পৌঁছলেন ভারতবর্ষে। ভেবেছিলেন বোধ হয় যে, এতদূরে আর কোন বিপদ এসে পৌঁছবে না, কোন মতে দিনযাপনের মতো সামান্য আয়ে এই সুদূর ও ক্ষুদ্র রাজ্যখণ্ডে মাথা গুঁজে থাকতে পারবেন তাঁরা।

কিন্তু বছর দশেক যেতে না যেতেই 'জাহান-সুজ'-এর ছেলে গজনীর সিংহাসন অধিকার করলেন।

তিনি অবশ্য সেই যুদ্ধেই মারা গেলেন, কিন্তু তাঁর খুড়তুতো ভাই গিয়াস-উদ্দীন তুর্কীদের নির্মূল ক'রে সে তখ্‌ৎ দখলে আনলেন এবং প্রতিনিধি হিসাবে তা উপহার দিলেন ছোট ভাই মুইজউদ্দীন মুহম্মদকে। এঁদের দু ভাইয়ের সম্পর্ক ছিল অস্বাভাবিক রকম প্রীতির—তাই, অন্তর্দ্বন্দ্বে সময় ও শক্তি নষ্ট করতে হয় নি ব'লে, মুহম্মদ তাঁর সমস্তটাই রাজ্য বা প্রতিপত্তি বিস্তারে ব্যয় করতে পেরেছিলেন।

মুহম্মদ ঘুরী কিন্তু প্রথমেই খুসরু মালিকের দিকে তাকান নি।

তাঁর প্রথম ভারত আক্রমণের উদ্দেশ্যও বিচিত্র। মুলতানে ইস্‌মাইলী মুসলমানদের একটা বড় ঘাঁটি ছিল। এঁরা মুসলমান হ'লেও তখনকার দিনের

গোঁড়া মুসলমানরা এঁদের বিধর্মীর পর্যায়েই ফেলতেন। এঁদের দমন করতেই প্রথম মুহম্মদ ঘুরী এদেশে আসেন।

তার পরের বার এসে তিনি সোজাসুজি গুজরাট আক্রমণ করলেন। কিন্তু সেবারে খুব সুবিধা করতে পারেন নি, ওখানকার হিন্দু রাজার কাছে ভীষণ রকম পরাজিত হয়ে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন।

এর পরই খুসরু মালিকের পালা। বেচারীর রাজত্ব বলতে তখন তো দাঁড়িয়েছিল শুধু লাহোরটুকু, এবার সেইটুকুর দিকেও হাত বাড়ালেন মুহম্মদ ঘুরী।···তখন একটা পরাজয়ের গ্লানি আর একটা বিজয়ের অহঙ্কারে ঢাকা পড়া চাই, তা লাভ যা-ই হোক না কেন!

খুসরু মালিক সে আক্রমণ প্রতিহত করবার কোন চেষ্টাও করলেন না। কারণ, গোড়া থেকেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁর পক্ষে মুহম্মদ ঘুরীর সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে টিঁকে থাকবার কোন সম্ভাবনাই নেই। তিনি লাহোর ছেড়ে সোজা উত্তর দিকে পালালেন এবং নিজের ও আক্রমণকারীর মধ্যে দুর্গম পার্বত্য পথের দুস্তর ব্যবধান রচনা ক'রে একেবারে গিয়ে হাজির হলেন জম্মুতে,—সেখানকার রাজা বিজয়দেবের আশ্রয় প্রার্থনা করলেন।

হিন্দুদের আতিথেয়তার সুনাম ছিল। খুসরু মালিক মনে করলেন, বিজয়দেবের এতটুকু সামর্থ্য থাকলেও তিনি তা প্রয়োগ ক'রে আশ্রিতকে রক্ষা করবেন।

কিন্তু একটা হিসেবে বড় ভুল করেছিলেন খুসরু মালিক। সুদূর গজনী থেকে লাহোর পর্যন্ত পৌঁছতে বহু দুরারোহ দুর্লঙ্ঘ্য পাহাড়-পর্বত পার হ'তে হয়। সে পথ এখনও, এই বিংশ শতাব্দীতেও যথেষ্ট দুর্গম আছে—তখনকার দিনে তো কথাই ছিল না। সেই পথ অতিক্রম ক'রে যে এসেছে, তার পক্ষে জম্মু পৌঁছনো আর এমন কি কঠিন কাজ!

বিজয়দেবও সেটা বুঝেছিলেন। তাই যখন মৈত্রী-বন্ধনের প্রস্তাব ক'রে মুহম্মদ ঘুরী তাঁর কাছে গোপনে দূত পাঠালেন উৎকৃষ্ট আতর ও সুগন্ধী সিরাজী মদ উপঢৌকন দিয়ে—তখন সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করবার মতো সাহস তাঁর হ'ল না।

অর্থাৎ, তিনি হিসেবে ভুল করলেন না।

খুসরু মালিকের গোপন আশ্রয়ের ঠিকানা, এবং অতর্কিতে সেখানে পৌঁছবার গোপন পথটির সন্ধান ঘুরীর অনুচরদের ব'লে দিয়ে নিজে নির্লিপ্ত ও উদাসীন রইলেন।

এর পরের ইতিহাস সামান্যই।

খুসরু মালিক তাঁর সামান্য ক'জন বিশ্বস্ত অনুচর নিয়ে শেষ একটা ক্ষীণ চেষ্টা করলেন আত্মরক্ষার, কিন্তু পাহাড়ী নদীর ঢলনামা বন্যাকে কে কবে ছিটে-বাঁশের বেড়া দিয়ে প্রতিরোধ করতে পেরেছে? মাত্র কিছুক্ষণের চেষ্টাতেই তাঁকে পরাভূত ও বন্দী করল মুহম্মদ ঘুরীর সৈন্যরা।

তবে তখনই কিন্তু বিজিত প্রতিদ্বন্দ্বীকে বধ করবার আদেশ দিলেন না মুহম্মদ ঘুরী—শৃঙ্খলাবদ্ধ বন্দীকে তাঁর পিতৃ-পিতামহের রাজধানী গজনীতে প্রেরণ করলেন। সেখানেই অল্পদিন পরে মারা গেলেন খুসরু মালিক।

তা, মুহম্মদ ঘুরী দয়াই করলেন বলতে হবে—সুলতান মামুদের সর্বশেষ উত্তরাধিকারীকে নিজ জন্মভূমিতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করবার সুদুর্লভ সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত না ক'রে।

॥ তিন ॥

বিজয়দেব তাঁর যে পার্বত্য প্রাসাদটি খুসরু মালিকের জন্যে নির্দিষ্ট ক'রেছিলেন, সেটির পিছনে ছিল ঘন চীরগাছের অরণ্য। সে অরণ্য এবং প্রাসাদসীমা শেষ হয়েছে একটি পার্বত্য নদীতে। সামান্য নদী, কিন্তু বারোমাসই তাতে জল থাকে। তাছাড়া সেদিকটায় ঢালু পাথুরে জমি—সেখান দিয়ে শত্রুর আসার সম্ভাবনা ছিল না, সে চেষ্টাও তারা করে নি। অবশ্য তার প্রয়োজনও হয় নি।

সদর দরজাই যেখানে অবারিত, সেখানে আর খিড়কীর সন্ধান কে করে?

কিন্তু চরম বিপদের মুহূর্তে মানুষের বুদ্ধি যেমন প্রায়ই ঘুলিয়ে যায়—তেমনি কোন কোন ক্ষেত্রে হঠাৎ স্বচ্ছও হয়ে ওঠে।

সেদিন শেষরাত্রের আবছায়া অন্ধকারে যখন ঘুরী-বাহিনী পৈশাচিক ধ্বনি তুলে তাঁর প্রাসাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, তখন ক্ষণকালের জন্যে তাঁর রক্ষী-সৈন্যরা ও আত্মীয়রা হতবুদ্ধি হয়ে পড়লেও খুসরু মালিক এতটুকু বিচলিত বা বিহ্বল হন নি।

তিনি আত্মরক্ষার আশাহীন আয়োজন রক্ষীদের ওপরই ছেড়ে দিয়ে ছুটে নিজের কিশোর পুত্র মালিক বাহ্‌রামকে ঘুম থেকে ঠেলে তুলেছিলেন। তাকে সংক্ষেপে বিজয়দেবের বি[illegible]াসঘাতকতা এবং শত্রু-আক্রমণের ইতিহাস জানিয়ে বলেছিলেন, 'আমাদের [illegible]ার কোন আশা নেই—হয় মরতে হবে, নয় বন্দী হ'তে

হবে। সকলে মিলে পালাতে গেলে এরা ছাড়বে না। সবুক্তিগীনের এক ফোঁটা রক্ত কোথাও অবশিষ্ট আছে জানলে স্বস্তি পাবে না ঘুরের কুকুরগুলো। যেখানেই যাব খুঁজে বার করবে। তুমি একা হয়ত এখনও পালাতে পারবে—সবাইকে ওরা চেনে না। এখনই চলে যাও, অস্ত্র কি বর্মচর্ম নেবার চেষ্টা ক'রো না, তাতে পালাবার পথে বাধা হবে। চাও তো একখানা ছোরা খাপসুদ্ধ কোমরে গুঁজে রাখ—। সামান্য হাল্‌কা সাদা পোশাকে বেরিয়ে পড়। খালি পায়ে যাও—পথ পাথুরে, ঢালু। জুতো পরে গেলে পালাতে পারবে না—শব্দও হবে। পিছন দিকটায় শত্রু এখনও আসে নি—বনের মধ্যে দিয়ে নিরাপদে যেতে পারবে। ওদিকটার নদীও তোমার পরিচিত, প্রায়ই তো দেখি স্নান করতে যাও। সুতরাং, নদীতে নামবার কি সাঁতরে পার হবার কোন অসুবিধে হবে না। নদীর ভেতরে আল্‌গা পাথর আছে—কিন্তু একটু সাবধানে গেলে বোধহয় পার হয়ে যেতে পারবে। ওপারে আরও ঘন সবুজ বন, হয়ত কিছু কিছু শের বা ভালুকও আছে—তবে তারা তোমার স্বদেশবাসী বা স্বধর্মী মানুষের মতো হিংস্র নয়। সে যাই হোক, খোদার মনে যা আছে তাই হবে—শুনেছি ওদিককার বন বেশী দূর যায় নি, দু-তিন ক্রোশের মধ্যেই কিছু কিছু জনপদ আছে। যে গ্রামই আগে পাও, খোঁজ ক'রো ব্রাহ্মণ কে আছেন। তাঁর কাছে গিয়ে আগে পরিচয় না দিয়ে আশ্রয় ভিক্ষা ক'রো। এ দেশের ব্রাহ্মণরা শুনেছি কখনও কথার খেলাপ করেন না, আশ্রিতকে ত্যাগ করেন না।'

এক নিশ্বাসে এতগুলি কথা বলে, বোধ করি দম নেবার জন্যই থামলেন খুসরু মালিক।

বাহ্‌রামের চোখ থেকে তখনও ঘুম যায় নি, মস্তিষ্ক থেকে তখনও যায় নি নিদ্রার জড়তা।

সে বিহ্বল হয়ে শুনছিল এতক্ষণ। এবার সে প্রথম কথা কইল। বলল, 'আপনি এই হিন্দু রাজার কাছে আশ্রয় নেবার সময়ও তো এই কথাই বলেছিলেন বাপজান, কিন্তু তার ফল তো দেখতেই পাচ্ছেন!'

'এ যে রাজা, বেটা। সেইখানেই যে হিসেবে ভুল হয়েছিল। রাজার যে অনেক কিছু আছে, তাই অনেক কিছু হারাবারও ভয় আছে। গরীব যে, তার শুধু আছে ইমান, আছে ধর্ম। সেটা সে হারাতে চায় না। যাক—আশ্রয় না পাও, সে তোমার বা আমার তকদীর। তবে চেষ্টা ক'রো। আর কিন্তু এতটুকু সময় নেই। শুনছ দুশমনের উল্লাসধ্বনি? আর বেশীক্ষণ ওদের বোধহয় ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না আমার লোকজন।'

'না বাপজান। আপনাকে ফেলে, মা ভাই-বোনদের ফেলে একা বাঁচতে আমি চাই না, পারব না। তার চেয়ে সকলের অদৃষ্টে যা আছে, আমারও না হয় তাই হবে।'

শেষ মুহূর্তে, মন স্থির করার সময়ে এসে বেঁকে দাঁড়াল মালিক বাহ্‌রাম।

'ছিঃ বাহ্‌রাম! তুমি আমার বড় ছেলে। আমার ভবিষ্যতের আশাভরসা। তুমি থাকলে সবুক্তিগীন সুলতান মামুদের বংশ থাকবে। গজনীর আসল মালিকের বংশ থাকবে। হয়ত কোনদিন এর শোধও তুলতে পারবে তুমি— সবাই একসঙ্গে মরে কোন লাভ নেই বেটা। যদি সবাইকে নিয়ে পালাবার বা পালিয়ে বাঁচবার কোন আশা থাকত তো সে চেষ্টা আমি নিশ্চয়ই করতাম। আমার দিন শেষ হয়ে এসেছে, সবাই আমাকে ত্যাগ করেছে—তুমি আমাকে ত্যাগ ক'রো না। আমার অবাধ্য হয়ো না। আমার কথা রাখ। তুমি হয়ত বেঁচে আছ, হয়ত নিরাপদে আছ—একথা জানলে, একদিন হয়ত তুমি তোমার পিতৃকুলের শত্রুদের দমন ক'রে পিতৃপুরুষের সিংহাসন আবার দখল করতে পারবে মনে ক'রে—আমি সহস্র দুঃখ, সহস্র লাঞ্ছনার মধ্যেও শান্তি পাব। এটুকু সৌভাগ্য থেকে তুমি আমার জ্যেষ্ঠ সন্তান—আমাকে বঞ্চিত করবে না আশা করি।'

বলতে বলতেই চোখে জল এসে গিয়েছিল খুসরু মালিকের। তিনি নিজে হাতে ছেলেকে আঙরাখা পরাবার ছলে সে অশ্রু অলক্ষ্যে মুছে নিলেন। তারপর তাকে টানতে টানতে নিচে নামিয়ে এনে একরকম ঠেলেই বার ক'রে দিলেন বাড়ি থেকে—বাইরের অন্ধকার অরণ্যের মধ্যে।

ওরই মধ্যে, চলতে চলতে একবার বলবার চেষ্টা করেছিল বাহ্‌রাম,—'কিন্তু আম্মা—আম্মাজান? বহিন মুন্নি?—একবার শেষ দেখাও করব না তাদের সঙ্গে?'

'আর সময় নেই বেটা, শুনছ না বাইরের কপাট ভেঙে পড়ল!'

এদিককার, অর্থাৎ, বনের দিককার বড় কপাটটা নিঃশব্দে বন্ধ ক'রে দিলেন খুসরু মালিক।

সত্যিই তার কিছু আগে প্রবল শব্দে ভেঙে পড়েছে বাইরের বড় ফটক, সে শব্দও ছাপিয়ে উঠেছে শত্রুসৈন্যের পৈশাচিক উল্লাসধ্বনি। সময় আর সত্যিই নেই। খসরু চরম মুহূর্তে আশ্চর্য শান্ত আর নির্ভয় হয়ে গেলেন। মনে মনে শুধু একবার নিজের সৃষ্টিকর্তা এই দুনিয়ার মালিককে স্মরণ ক'রে ধীর পদে এগিয়ে চললেন শত্রুদের দিকেই। ছেলে যে এদিক দিয়ে পালিয়েছে, তার ইঙ্গিত মাত্র না পায় শয়তানের বান্দারা।

॥ চার ॥

সময় আর সত্যিই ছিল না, সেটা একটু পরে বুঝতে পারল মালিক বাহরামও।

বনপথটুকু পেরিয়ে নদীর ঢালু পাড় বেয়ে নামতে নামতেই প্রথম প্রভাতের রক্তস্বর্ণাভা মাথার ওপরের পর্বতচূড়া স্পর্শ করল। খরস্রোতা পার্বত্য নদী সঙ্কীর্ণ এবং সামান্য হ'লেও তা পার হওয়া সহজসাধ্য নয়—বিশেষতঃ বড় বড় পিছল আল্‌গা পাথরে বিপজ্জনক হয়ে আছে তার তলদেশ।

তাই নদী পার হয়ে ওপারে পৌছতে পৌছতেই বেশ ফর্সা হয়ে গেল চারিদিক।

বাহ্‌রাম আর পালাবার চেষ্টা করল না। শত্রুসৈন্যে প্রাসাদ ভরে গেছে, শুধু তাদের উন্মত্ত বিজয়-কোলাহলই শোনা যাচ্ছে না—তাদের দেখাও যাচ্ছে স্পষ্ট, এখান থেকে।

সে এপারে, যেখানটায় একটা বড় চীরগাছের গুঁড়িতে আর প্রকাণ্ড একটা পাথরে অনেকখানি অন্তরাল সৃষ্টি ক'রে রেখেছে—সেইখানে গিয়ে গুড়িসুড়ি মেরে বসে রইল।...

শত্রুর বিজয়োল্লাস কানে আসছে স্পষ্ট, কানে আসছে স্বজনদের অন্তিম আর্তনাদ।

তার মধ্যে নারীকণ্ঠও শোনা যাচ্ছে বৈকি। হয়ত তার মায়েরা, তার বোনেরা, তার বালিকা প্রথম বধূটিও ঐ উৎপীড়িতদের মধ্যে আছে। হয়ত ঐ আর্তনাদে তাদের কণ্ঠও মিশছে। সম্ভবত তাদের মেরেই ফেলল এতক্ষণে।

কিন্তু মৃত্যু তো এক্ষেত্রে ঢের ভাল, ঢের বাঞ্ছনীয়। বন্দী হওয়া বে-ইজ্জত হওয়ার চেয়ে ঢের বেশী শ্রেয়।

সে সম্ভাবনাটা মনে হয়ে সেই 'নজন অরণ্য-অন্তরালে বসেও তার ললাটের শিরাগুলো ফুলে ফুলে উঠতে লাগল, ব্যর্থ আক্রোশে নিজেরই নখ চেপে বসল মুষ্টিবদ্ধ হাতের তালুতে—রক্তাক্ত হয়ে উঠল রক্তাভ করতল।

নিষ্ফল অসহায় ক্রোধ, প্রতিকারহীন অপমানবোধ—এর চেয়ে কষ্ট বুঝি আর কিছু নেই।

বহুবার ইচ্ছা হ'ল ছুটে চলে যায় ওপারে, এই সামান্য কিরীচখানা নিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়ে দুশমনগুলোর ওপর।

অন্তত একজনকেও মারতে পারবে না নিজে মরার আগে?

তা যদি না-ও পারে, নিজে মরতে তো পারবে!

এ অবস্থায় এমনভাবে বাঁচার থেকে—কাপুরুষের মতো, কোনমতে প্রাণ-পণ চেষ্টায় নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার এই লজ্জাকর প্রয়াস থেকে সে মৃত্যু যে ঢের বেশী লোভনীয়, ঢের বেশী শ্রেয়।

কিন্তু প্রাণপণেই সে ইচ্ছা দমন করল সে। তারা বাবা, তার সুলতান, তার মালিকের আদেশ। সম্ভবত তাঁর শেষ আদেশ। সে আদেশ যদি তাঁর ছেলেও না মান্য করে—সে-ও যদি অবাধ্য হয় তো তিনি যে বেহেস্তে গিয়েও শান্তি পাবেন না।

সারা দুনিয়াই বেইমান—এই ক্ষোভ তাঁকে মৃত্যুর পরপারেও স্বস্তি দেবে না এতটুকু।

না, বাঁচতেই হবে তাকে—যতক্ষণ সম্ভব, যতটুকু সাধ্য। দুনিয়ার সবাই যদি না মানে—সে অন্তত মানবে তার সুলতানের আদেশ অক্ষরে অক্ষরে।

তেমনি বসে রইল সে সারাদিন। অভুক্ত, অতন্দ্র—স্তম্ভিত অবস্থায়। ধীরে ধীরে ওপারের কোলাহল ও আর্তনাদ থেমে এল, জনবিরল হয়ে এল প্রাসাদ। বোধহয় আহত-নিহতদের ফেলে রেখে বন্দী বন্দিনী আর লুটের মাল নিয়ে চলে গেল মুহম্মদ ঘুরীর পিশাচ সহচরেরা।

হয়ত সেই রকমই রাজা বিজয়দেবের নির্দেশ। চক্ষুলজ্জাও তো একটা আছে। আশ্রিতদের রক্ষা বা উদ্ধার করবার একটা অভিনয় অন্তত তাঁকে করতেই হবে, নইলে নিজের প্রজাদের কাছেই যে হেয় হয়ে যাবেন রাজা।

সে সময় পেরিয়ে যাবার আগেই কাজ সেরে সরে পড়তে হয়ত ওদের কাতর অনুনয় জানিয়েছিলেন বিজয়দেব।

ক্রমে সন্ধ্যাও নেমে এল উপত্যকায়, নদীবক্ষে, অরণ্যে।

আবছায়া ঘনিয়ে এসেছে চীরগাছের শাখা-প্রশাখায়। এবার অনেকটা নিরাপদ।

বাহরাম উঠে দাঁড়াল। প্রায় চার প্রহর একভাবে বসে থাকার ফলে হাতে-পায়ে খিল ধরে গেছে। উঠে একটু একটু ক'রে ছাড়িয়ে নিল সেগুলো। তারপর আর একটু এগিয়ে একেবারে নদীর পাড়ে এসে একটা পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে প্রাসাদের দিকে তাকিয়ে দেখল।

আলো বা মানুষের উপস্থিতির কোন চিহ্ন নেই সেখানে। শত্রুসৈন্ত

নিশ্চয়ই আর নেই। থাকলে তা টের পাওয়া যেত। বিজয়ী সৈন্য কখনও শান্ত হয়ে থাকতে পারে না।

কান পেতে শুনল বাহ্‌রাম—আহতের আর্তনাদ ক্ষীণ হয়ে এলেও এখনও একেবারে স্তব্ধ হয় নি—এক-আধটা গোঙানির শব্দ এখনও শোনা যাচ্ছে। হয়ত এখনও এক-আধজন বেঁচে আছে ওখানে।

লোভ হল বাহ্‌রামের। যাবে নাকি একবার ফিরে?

দেখবে পরিচিত কেউ—তার আত্মীয় কেউ এখনও জীবিত আছে কিনা ঐ মুমূর্ষুদের মধ্যে?

কে জানে—হয়ত এখনও দু-একজনকে বাঁচানো যায়!

কিন্তু তখনই মনে পড়ে গেল বাপজানের স্পষ্ট নির্দেশ।

ওদিকে আর ফেরা চলবে না।

বাঁচতে হবে তাকে।

প্রাণরক্ষার এক একান্ত অরুচিকর অথচ দুরূহ দায়িত্ব তার ওপর চাপিয়ে দিয়েছেন তার মালিক, তার সুলতান—তার বাবা।

সে দায়িত্ব বহন করতে না পারলে সবুক্তিগীনের রক্তে কলঙ্ক অর্শাবে।

স্খলিত, প্রায় অশক্ত পা দুটোকে টেনে টেনে বিপরীত দিকেই চলতে শুরু করল সে।

খসরু মালিক বলে দিয়েছিলেন দু-তিন ক্রোশের মধ্যেই জনপদ পড়বে, কিন্তু বহুক্ষণ ঘুরেও বাহ্‌রাম সে জনপদের সন্ধান পেল না। বন আছে—কোন বনপথ নেই। চীরগাছের জঙ্গল—সব গাছ একই রকম দেখতে। তার মধ্যে পথ ঠিক করা যায় না।

অনেকক্ষণ ঘোরবার পর তার মনে হ'ল যে, সে একই পথে বার বার ঘুরছে। হাঁটা অভ্যাস নেই, বিশেষত উঁচুনীচু পাহাড়ী পথ—অল্পক্ষণের মধ্যেই পা ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেল। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় শরীর ভেঙে আসছে—বিশেষ ক'রে তৃষ্ণা, অসহ তৃষ্ণায় বুক শুকিয়ে উঠেছে।

তার ওপর প্রচণ্ড শোক। শোকে যে এমন শারীরিক যন্ত্রণা হয়, নিকটাত্মীয়-বিচ্ছেদে যে বুকের মধ্যে এমন করে, তা কখনও কল্পনাও করে নি সে—

তবু যেতেই হবে। জোর ক'রে মনে এবং দেহে জোর আনে। মামুদ শা'র বংশধর সে—সামান্য দৈহিক ক্লিন্নতার কাছে হার মানলে চলবে না।

অবশেষে সূর্যের অবস্থান দেখে পথ চলা ঠিক করল। সূর্য কোন্ দিকে,

এটা উত্তরায়ণ না দক্ষিণায়ন তা সে জানে না, শুধু সূর্যকে সামনে রেখে এগোবে, তা যেখানেই পৌছুক। মেঘে ও কুয়াশার ম্লান—তবু তার মধ্য থেকে সূর্যকে দেখা যাচ্ছে ঠিকই।

এইবার ভাগ্য তার প্রতি সুপ্রসন্ন হলেন।

সূর্য সামনের বড় পাহাড়টার আড়ালে নামবার আগেই সে পাহাড়ের কোলে গ্রামের চিহ্ন দেখতে পেল।

সমৃদ্ধ না হোক, বেশ সম্পন্ন গ্রাম। ঘর-বাড়ির সংখ্যা খুব কম নয়—দু-একখানা পাকা পাথরের বাড়িও আছে। দু'তিনটি দেবালয়ের চূড়া এখান থেকেই দেখা যাচ্ছে। সম্ভবত স্বর্ণমণ্ডিত চূড়া, সন্ধ্যাসূর্যের রক্তিমাভায় ঝকমক্ করছে।

যা আছে অদৃষ্টে তাই হবে। ঐখানে গিয়েই আশ্রয় প্রার্থনা করবে সে। আর দ্বিধা বা ইতস্ততঃ করার সময়ও নেই। এখনই একটু বিশ্রামের মতো স্থান এবং একটুখানি পানীয় জল না পেলে সে মারাই যাবে সম্ভবত

সে ওরই মধ্যে জোরে পা চালাল, যতদূর সম্ভব।

॥ পাঁচ ॥

ললিতাকেশৌ সত্যই বর্ধিষ্ণু গ্রাম। বহু ঘর ব্রাহ্মণ ও ছত্রীর বাস এখানে। বৈশ্য বা বানিয়াও কিছু আছে। চাষবাসই বেশির ভাগ লোকের জীবিকা, সামান্য সামান্য কারবারও করে কেউ কেউ।

ললিতাকেশৌ বা ললিতাকেশব এ গ্রামের প্রধান দেব-মন্দির। পুরাকালে নাকি কাশ্মীরের রাজা ললিতাদিত্য স্বয়ং এই কেশবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন, আর বহু দূর থেকে এক নিষ্ঠাবান সাধক ব্রাহ্মণ আনিয়ে তাঁর হাতেই এই আদি-কেশব-মূর্তি সেবার ভার দেন।

সে ব্রাহ্মণ সপরিবারেই এখানে এসেছিলেন, বংশপরম্পরায় তাঁরাই সে সেবার ভার আজও বহন করছেন।

এই ব্রাহ্মণ পরিবারের স্বধর্মনিষ্ঠা, ঐকান্তিকতা ও পবিত্র জীবনযাত্রার জন্যে সকলেই এঁদের খুব শ্রদ্ধার চোখে দেখেন। সাধারণ পূজারী ব্রাহ্মণের মতো কেউ মনে করেন না। এঁদের বংশে যখন যিনি বয়োজ্যেষ্ঠ কর্তা বা প্রধান পূজারী হন – তাঁকেই গুরু করেন গ্রামের সকলে, অর্থাৎ, সে সময় যাদের দীক্ষা-গ্রহণের প্রয়োজন বা সময় হয় তারা তাঁর কাছেই দীক্ষা নেয়।

বর্তমানে যিনি প্রধান পূজারী—বিষ্ণুপ্রসাদ, তিনি সেদিন অপরাহ্ণে প্রান্তবর্তিনী ঝরণায় স্নান করতে গিয়েছিলেন। এ তাঁর প্রতিদিনের অভ্যাস—সান্ধ্যপূজার আগে আর একবার এই গিরিনির্ঝরিণীর শীতল স্বচ্ছ জলে স্নান করার। দু-বেলাই স্নান করেন তিনি প্রত্যহ—এমন কি শীতের দিনে, যখন দুধারে চীর-গাছের শীর্ষ তুষারে সাদা হয়ে যায়, তখনও।

সাধারণতঃ তিনি যখন স্নান করতে নামেন—দু-বেলাই—তখন গ্রামের কেউ নদীতে আসে না। এই ঠাণ্ডায় বিকেলে কেউ স্নান করে না। আর ভোরে যখন তিনি আসেন—তখন কেউ স্নানের কথা ভাবেও না। সুতরাং তিনি একান্ত নির্জনে স্নান করতেই অভ্যস্ত। কিন্তু আজ স্নান সেরে ওঠবার মুখে এক অদ্ভুত দৃশ্য চোখে পড়ল তাঁর।

দেখলেন তিনি আজ সম্পূর্ণ একা নন, কাছেই অন্তত আর একটি জীবিত মানুষ ছিল। কিন্তু সে কেমন মানুষ? ষোল সতেরো বছরের অতিশয় সুদর্শন একটি কিশোর ছেলে প্রায় টলতে টলতে বনের মধ্যে থেকে বেরিয়ে নদীর কাছাকাছি এসে মাটিতে পড়ে গেল—আর উঠতে পারল না। কিন্তু সেই অবস্থাতেই পশুর মতো হামাগুড়ি দিয়ে এসে পশুর মতোই জলে মুখ দিয়ে জল পান করতে লাগল।

তখনও দিনের আলো বিদায় নেয় নি একেবারে।

বিষ্ণুপ্রসাদ ভাল ক'রে তাকিয়ে দেখলেন, ছেলেটির গায়ে বিজাতীয় পোশাক, সাদা সূতি কাপড়ে তৈরি—অনেক জায়গাতে ছিঁড়ে গেছে—তবু তা যে একদা মূল্যবান বস্ত্রেই তৈরি হয়েছিল তা দেখলেই বোঝা যায়। ছেলেটির পা ক্ষত-বিক্ষত, রক্তাক্ত। নিশ্চয় বহুদূর থেকে এবং বহুক্ষণ ধরে হাঁটছে সে—পরিশ্রমে অনভ্যস্ত ধনীসন্তান—ক্লিষ্ট ও ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

তৃষ্ণার উগ্রতা দেখে এটাও অনুমান করতে অসুবিধা হয় না যে সে ক্ষুধার্তও। হয়ত বহুক্ষণই খাওয়া হয় নি তার—কে জানে হয়ত বা একাধিক দিনই।

ভাল ক'রে দেখতে যেটুকু সময় লাগল, তারপর বিষ্ণুপ্রসাদ আর বিন্দুমাত্র দ্বিধা বা সময় নষ্ট করলেন না, এগিয়ে এসে প্রশ্ন করলেন, 'বৎস, তুমি কে? কোথা থেকে এসেছ? কোথায় যাবে? তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে বহুক্ষণ কিছু খাওয়া হয় নি তোমার—আপত্তি না থাকে তো গ্রামে চল, দেবতার মন্দির আছে—প্রসাদের ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি। যদি বিশ্রাম করতে চাও তারও ব্যবস্থা হ'তে পারবে।'

ছেলেটি মুখ তুলে তাকাল।

ঈষৎ ভয়ার্ত তার দৃষ্টি, কিছুটা কৌতূহলীও। বিষ্ণুপ্রসাদের সদ্য-স্নাত দীর্ঘ দেহ ও যজ্ঞোপবীত দেখে সে কি বুঝল কে জানে—খানিকটা যেন আশ্বস্ত হ'ল। তবু বেশ একটু সঙ্কোচের সঙ্গেই প্রশ্ন করল, 'আপনি ব্রাহ্মণ?'

ছেলেটির কথা বাঁকা, উচ্চারণ কষ্টকৃত। অর্থাৎ এ অঞ্চলের লোক নয়, বহু যত্নে এ দেশের কথা কিছুটা আয়ত্ত করেছে।

বিষ্ণুপ্রসাদ আরও বিস্মিত হ'লেন। কিন্তু তবু প্রশান্ত কণ্ঠেই উত্তর দিলেন:

'হ্যাঁ বৎস। আমি এখানকার পুরাধিশ্বর শ্রীললিতাকেশবের পূজারী।'

'আমার—আমার বাপজান বলে দিয়েছেন, ব্রাহ্মণের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতে। আমি বড় বিপন্ন। আপনি—আপনি আমাকে আশ্রয় দেবেন?'

ভয়ে ভয়েই প্রশ্ন করল ছেলেটি।

বিষ্ণুপ্রসাদ অভয় হাস্যের সঙ্গে বললেন, 'যতক্ষণ এবং যতটুকু সাধ্য আমি করব। তবে আশ্রয় দেবার মালিক তো আমি নই বাবা—সে মালিক কেশবজী। তুমি আমার সঙ্গে চল। তুমি শ্রান্ত এবং ক্ষুধার্ত। আগে তোমার আহার ও বিশ্রামের ব্যবস্থা করা দরকার।'

'কিন্তু আপনি আমার সব কথা শোনেন নি। আমি আপনাকে ঠকিয়ে কোন সুবিধা নিতে চাই না। আমাকে আশ্রয় দিলে আপনি বিপদে পড়তে পারেন। খুব বেশী রকমের বিপদে। দিগ্বিজয়ী মামুদ শার বংশধর খুসরু মালিক আমার বাবা। ঘুরী সর্দার মুহম্মদ-বিন-সাম আর তার দাদা আমাদের গজনীর তখ্‌ৎ দখল করেছে। তাতেও তাদের তৃপ্তি নেই, আমরা এসে এই সুদূর ভারতে আশ্রয় নিয়েছিলাম, সেখান থেকেও উৎখাত করতে এসেছে। আমাদের আজ কিছু নেই, তাদের প্রচুর শক্তি। শেষ আশ্রয় নিয়েছিলাম আপনাদের রাজা বিজয়দেবের কাছে—তিনিও বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। আমাদের শেষ আশ্রয়টুকুও গত কাল ঘুচেছে। আমার মা-বাবা-ভাই-বোন সবাই শত্রুর হাতে পড়েছে—হয় মৃত, নয় বন্দী। কেবল বাবার আদেশে আমিই পালিয়েছি। হয়ত দুশমনরা এখন আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। কারণ, আমি বেঁচে থাকতে তাদের শান্তি নেই। হয়ত খুঁজে বারও করবে আমাকে। সুতরাং আমাকে যে আশ্রয় দেবে, সে অনেকটা ঝুঁকি নেবে মাথায়। দেখুন—এ জেনেও আশ্রয় দেবেন?'

'আমি আশ্রয় দেবার কে বাবা? তুমি ললিতাকেশবের অতিথি। বিপদ বোঝেন—তিনিই ব্যবস্থা করবেন।'

অচঞ্চল কণ্ঠে উত্তর দিলেন বিষ্ণুপ্রসাদ।

'কিন্তু আমি মুসলমান—তা বুঝতে পেরেছেন আশা করি?'

এবার মুহূর্তখানেক চোখ বুজে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন বিষ্ণুপ্রসাদ। তার পর সামান্য একটু চাপা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, 'তুমি অতিথি, কেশবজীর আশ্রিত। তুমি আমাদের কাছে নারায়ণ। তুমি চল আমার সঙ্গে, হাঁটতে পারবে, না হাত ধরব?'

'না—আমি নিজেই যেতে পারব। চলুন।'

খোঁড়াতে খোঁড়াতে বাহ্‌রাম ওঁর পিছনে পিছনে চলল।

॥ ছয় ॥

এই ঘটনায় লালতাকেশো গ্রামে কিন্তু চাঞ্চল্য ও উত্তেজনার অবধি রইল না।

সাধারণত শান্ত স্তব্ধ বৈচিত্র্যহীন গ্রাম-জীবনে প্রচণ্ড ঝড় উঠল একটা—ক্ষোভ ও বিদ্বেষের। এ কী অনাচার? তাদের ধর্মের ঘরে এসব কি হ'তে শুরু করল। গুরুবংশের সর্বজ্যেষ্ঠ, এ গ্রামের অনেকেরই গুরু বা গুরুস্থানীয় বিষ্ণুপ্রসাদ—সকলেই যথেষ্ট শ্রদ্ধা করে তাকে, তবু তাঁর এ কাজটা সমর্থন করতে পারল না অনেকেই। তিনি গুরু, তিনি ভগবানের প্রধান পূজারী—তিনি একটা বিজাতীয় বিধর্মী মুসলমানকে নিজের বাড়িতে এনে আশ্রয় দিলেন?

যদিও সে যে ঘরে আছে সেটা ঠিক মূল বাড়ির ভেতরে নয়, বাইরের দিকে অতিথিশালার মধ্যে সেটা, তবু এক প্রাঙ্গণ, এক প্রাচীরের মধ্যেই তো।

শুধু তাই নয়, সে আবার নাকি বলেছে যে কোন ঠাকুর-দেবতার প্রসাদ সে খাবে না, তার জন্য পৃথক রান্না করতে হবে। আর বিষ্ণুপ্রসাদও নাকি নিজের গৃহিণী-পুত্রবধূ-কন্যাদের দিয়ে ঐ ম্লেচ্ছের জন্য পৃথকভাবে পাক করাচ্ছেন।

আবার উনি নাকি কোন্ রাজপুত্র, ওঁর দ্বারা নাকি নিজের বাসন ধোওয়াও সম্ভব নয়। প্রথম সে হুকুমও দিয়েছিলেন বিষ্ণুপ্রসাদ যে কুলনারীরাই কেউ ওর বাসন মেজে দেবে, তাতে নাকি দোষ নেই—অতিথি-সেবার জন্যে সব কিছুই নাকি করা যেতে পারে। নেহাৎ ছেলেটাই বুঝি বেগতিক দেখে মাটির বাসন আর পাতায় খেতে রাজী হয়েছে—তাই তবু রক্ষা।

তাও সুলতান বাহাদুরের ঘরে দুবেলা খাবার পৌঁছে দিয়ে আসতে হয়, সন্ধ্যায় প্রদীপ জেলে দিয়ে আসতে হয়—উনি নাকি নিজে কিছুই করতে পারেন না। ইতিমধ্যে বিষ্ণুপ্রসাদ নাকি একদিন স্নানের আগে নিজে ওর

বিছানা-সাফ ক'রে ঘর ঝাঁট দিয়ে এসেছেন। এ কী অঘটন! গুরুবংশের এ কী অধঃপতন!

অভিযোগ, অনুযোগ এবং বিক্ষোভ কিছু কিছু খোদ বিষ্ণুপ্রসাদের কানেও যে না আসে এমন নয়। কিন্তু তিনি অবিচলিত নির্বিকার, কিছুই তাঁকে বিচলিত করতে পারে না কোন দিন। এখনও তিনি শুধু বলেন, 'আশ্রয়প্রার্থী অতিথি নারায়ণ। ওর সেবা স্বয়ং কেশবজীরই সেবা।'

আরে, সেবা তো বোঝা গেল। কিন্তু আমাদের সেবা আমাদের মতোই তো করতে পারি। অত কেন? ওঁর জন্য পৃথক রাঁধতে হবে! কেন?

এমন কী পীর মহাপুরুষ উনি? ওদের তো নাকি খাদ্যাখাদ্য বিচার নেই। আজ যদি ও আবদার ধরে গোমাংস বেঁধে দিতে হবে—গুরুজী তাও দেবেন নাকি?

এমন অসংখ্য বাঁকা বাঁকা প্রশ্ন ওঠে। বিষ্ণুপ্রসাদ হেসে বলেন, 'সে আবদার তো ধরে নি। আমার যথাসাধ্য আমি করব—ওটা চাইলে সাধ্যাতীত ব'লে বাদ দিতে হবে। তাতে আর অসুবিধাটা কী?'

অর্থাৎ, মাঝিক বাহ্‌রাম থেকেই যায়। নিশ্চিন্ত নিরাপদ আশ্রয় পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। আদরে লালিত যে, একদিনের অনিশ্চিত জীবনযাত্রাতেই ভীত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিল।

এখানে বাহ্‌রামের দিন বিলাসে না হোক আরামেই কাটে। বেশ লাগে তার জায়গাটা। পাহাড়ে অরণ্যে নির্ঝরিণীতে মনোরম। এঁদের আতিথেয়-তারও তুলনা নেই। সুন্দর একটি ঘর, কোমল শয্যা এবং দুবেলা নিয়মিত আহার। কালিয়া-কাবাব মেলে না সত্য কথা, কিন্তু রুটি সব্‌জি ফল দুধ—এই বা মন্দ কি? বরং আজকাল যেন বাহ্‌রামের মনে হয়, ওদের পোলাও-কালিয়ার চেয়ে এই খাবারই ভাল।

শুধু একটা তার অসুবিধা—কথা কইবার লোক কম।

এখানকার গ্রামবাসীরা কেউ অভদ্র ব্যবহার করে না এটা ঠিক, তেমনি প্রীতির চোখেও যে দেখে না, তা বাহ্‌রাম তাদের ভাবে-ভঙ্গীতে, তাদের মুখ দেখেই বুঝতে পারে।

উড়ো আপদ বলে মনে করে এরা, মনে করে তাদের ভবিষ্যৎ বিপদের সম্ভাব্য কা ণ। তাই যথাসাধ্য সকলে ওকে এড়িয়েই চলে।

ওর ঘরে আনবার মধ্যে দৈনিক চারবার ক'রে খাবার দিতে আসে বিষ্ণু-

প্রসাদের পৌত্রী বিশাখা অথবা পৌত্র সূর্যপ্রসাদ। বিশাখার বয়স তের কি চৌদ্দ—সূর্যপ্রসাদের সামান্য একটু বেশী। হয়ত সতেরো কিংবা আঠারো। প্রায় ওর সমবয়সী। তাছাড়া আর তো কোন লোকই নেই হাতের কাছে। তাদের সঙ্গেই বা একটু গল্প করতে পায় বাহ্‌রাম রোজ কিছুক্ষণ।

প্রথম প্রথম ওরাও এড়িয়ে চলত, মাটির পাত্রে ও পাতার ঠোঙায় সাজানো খাবার এনে বসিয়ে দিয়েই ছুটে পালাত, কিন্তু ক্রমে একটু একটু ক'রে ভয় ভাঙল। এখন একটু ক'রে সময় কাটিয়ে যায় এখানে। যদিচ বাহ্‌রামের শয্যাতে বসে না তারা, ঘরের মেঝেতে বা দোরের বাইরে আল্‌তো দাঁড়িয়ে গল্প করে।

ওদের মনে এখনও কোন অন্ধ সংস্কার বাসা-বাঁধার অবকাশ পায় নি। ওরা বুঝতেও পারে না এর সম্বন্ধে সকলের এত উষ্মা এত বিদ্বেষ কেন। ওদের তো ভালই লাগে এর সাহচর্য। বিশেষ ক'রে বিশাখার তো কথাই নেই—তার খুব ভাল লাগে এই কিশোরটিকে। হয়ত রূপবান বলিষ্ঠ পুরুষের প্রতি নারী-জাতির সহজাত আকর্ষণ এটা। কে জানে!

কিন্তু সে যাই হোক, এদেরই মুখ থেকে বাহ্‌রাম শুনতে পায় অনেক কথা। এই গ্রামবাসীদের পরিচয়—অর্থাৎ কে কেমন; বিষ্ণুপ্রসাদ, ওদের বাবা বৃন্দা-প্রসাদ, চাচা বলদেওপ্রসাদ কেমন লোক; গ্রামের লোকেরা ওঁদের কী পরিমাণ ভক্তি করে, মন্দিরে কী কী দিনে কোন্ কোন্ উৎসব হয়, সে উৎসবে কত খরচ হয়; ভোগে নিত্য যে ক্ষীর বা পায়স দেওয়া হয়—আলাদা তৈরী করলে নাকি তেমন স্বাদ হয় না কিছুতেই, প্রসাদ না-খেয়ে খুবই ঠকছে মালিক বাহ্‌রাম,—এইসব কথা কল কল ক'রে বলে যায় তারা।

প্রথম প্রথম ভাষা নিয়ে একটু অসুবিধা হ'ত—বাহ্‌রামের বাঁকা উচ্চারণ ওরা ঠিক ঠিক বুঝতে পারত না সব সময়। ওদের দেহাতী বুলিও সব বোঝা বাহ্‌রামের বিদ্যাতে কুলোত না। তখন ইশারা ইঙ্গিতে কাজ চলত। এখন আর অসুবিধা নেই কিছু। মানুষ যখন উন্মুখ হ'য়ে ওঠে মনের কথা মুখে প্রকাশ করতে, তখন ভাষা যাই হোক তার অর্থ বুঝতে মনের অসুবিধা হয় না।

বাহ্‌রাম একটু একটু ক'রে আকৃষ্ট হয় তাদের দিকে, সূর্যপ্রসাদের সঙ্গে তো একটা সখ্যই গড়ে ওঠে তার। আর বিশাখা? বিশাখাকে তার বড় ভাল লাগে। এ ভাল লাগার কোন বিশেষ অর্থ সে বোঝে না—শুধু বোঝে যে বিশাখা এসে দাঁড়ালে তার দেহের প্রতি রক্তকণায় জাগে এক অজানা

উত্তেজনার অধীরতা—তার মনের সমস্ত রন্ধ্রকোণ এক অজানা আনন্দের আলোতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

সে আলোর তুলনা নেই। তেমন আলোর আভাস কখনও পায় নি সে।

সারা দিন-রাতের প্রতিটি জাগ্রত মুহূর্ত সেই মূর্তিমতী আলোকদূতীর জন্য প্রতীক্ষায় উন্মুখ হয়ে থাকে সে। আজকাল এমন কি তার বদলে দোস্ত সূর্যপ্রসাদ এলেও একটু ক্ষুণ্ণই হয় মনে মনে।

রাত্রে শুয়েও অর্ধসচেতন, অর্ধতন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় অলস কল্পনা-স্বপ্নে কখন তার ছেড়ে-আসা বালিকা বধূর সঙ্গে এই মেয়েটি মিশে যায়—দুটো ছবি একাকার হয়ে গিয়ে কখন শেষ পর্যন্ত এই বালিকাটির ছবিই স্পষ্ট হয়ে জেগে থাকে সেখানে—তা বুঝতেও পারে না।

॥ সাত ॥

আতিথেয়তার এই অতিরিক্ত আতিশয্যে গ্রামের মধ্যে যে লোকটি সবচেয়ে বিরক্ত হয়, সে হচ্ছে বৃন্দাপ্রসাদ—বিশাখা ও সূর্যর বাবা।

তার ক্রোধ বরাবরই একটু বেশী, সেজন্য বাড়ির লোক সবাই তাকে ভয় করে—এক বিষ্ণুপ্রসাদ ছাড়া। পিতা গুরুজন, বাড়ির কর্তা—গ্রামসুদ্ধ লোকের গুরু—তাঁর আদেশ অলঙ্ঘনীয়, সুতরাং একমাত্র তাঁর কাছেই মাথা হেঁট ক'রে থাকতে হয় বৃন্দাপ্রসাদকে।

কিন্তু মনে মনে সে কিছুতেই অনুমোদন করতে পারে না তাঁর এই ব্যবহার।

সে মনোভাব তার শাণিত বাক্যে, রুষ্ট পদক্ষেপে ও ভয়ঙ্কর ভ্রূকুটিতে অহরহই প্রকাশ পায়—বাড়িসুদ্ধ লোক সকলে তটস্থ হয়ে ওঠে তার এই উগ্মার চেহারা দেখে—কেবল বিষ্ণুপ্রসাদই নির্বিকার থাকেন।

ক্রমে তাঁর প্রতি অবিচল আনুগত্য ও শ্রদ্ধাও বৃন্দাপ্রসাদকে আর শান্ত রাখতে পারে না।

হয়ত, নিজের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ম্লেচ্ছ ছেলেটার একটা প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠছে এটা লক্ষ্য ক'রেই—সে একটু শঙ্কিতও হয়ে ওঠে।

হয়ত গ্রামের লোকের আলোচনা ও মন্তব্য কানে এসে পৌঁছবার ফলে সে অপমানিতও বোধ করে নিজেকে। কারণ যাই হোক—একদিন সোজা গিয়ে বাবার সামনে দাঁড়িয়ে সে নতমুখে নিঃসঙ্কোচে বলে, 'আপনি আমার বাবা,

আমার ওপর আপনার সবরকম জোর চলে—কিন্তু যেখানে আমার সম্পূর্ণ অধিকার, সেখানে আপনি জোর খাটাতে যান কেন?'

বিষ্ণুপ্রসাদ বিস্মিত হলেন কি না তা তাঁর মুখ দেখে বোঝা গেল না। তিনি শুধু প্রশান্ত মুখ ছেলের দিকে ফিরিয়ে প্রশ্ন করলেন—'অর্থাৎ?'

'আমার ছেলেমেয়ের আমি বাবা। আমার মতামতের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা, তাদের আনুগত্য থাকা দরকার। আমি পছন্দ করি না যে, তারা ঐ বিধর্মীর ঘরে গিয়ে খাবার পৌঁছে দিয়ে আসে বা তার সঙ্গে গল্প-গুজব করে।'

'তাহ'লে নিশ্চয়ই তাদের যাওয়া উচিত নয়। আমি সেটা ঠিক বুঝতে পারি নি। আমার উচিত ছিল তোমাকে আগে জিজ্ঞাসা ক'রে তোমার মত নিয়ে তাদের এ কাজে নিযুক্ত করা। সেটা আমার ত্রুটি ঘটে গিয়েছে। যাই হোক্—তুমি তাদের নিষেধ ক'রে দিও। আর সেক্ষেত্রে তুমিই বরং ওর ঘরে খাবার ও পানীয় জল পৌঁছে দিও সময়মতো। তোমাকে অবশ্যই আদেশ করার অধিকার আমার আছে। সেই অধিকারেই এ কথা বললাম।'

তিনি আর দাঁড়ালেন না। অবিচলিত মুখে গিয়ে নিজেদের গৃহদেবতার পূজার ঘরে প্রবেশ করলেন।

অনেকক্ষণ সেইখানেই চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল বৃন্দাপ্রসাদ—দাঁতে ঠোঁট চেপে।

অনেক ভেবে চিন্তে অনেক হিসেব ক'রে কথাটা বলেছিল সে। বাবাকে কী পরিমাণ অপ্রতিভ করতে পারবে—এই ভেবে সে বেশ একটু উল্লসিতও হয়ে উঠেছিল। মনে মনে নিজের বুদ্ধির তারিফও করছিল। ভেবেছিল বাবা আর কোন উত্তরই দিতে পারবেন না। এইভাবে যে এটা ফিরে তার ওপরই এসে পড়বে তা একবারও ভাবে নি। সেই রাগেই দাঁত দিয়ে নিজের ঠোঁট কামড়াতে লাগল সে। আর তার ফলে কিছুক্ষণ পরে ঠোঁটের কোন কোন স্থান কেটে রক্তও পড়তে লাগল, কিন্তু সে লবণ-স্বাদেও তার সম্বিত ফিরল না। কেমন এক রকমের ক্রূর অথচ শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে বহুক্ষণ।

তাকে ঐ একভাবে এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বাড়ির অন্যান্য লোকজন কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে এল কেউ কেউ, প্রশ্নও করতে গেল অনেকে—কিন্তু তার মুখ-চোখের সেই ভয়ঙ্কর চেহারা দেখে তাদের মুখের কথা মুখেই মিলিয়ে গেল, তৎক্ষণাৎ সভয়ে সরে গেল সবাই।

অনেক—অনেকক্ষণ, প্রায় একদণ্ডকাল সেইভাবে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে

থাকার পর অকস্মাৎ বৃন্দাপ্রসাদের মুখ প্রসন্ন হয়ে উঠল। অতি ক্ষীণ একটা হাসির রেখাও ফুটে উঠল ঠোঁটের কোণে। সে বাড়ির পেছনের আস্তাবলে গিয়ে নিজের পাহাড়ী টাট্টুটি খুলে নিয়ে তাতে চেপে বসল।

কোথায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে, কাউকেই বলল না, জিজ্ঞাসা করবারও সাহস হ'ল না কারও। শুধু ঘোড়া ছোটাবার ভঙ্গীতে মনে হ'ল, তার একটু তাড়াই আছে। সদ্য-ভেঙে-নেওয়া চীরগাছের ডালের আঘাতে শিক্ষিত টাট্টু যাত্রার সঙ্গে সঙ্গেই বেশ জোর কদম ধরল। দেখতে দেখতে সে অশ্ব ও অশ্বারোহী উচ্চাবচ পার্বত্য-পথে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বৃন্দাপ্রসাদ ঠিক তিনটি দিন অনুপস্থিত থাকার পর বাড়ি ফিরল খুব খুশ-মেজাজে। সে মানুষই যেন নয়—সবাইকে ডেকে ডেকে কুশল জিজ্ঞাসা করতে লাগল, অকারণেই হাসি-ঠাট্টা জুড়ে দিতে লাগল। এমন কি বাড়ির দাসী-চাকরদের সঙ্গেও হেসে হেসে কথা কইতে লাগল—যা একেবারেই তার স্বভাব-বিরুদ্ধ। তার রূঢ় ও রুষ্ট স্বভাবের জন্য দাসী-চাকররা সর্বদা তাকে দূরে পরিহার ক'রে চলত।

সবই করল, শুধু কোথায় এবং কী কাজে এই তিনদিন অনুপস্থিত রইল, কোন্ এত প্রয়োজনীয় কাজে তাঁর প্রতিদিনের পূজাপাঠ নিয়ম কর্মের ব্যাঘাত ক'রে তাকে বিদেশে ছুটতে হয়েছিল, সেই কথাটি বলল না কাউকে। সম্ভবত খাওয়াও হয় নি কদিন ভাল—কারণ এদিকে অত্যন্ত আচারনিষ্ঠ বৃন্দাপ্রসাদ—পরগোত্রে অন্নাহার করে না। সম্ভবত এই কদিন ফল খেয়েই কাটাতে হয়েছে তাকে।

তার এই আপাত-প্রসন্ন মূর্তিতে বাড়ির অপর সকলে ভুললেও বালিকা বিশাখা ভুলল না।

কারণ বরাবরই সে বৃন্দাপ্রসাদের কাছে কাছে থাকত। ফাই-ফরমাশ তার যা কিছু বরাবর বিশাখাকেই খাটতে হ'ত। সে-ই তাকে চেনে সবচেয়ে বেশী। সেদিন ঘোড়ায় চড়বার আগে—সেই হাসিটাও দেখেছিল সে। এখনকার এ মূর্তি-যে বৃন্দাপ্রসাদের স্বাভাবিক নয়—তা সে বুঝতে পারল।

তার মনের মধ্যে একটা অকারণ উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা তাকে অস্থির ক'রে তুলল যেন। কী একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় তার বুক দুরদুর ক'রে উঠল।

কিসের আশঙ্কা তা ঠিক না বুঝলেও তার কেবলই মনে হ'তে লাগল কোথাও একটা বড় রকমের কিছু বিপর্যয় ঘটবে।

অবশেষে সে আর থাকতে না পেরে সবার অলক্ষ্যে অসময়েই বাহ্‌রামের ঘরে গিয়ে উপস্থিত হ'ল।

বাহ্‌রাম তখন তার খাটিয়াতে বসে জানলার বাইরে দিয়ে দূর তুষারাবৃত পর্বতমৌলির দিকে চেয়ে ছিল, বোধ করি ভাবছিল বিশাখার কথাই। হঠাৎ সেই ধ্যানমূর্তিকে সামনে প্রত্যক্ষ ক'রে প্রথমটা বিশ্বাসই হ'তে চাইল না তার, তারপর খুশী হয়ে বলে উঠল, 'আরে, এ যে দিনদুপুরে চাঁদ উঠল আশমানে। ব্যাপার কি? হঠাৎ এত মেহেরবানি? কোন ফরমাশ থাকে তো বলো—বসে বসে আর ভাল লাগছে না। কিছু একটা কাজ করতে পারলেও বেঁচে যাই।—যাক—ভেতরে এস। বসবে না তো—তবু কাছে এসেই দাঁড়াও। তারপর? আজ এমন অসময়ে দেখা দেবার মর্জি হ'ল যে?'

'তামাশা রাখ শাহ্‌জাদা', কাছে এসে কম্পিত কণ্ঠস্বর নামিয়ে এনে বলে বিশাখা, 'আমার মনে হচ্ছে, তোমার খুব বড় একটা বিপদ আসন্ন। বাবার ভাবগতিক ভাল বোধ হচ্ছে না একটুও। এ ক'দিন কোথায় ছিলেন তিনি, কী ক'রে এলেন? এত খুশীই বা কেন? তুমি আসার পর থেকেই তো রেগে ছিলেন, সে রাগ বাড়ছিলই দিন দিন বরং—হঠাৎ এত খুশির কারণ কি? আমার মনে হচ্ছে তোমাকে এখান থেকে তাড়াবারই একটা মতলব আঁটছেন ভেতরে ভেতরে। কে জানে, কোন দুশমনের সঙ্গে কোন বন্দোবস্ত ক'রে এলেন কিনা!—তুমি, তুমি এখান থেকে পালাও শাহ্‌জাদা।'

বাহ্‌রামের মুখের হাসি মিলিয়ে এল। সে স্তব্ধ হয়ে বিশাখার মুখের দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ, যেন কথাটার পুরো অর্থ বোঝবার চেষ্টা করতে লাগল।

অনেকক্ষণ পরে অর্থটা হয়ত বোধগম্য হ'ল কিন্তু ঠিক বিশ্বাস হ'ল না। একবার নিজের চেহারার দিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে সে যে স্বপ্ন দেখছে না এইটেই যেন বুঝতে চেষ্টা করল।

তারপর আবার জানলা দিয়ে বাইরের দিকে চাইল।

ঝলমল করছে আকাশ ও প্রকৃতি। দূর পাহাড়ের উজ্জ্বল বরফে-ঢাকা চুড়োয় সূর্যালোক পড়ে বিদ্যুতের মতোই চোখ-ধাঁধানো দীপ্তির সৃষ্টি করেছে—দর্পণে প্রতিফলিত আলোর মতোই। নীচে ঘন সবুজ অরণ্য—মধ্যে মধ্যে গলিত হীরকের মতো ছোট ছোট পার্বত্য ঝরনা, সবটা মিলিয়ে যেন এক স্বপ্নলোক।

এখানে বিপদ? এখানে মৃত্যুভয়? বিশ্বাস হয় না যে কিছুতেই।

তাছাড়া তার যা বয়স—এই বয়সে মানুষ মানুষকে বিশ্বাস করতেই চায়। ভালবাসতেই চায়। অবিশ্বাস করা তার স্বভাববিরুদ্ধ। বিশেষত যেখানে

ভালবাসা পেয়েছে—পেয়েছে ভদ্র ব্যবহার, সেখানে কোন বিপদ, কোন ষড়যন্ত্র থাকতে পারে—তা বিশ্বাস করা ওর পক্ষে কঠিন বৈকি!

জোর ক'রে আবার মুখে হাসি ফুটিয়ে তোলে বাহ্‌রাম, 'না না বিশাখা, তুমি মিথ্যে ভয় পাচ্ছ! তোমার বাবা আমার ওপর খুব প্রসন্ন নন সত্যি কথা, কিন্তু তাই ব'লে কোন বড় রকমের দুশমনী কিছু করবেন ব'লে মনে হয় না। তুমি একটু বেশী ভীতু।'

কিন্তু বিশাখার মুখের ভীতিপাণ্ডুরতা কিছুতেই যায় না। সে তেমনি নিচু মিনতিভরা গলাতেই বলে, 'জোর ক'রে হেসে উড়িয়ে দিও না শাহ্‌জাদা। আমার বাবাকে তুমি চেনো না। প্রচণ্ড রাগ ওঁর। উনি রেগে গেলে ঠাকুর্দামশাই ছাড়া ওঁর সামনে কেউ যেতেই সাহস করে না। সেদিন তোমার কথা নিয়েই ঠাকুর্দামশাইয়ের সঙ্গে কী কথা-কাটাকাটি হয়েছিল, তার পরই ঘন মেঘের মতো অন্ধকার মুখ ক'রে কোথায় চলে গিয়েছিলেন—একেবারে ফিরলেন এই তিনদিন পরে। কে জানে, আমার কেবলই মনে হচ্ছে তোমার দুশমনদের সঙ্গেই কোন ষড়যন্ত্র ক'রে এলেন তিনি।…না না, তুমি অমন ক'রে হাত-পা ছেড়ে বসে থেকো না শাহ্‌জাদা, দোহাই তোমার, এখনও হয়ত সময় আছে, এখনও হয়ত চেষ্টা করলে এদের বিদ্বেষের বাইরে যেতে পারবে।'

এবার বাহ্‌রামের মুখের হাসি সত্যি-সত্যিই মিলিয়ে গেল, সে জায়গায় ফুটে উঠল একটা করুণ বিষণ্ণতা।

কান্নার চেয়েও করুণ ম্লান হেসে বলল, 'কিন্তু কোথায় যাব বিশাখা বলতে পার? একেবারে সহায়-সম্বলহীন, তোমাদের দয়ায়, বলতে গেলে ভিক্ষাতে দিন কাটছে। হাতিয়ার নেই, সওয়ার নেই, পয়সা নেই। আমি রাজার ছেলে —সাধারণ চাষীর ছেলে হ'লে জন-মজুরী খাটতে পারতুম, লোকে সহজে আশ্রয়ও দিত। আমার পিছনে শক্তিশালী বাদশার শত্রুতা সর্বদা তাড়া করছে। তার ওপর আমি বিধর্মী, বিধর্মী লোককে কেউ প্রীতির চোখে দেখে না কখনও। অকারণেই বিদ্বিষ্ট হয়ে ওঠে। কোথায় যাব, কে আশ্রয় দেবে? রাজার আশ্রয় রাজা, পরাজিত পলায়িত রাজা বা রাজপুত্র অন্য রাজার আশ্রয়েই আবার শক্তি সঞ্চয় করে। আমার ভাগ্যে যে তাও নেই। যে আশ্রয় দিলে সেই-ই বিশ্বাসঘাতকতা করলে। তা নইলে, ক'জন অনুচরও অন্তত যদি থাকত, পালাতে পারতুম অন্য কোথাও। এমন অসহায় হ'তে হ'ত না। আজও সেই রাজার রাজত্বেই আছি—এর বাইরে না গেলে তো নিজের পরিচয়টা পর্যন্ত দিতে পারব না।'

'তা হ'লে এর বাইরেই চলে যাও। শুনেছি দিল্লী আজমেরের রাজা খুব পরাক্রান্ত বীর, দুর্ধর্ষ যোদ্ধা. তিনি নাকি কাউকেই ভয় করেন না—এক ধর্ম ছাড়া। তাঁর কাছেই গিয়ে আশ্রয় প্রার্থনা করো না। নইলে কনৌজ আছে, গুর্জর আছে—কোন্‌দিকে তা জানি না, তবে এদেরও খুব নাম শুনেছি। সবাই অধার্মিক নয়। কেউ না কেউ আশ্রয় দেবেই—তুমি কোনমতে সেই সব দেশে পালিয়ে যাও।'

'কী ক'রে যাব ? হেঁটে কতদূর যাব ? পথও চিনি না। সীমানা পার হবার আগেই ধরা পড়তে হবে। সে হয় না বিশাখা, অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে।'

করুণ বিষণ্ণ কণ্ঠে বললে বাহ্‌রাম। তার সমস্ত ভঙ্গীতে একটা হতাশা, নিদারুণ অসহায়তা ফুটে উঠল।

বিশাখা মাথা হেঁট ক'রে চলে গেল। তার দুচোখে জল ভরে এসেছিল। বোধহয় সেই জল গোপন করতেই একরকম ছুটে পালিয়ে গেল সে।

॥ আট ॥

বিশাখা আবার দেখা দিল একেবারে শেষরাত্রে।

সন্ধ্যায় খাবার দিতে আসে নি সে।

সূর্যপ্রসাদও আসে নি।

কে এক অন্তঃপুরিকা দীর্ঘ অবগুণ্ঠনে পরিচয় আবৃত ক'রে একবার এসে খাবার ও জল দরজার বাইরে থেকে চৌকাঠের এধারে নামিয়ে রেখেই চলে গিয়েছিল।

আজকাল কেউ সন্ধ্যা দিতেও আসে না। প্রদীপ তেল ও চকমকি ওর ঘরেই থাকে। ইচ্ছে হ'লে জেলে নেয় বাহ্‌রাম।

ওরা ভাইবোন কেউই না আসাতে অন্তরকম ভেবেছিল সে। একটু শঙ্কিতই হয়েছিল ওদের জন্তে।

আর সেই সঙ্গে নিজের জন্তেও। ভেবেছিল বৃন্দাপ্রসাদ ছেলেমেয়েদের নজরবন্দী করেছে ওর প্রতি তাদের পক্ষপাত লক্ষ্য ক'রে—সম্ভবত তাকে বন্দী বা হত্যা করবারই ভূমিকাস্বরূপ।

তবু পালাবার বা আত্মরক্ষা করার চেষ্টা করে নি সে। হতাশা একরকমের মরীয়া ভাব এনে দেয় মানুষের মনে—সেই ভাবেই যেন ভাগ্যের কাছে আত্ম-সমর্পণ ক'রে নিশ্চিন্ত হয়েছিল সে। খোদা যতদিন পরমায়ু ঠিক ক'রে দিয়েছেন,

যে ক'দিন এই পৃথিবীর রূপ-রস-গন্ধ-আলো তার ভাগ্যে আছে, আছে যে ক'দিনের আহার-নিদ্রা বরাদ্দ—তা থেকে কেউ তাকে বঞ্চিত করতে পারবে না, তা সে জানে।

তারপর?

তার পরের কথা নিয়ে আর মাথা ঘামাতে পারে না সে। যা হয় হবে। এই দুশ্চিন্তা, এই অপমান, প্রাণরক্ষার জন্যে এই প্রাণান্ত আর ভাল লাগে না। ভাগ্যকে যেন তুড়ি মেরে পরিহাস ক'রেই—'তোমার যা সাধ্য, যতদূর সাধ্য করো গে,' মনে মনে এই কথা বলেই নিশ্চিন্ত আলস্যে গা এলিয়ে দিয়েছিল।

এই মনোভাবের জন্যই কপাটে সেদিন আগলটাও দেয় নি সে। সামান্য খিল—একটু আঘাতেই ভেঙে যাবে—লাগিয়ে লাভ কি? এটা লাগানো হ'ত ছোটখাট পাহাড়ী জন্তুদের সম্ভাব্য আক্রমণ রোধ করতেই—আজ আর তাদেরও ভয় করে না বাহ্‌রাম।

জন্তুরা মানুষের চেয়ে, মানুষের মতোও হিংস্র নয়—এই অল্প বয়সেই এ অভিজ্ঞতা হয়েছে তার।

খিল দেওয়া ছিল না বলেই বিশাখার আগমনও সে টের পায় নি। বিশাখার এ একটা ভয়ই ছিল। সামান্য হাতের ঠেলায় দরজা খুলে যেতে সে ভয়টা থেকে যেমন নিশ্চিন্ত হয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল, তেমনি আর একটা নিদারুণ আতঙ্কে বুক কেঁপে উঠল তার—নিমেষের মধ্যে হাত-পা অসাড় হয়ে গেল। বিছানার দিকে চাইতেও সাহসে কুলোল না। অবশেষে আর সময় নেই বলেই কতকটা মরীয়া হয়ে চেয়ে দেখল সে।

কিন্তু না, মিছে ভয় তার। পাহাড়ের আড়ালে ঢলে-পড়া চন্দ্রের শেষ আভা নির্মেঘ আকাশে এবং তুষারমৌলি পর্বতশিখরে প্রতিফলিত হয়ে যেটুকু আলোর সৃষ্টি করেছিল তাইতে দেখা গেল, বাহ্‌রাম গাঢ় ঘুমে অচেতন।

বিশাখা ভুলে গেল সব নিষেধাজ্ঞা, জোর ক'রে ঝেড়ে ফেলে দিল সব সঙ্কোচ। বিছানার কাছে গিয়ে বাহ্‌রামের গা ঠেলে চাপা গলায় ডাকল, 'শাহ্‌জাদা, শাহ্‌জাদ', ওঠো! কী আশ্চর্য! এমন বিপদের দিনেও কী ক'রে এমন ঘুমোতে পারো তুমি! ওঠো! ওঠো! উঠে বোস। আর যে মোটে সময় নেই। এমন সময়ও তোমার যদি না ঘুম ভাঙে তো কী করব!'

বাহ্‌রামের ঘুম ভাঙলেও বিশ্বাস হ'তে চাইল না বাস্তব অবস্থাটা। তার মনে হ'ল স্বপ্নই দেখছে সে। হয়ত স্বপ্নই দেখছিল সে এই পর্বতবাসিনী কিশোরীকে। হয়ত আজও তার স্বপ্নে তার কিশোরী বধূ আর এই পার্বতী

এক হয়ে গিয়েছিল। সেই মধুর স্বপ্নেরই রেশ এখনও তার চোখে তার চৈতন্যে লেগে রয়েছে বলে মনে হ'ল। কারণ এ সৌভাগ্য যে অচিন্তনীয়, কল্পনাতীত।

বিহ্বল স্বপ্নালু দৃষ্টিতে চেয়ে আছে বাহ্‌রাম, অসহিষ্ণু বিশাখা আবারও ঠেলা দিল, 'ওঠো, ওঠো। তুমি উঠে দাঁড়াও—তোমার পায়ে পড়ি। আমি যে আর ভাবতে পারছি না। যে কোন মুহূর্তে যে ওরা এসে পড়তে পারে!'

এবার বাহ্‌রামের আর সন্দেহ রইল না। কিন্তু বিপদের চেয়ে—সর্বনাশা ভবিষ্যতের চেয়ে—এই অত্যাশ্চর্য স্বপ্নাতীত বর্তমানই তার কাছে বড় হয়ে উঠল।

সে সজোরে বিশাখার হাত চেপে ধরে বললে, 'বিশাখা তুমি এসেছ! তোমাকে তা'হলে ওরা বন্দী করতে পারে নি? আঃ, বাঁচলাম!'

তারপর নিজের হাতের মধ্যে ধরা একমুঠো জাফরান ফুলের মতো সেই নরম হাতদুটোতে আর একটু চাপ দিয়ে বললে, 'কিন্তু কী আশ্চর্য! তুমি আমাকে ছুঁলে যে বড়! আমার যে বিশ্বাসই হচ্ছে না—তোমাকে কি সত্যিই হাত দিয়ে ধরতে পেরেছি!'

চাপা কান্নার আর্তস্বরের সঙ্গে আকুলতা মিশে অদ্ভুত একটা স্বর বেরোল বিশাখার কণ্ঠ দিয়ে: সে আবার অসহিষ্ণু মিনতির সঙ্গে বলল, 'আঃ, কী ছেলেমানুষি করছ শাহ্‌জাদা! সময় যে একেবারে নেই। তোমার জন্যে ভেবে ভেবে আমার যে মাথা খারাপ হ'তে বসল। তুমি কি কিছুই করবে না—একটু ভাববারও চেষ্টা করবে না অবস্থাটা?'

'কিন্তু—তাই তো! তুমি অমন ভাবে—অন্ধকারে, শেষ রাত্রে—! সত্যিই তো, সেইটেই আমার ভেবে দেখা উচিত ছিল। ব্যাপার কি বল তো? আর তার আগে, যদি ছুঁয়েইছ তো, একটু এখানে বোস।'

টেনে, একরকম জোর ক'রেই, বিছানার একপাশে বসায় ওকে বাহ্‌রাম।

খুব একটা বাধা দেয় না বিশাখাও। এমন কি হাতদুটো যে এখনও বাহ্‌রামের হাতের মধ্যে বন্দী, তাও বোধহয় তার মনে পড়ে না।

'ব্যাপার কি বল তো?' আবারও প্রশ্ন করে বাহ্‌রাম।

বিশাখা তখন কাঁপছে, বাতাস লাগা বেতসপাতার মতো। সে কি শুধুই দুশ্চিন্তা, শুধুই ভয়?

নাকি একটা অজানা উত্তেজনাও?

বালিকা বয়সে যে উত্তেজনা, যে অনুভূতির কারণ জানার কথা নয়—তবু যা মাঝে মাঝে অনতিক্রান্ত বাল্যেও অনুভব করে কেউ কেউ?—যা বয়স-পাত্র বিচার করে না, সময়ের পরিমাপ দিয়ে যা মাপা যায় না?

সে কাঁপন বাহ্‌রামও অনুভব করে।

আর এ বুঝি তার একেবারে অপরিচিতও নয়।

তার বালিকা বধূর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের দিনগুলিতে ঠিক এমনই কম্পন, মুঠোর-মধ্যে-ধরা নরম হাত দুটিতে এমনই স্বেদার্দ্রতা অনুভব করেছে সে।

সে বিশাখার আর একটু কাছে সরে এসে বসে। জোর ক'রে আশ্বাসের সুর টেনে এনে বলে, 'ভয় কি? এখনও তো আমি আছি তোমার পাশে। যতক্ষণ আমার জ্ঞান থাকবে, যতক্ষণ একফোঁটা রক্ত থাকবে আমার দেহে— তোমার কোন ক্ষতি কেউ করতে পারবে না।'

এত উদ্বেগের মধ্যেও হাসি পায় বিশাখার।

যেন সে নিজের বিপদের কথাই ভাবছে।

আর এই ম্লান মধুর হাসির মধ্যেই যেন কেমন ক'রে একটু শক্তি সঞ্চয় করে সে।

আর সময়ও যে নেই মোটে। যেমন ক'রেই হোক এ দুর্বলতা দূর করতে হবে।

কাঁপা গলায়, আস্তে আস্তে থেমে থেমে কথাটা বলে বিশাখা।

দুপুরে এখান থেকে চলে গিয়েছিল সে—কিন্তু শুধুই নিভৃতে চোখের জল আর অসহায় দীর্ঘনিশ্বাস ফেলতে নয়। সে সূর্যপ্রসাদের কাছে কান্নাকাটি ক'রে হাতে-পায়ে ধরে তাকে পাঠিয়েছিল গ্রামের বাইরে—রাজধানী থেকে আসবার প্রধান রাস্তাটা পর্যন্ত এগিয়ে দেখে আসতে।

সূর্যপ্রসাদ যজ্ঞের কাঠ কেটে আনবার নাম ক'রে ঠাকুর্দার কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে বেরিয়েছিল—কিন্তু সেই জন্যই ঘোড়া নিয়ে যেতে পারে নি। যজ্ঞের কাঠ অশ্বপৃষ্ঠে বোঝাই দিয়ে নিয়ে আসার নিয়ম নেই এ বাড়িতে—হেঁটে গিয়ে কাঁধে ক'রে আনতে হয়—সেই পৌরাণিক যুগের মতোই। পৌরাণিক কাহিনী শুনিয়ে উদাহরণ দিয়ে বিষ্ণুপ্রসাদ বলেন তাদের, এটা ব্রাহ্মণদের কর্তব্য।

সুতরাং যেতে-আসতে তার বহু সময় কেটে গেছে। সন্ধ্যার পর ফিরেছে সে। তাও তখনই কিছু বিশাখাকে সংবাদটা দিতে পারে নি। চারিদিকে বহু পরিজন। সকলের সামনে ভাইবোনে গোপনে কথা কইলে স্বভাবতই তাদের সন্দেহ জাগত।

গভীর রাতে শুতে যাবার সময় খবরটা দিয়েছে সূর্যপ্রসাদ।

শুধু দেখেই আসে নি—শুনেও এসেছে অনেক। ছিপছিপে কিশোর

সূর্যপ্রসাদ গাছের আড়ালে আড়ালে আত্মগোপন ক'রে একেবারে তাদের পিছনে চলে গিয়েছিল। চীরপাতায় পায়ের মচমচানি জাগে না, তাছাড়া খুবই লঘু পায়ে গিয়েছিল সে।

এই পর্যন্ত সংবাদ দিয়ে একটু থামল বিশাখা।

থেমে থেমে থিতিয়ে থিতিয়ে বলতে অনেকটা সময় লেগেছে তার।

একটু নিঃশ্বাসও বুঝি সঞ্চয় করা দরকার।

কিন্তু ইতিমধ্যে বাহ্‌রামও কিছুটা অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে।

আসন্ন বিপদের গুরুত্ব সে আব্‌ছা অস্পষ্ট কাহিনী থেকেই খানিকটা অনুমান করতে পেরেছে—পেয়েছে বড় রকমের একটা ঝঞ্ঝার পূর্বাভাস।

বিশাখা থামতেই সে অধীরভাবে বলে উঠল, 'কিন্তু কি দেখল আর কাকে দেখল সেইটেই আগে বলো—তবে তো বুঝব।'

'বলছি শাহ্‌জাদা। আর দেরি হবে না।—রাজা বিজয়দেবের একদল সিপাহী—অন্তত পঞ্চাশ জন হবে—গ্রামের বাইরে ঐ জঙ্গলটায় এসে বসে আছে আজ সকাল থেকেই।—খুব সম্ভব তারা বাবার সঙ্গেই এসেছে। এখন বুঝতে পারছি—বাবা সেদিন সোজা রাজধানীতেই গিয়েছিলেন, রাজাকে তোমার খবর দিয়ে এসেছেন। তোমার দুশমন সেই বাদশা—কী যেন নাম—ঘুরের মহম্মদ-বিন-সাম—তাকে আরও খুশী করার এমন সুবর্ণ সুযোগ কি রাজা ছাড়তে পারেন? তিনি বোধহয় তৎক্ষণাৎ বাবার সঙ্গেই সিপাইগুলোকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। দাদা যা শুনেছে, তাতে এই বুঝেছে যে, এত কাণ্ড ক'রে ওদের ডেকে আনলেও সোজা তখনই ওদের সঙ্গে ক'রে এনে তোমাকে ধরিয়ে দেবার সাহস বাবার হয় নি। বাবা সময় নিয়েছেন ওদের কাছে। আজ ভোরে ঠাকুর্দা যখন স্নান ক'রে কেশবজীর মন্দিরে যাবেন—সেই সময় বাবা কী ইশারা করবেন, ওরা এসে আমাদের বাড়ি ঘেরাও ক'রে তোমাকে ধরে নিয়ে যাবে। বাবা সেই সময়টা আর বাড়ি থাকবেন না—তিনিও ওদের আসবার ইঙ্গিত দিয়েই স্নান করতে চলে যাবেন ঝরণায়।'

বলতে বলতে শেষের দিকে ক্ষোভে, লজ্জায়, আশঙ্কায় গলা বুজে এসেছিল বিশাখার—এই পর্যন্ত বলে কান্নায় ভেঙে পড়ল সে।

বাহ্‌রাম খবরটা শুনতে শুনতে যেন পাথর হয়ে গিয়েছিল।

কী ভাবছিল, কিছু ভাবছিল কিনা—তা সে যেন নিজেও তখন জানে না, এখন বিশাখার চোখের জলে তার সম্বিৎ ফিরে এল।

সে পরম স্নেহে বিশাখাকে জড়িয়ে ধরে একেবারে পাশে টেনে নিয়ে বললে,

'ছিঃ বিশাখা, তুমি কেঁদো না অমন ক'রে—তাহলে যে আমি কিছুই করতে পারব না, নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টাও না।'

'ঠিক বলেছ। না, কাঁদবার সময় নেই।'

চোখ মুছে বিশাখা ওর বাহুবন্ধন ছাড়িয়ে একেবারে উঠে দাঁড়ায়। স্নেহাস্পদ বন্ধুর গুরু বিপদে বালিকা যে কখন নারী হয়ে উঠেছে, তা বোধ করি সে নিজেও টের পায় নি।

'কাঁদিও নি তো এখনও পর্যন্ত, খবরটা শুনে বসেও থাকি নি।' বিশাখা যেন ব্যস্ত কাজের মানুষ হয়ে ওঠে অকস্মাৎ, 'শোন—দাদাকে বলে রাজী করিয়েছি। গ্রামের পিছন দিকে একটা পথ আছে, ঝরণা পেরিয়ে বনের মধ্যে দিয়ে খানিকটা গেলেই সে পথ পাবে—ঐ বড় পাহাড়টার কোল দিয়ে চলে গেছে সে রাস্তা। কোনমতে বিশ ক্রোশ পেরিয়ে যেতে পারলেই এ রাজ্যের সীমানা শেষ, গাড়োয়ালের সীমানা শুরু। গাড়োয়ালের রাজা দিল্লীর রাজার আশ্রিত। ওখানে গিয়ে তোমাকে ধরতে সাহস করবে না আমাদের রাজা। সবাই ঘুমোলে আস্তাবল থেকে দুটো টাট্টু বার ক'রে আমরা তাদের ক্ষুরে ছেঁড়া-কাপড় বেঁধে নিঃশব্দে নিয়ে গিয়ে নদী পার ক'রে রেখে এসেছি। একটা টাট্টুর পিঠে ঝোলায় শুখা রুটি, কিছু শুখা ফল আর কিছু মাওয়া* রাখা আছে। জল পথেই পাবে। দাদা তোমাকে পাহাড়ের কোল পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসবে গোপনে। ফেরার সময় নদীর ওপারেই টাট্টু ছেড়ে দিয়ে সে ঘুরে এধার দিয়ে আসবে, মানে, সে যে সঙ্গে গিয়েছিল তা কেউ টের পাবে না। তাছাড়া, সন্দেহ হ'লেও দাদাকে বাবা বিশেষ কিছু বলতে পারবে না, ঠাকুর্দার ভয় তো আছেই, তাছাড়া বাবা এ পৃথিবীতে যদি কাকেও ভালবাসে তো, সে তাঁর ঐ ছেলেটিকে। তাছাড়া সে-ই তাঁর একমাত্র বংশধর, জলপিণ্ড দেবার লোক। তার কোন ক্ষতি করবেন না তিনি—।'

কথাটা বলতে বলতেই স্তব্ধ হয়ে থেমে যায় বিশাখা।

দুজনের কানেই একসঙ্গে পৌঁছেছে শব্দটা—খুব দূর থেকে এলেও নিবাত নিস্তব্ধ নিশীথে শব্দটা স্পষ্টই শোনা গেল—কোথায় একটা ভোরাই পাখী ডাকতে শুরু করেছে।

'চল চল, আর একদম সময় নেই। বাবা এখনই উঠে পড়বেন। ঐ ছাখ, ভোরাই বাতাসও উঠেছে। রাত আর মোটে নেই। ইস্—আরও ঢের আগেই বেরনো উচিত ছিল!'

---

* শুষ্ক ক্ষীর। যাকে খোয়া ক্ষীর বলে।

'চল' বলে উঠে দাঁড়ায় বাহ্‌রাম। এখানে তার নিজস্ব বলতে বিশেষ কিছু নেই। যে পোশাকটা পরে আছে সেটাও বিষ্ণুপ্রসাদের দেওয়া। নেবার কিছু নেই—পিছন পানে চাইবার মতো কিছুই পড়ে থাকবে না। তবু এই ঘরটা যেন বড়ই প্রিয় হয়ে উঠেছে গত ক'মাসেই। অন্ধকারে যতটা দেখা যায়, একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে আবারও একবার 'চল' বলে পা বাড়াল বাহ্‌রাম।

একটা ছোট দীর্ঘনিশ্বাস আপনি বেরিয়ে এল বুক থেকে। আর সেই নিশ্বাসের শব্দ আর-একটি কোমল কচি বুকে তরঙ্গ তুলে সেই বুকের অধি-কারিণীর দুই চোখে ক্ষণিকের জন্য একটা বাষ্প সৃষ্টি করল। কুয়াশাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে পথ খুঁজে চলতে গিয়ে দরজার কাছের ক্ষীণ আলোটা ভাল ক'রে নজর পড়ল না। অর্থাৎ সোজা পথটা দেখতে পেল না, একটা কপাটে ধাক্কা খেল বিশাখা। সামান্য একটু শব্দও উঠল। সে শব্দে দুজনেই কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে গেল নিমেষের জন্য। সামান্য শব্দও অসামান্য প্রতিধ্বনি সৃষ্টি করে এখানে এ সময়ে।

কিন্তু তখন আর সত্যিই সময় নেই। বাহ্‌রাম ব্যাপারটা বুঝে হাত বাড়িয়ে আন্দাজে ওর হাতটা ধরে বাইরে বার ক'রে নিয়ে এল।

বাড়ির বাইরে বেরিয়ে বাগান। গাছের তলা দিয়ে দিয়ে ঘুরে পিছন দিকে যেতে হবে। বাইরের দিকের রাস্তা নিরাপদ নয়। কিন্তু বাগানের পথেও শুকনো আখরোট ও 'সেব্‌' গাছের পাতা বিছানো। পা পড়লেই মচ মচ শব্দ হয়। এ সম্ভাবনা বুঝে নদীতীর থেকে ফেরবার পথেই যতটা সম্ভব শুক্‌নো পাতাগুলো পথ থেকে তুলে ফেলে দিয়ে এসেছিল বিশাখা। কিন্তু হিমালয়ের কোলে এসব পাহাড়ী অঞ্চলে ভোরের বাতাস বড় প্রবল হয়। ইতিমধ্যেই আবার বহু পাতা উড়ে এসে পড়েছে। অন্ধকারে দেখাও সম্ভব নয় যে বাঁচিয়ে চলবে। অবশ্য দুজনেরই খালি পা—যতটা সম্ভব লঘু পায়েও চলছিল ওরা—তবু একেবারে নিঃশব্দে যাওয়া সম্ভব হচ্ছিল না কিছুতেই।

অনেকটা আসবার পর, বিষ্ণুপ্রসাদের বাগানের সীমানা থেকে বহুদূরে এসে, একবার থমকে দাঁড়াল বাহ্‌রাম।

এতক্ষণ ঘাড় হেঁট ক'রে নিঃশব্দে ছুটেছে ওরা—পশুর মতো সমস্ত চিন্তাশক্তি যেন একটা আতঙ্কে ছিল স্তব্ধ; একটি মাত্র, অর্থাৎ নিরাপত্তার চিন্তাতে ছিল আচ্ছন্ন। এইবার প্রশ্নটা মনে জেগেছে ওর, যা অনেক আগেই জাগা উচিত ছিল। কিন্তু উদ্বেগে, উত্তেজনায় ও দ্রুত হাঁটার পরিশ্রমে দুজনেরই ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে, হাপরের মতো। কথা কওয়াই কষ্টকর। তাই দুটি তিনটি শব্দে মাত্র প্রশ্নটা সীমাবদ্ধ রাখতে হ'ল—যদিও তাতেই বোঝাল ঢের

—'কিন্তু বিশাখা, তুমি?'

বিশাখারও তখন কথা বলার শক্তি নেই। উত্তর দেবার পূর্বে কয়েক মুহূর্ত থামতে হ'ল দম নেবার জন্ত। ওড়নার প্রান্তে ললাট ও চোখের কোলের স্বেদবিন্দুগুলো মুছে নিতে নিতে অবশেষে অতিকষ্টে বললে, 'আমি—আমার জন্যে ভয় নেই শাহ্জাদা—আমি এখনই ফিরে আসব। তোমাকে ওপারে পৌঁছে টাট্টুতে তুলে দিয়েই চলে আসব। আমাকে কেউ দেখতে পাবে না।······কিন্তু তুমি আর দাঁড়িও না—চল। এখনও বেশ খানিকটা পথ যেতে হবে—'

তবুও বাহ্রাম নড়ল না। বললে, 'কিন্তু, সত্যিই তুমি নিরাপদে ফিরতে পারবে তো? কোন বিপদ হবে না? না হয় তুমি এখান থেকেই ফেরো—আমি ঠিক চলে যেতে পারব।'

'আঃ শাহ্জাদা, ছেলেমানুষী ক'রো না। চল চল। আমি ঠিক থাকব।'

চলতে চলতেই তবু আর একটা প্রশ্ন করে বাহ্রাম—বোধ করি তার অন্তরের সবচেয়ে বড় প্রশ্ন সেটা এই মুহূর্তে—'কিন্তু আর কি কোনদিন আমাদের দেখা হবে না বিশাখা? তোমাকে আর কোনদিন দেখতে পাব না? তোমার—তোমার মন-কেমন করবে না আমার জন্যে?'

'হয়ত করবে, কিন্তু তুমি বেঁচে আছ, নিরাপদে আছ—এইটেই আমার বড় কথা। এটা জানলেই আমি শান্তিতে থাকব।···আর তুমি—যদি কোনদিন আমার কথা মনে পড়ে তো—এইটেই মনে ক'রো যে যতদিন আমি বাঁচব, যেখানেই থাকি যেমনই থাকি—নিত্য কেশবজীর কাছে তোমার জন্যে দীর্ঘ পরমায়ু ও সুখ-শান্তি প্রার্থনা করব।'

বলতে বলতেই আবার ওর চোখে জল এসে পড়ল।

কিন্তু থামবার আর অবসর নেই, চোখটা মুছে নেবারও না। বাষ্পাচ্ছন্ন চোখে ছুটে চলতে গিয়ে বড় একটা পাথরে হোঁচট লাগল। এবার নিজেই হাত বাড়িয়ে বাহ্রামের হাতটা চেপে ধরে সামলে নিল বিশাখা।

ভোরের আলো ফুটে উঠেছে—আর একটুও দেরি করা উচিত নয়। দু'জনে প্রায় দৌড়েই চলল নদীর দিক লক্ষ্য ক'রে।

হে কেশবজী, যেন নিরাপদে ওকে পৌঁছে দিতে পারি ওপারে। যেন ঠাকুর্দার আতিথেয়তার সুনামে কালি না লাগে!

যেতে যেতে প্রাণপণে ডাকতে লাগল বিশাখা, এ গ্রামের পুরদেবতা ললিতা কেশবকে।

॥ নয় ॥

ভোরাই পাখীর ডাক শোনার সঙ্গে সঙ্গে বিশাখার বড় যে ভয়টা হয়েছিল—বাবার ঘুম ভাঙবার—সেটা সম্পূর্ণ অমূলক। কারণ, বৃন্দাপ্রসাদও ওদের মতো জেগেই ছিল সেদিন সমস্ত রাত।

রাগের মাথায় যারা কোন অসৎ কাজ ক'রে ফেলে, তারা রাগটা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই অনুতপ্ত হয়। কিন্তু বৃন্দাপ্রসাদ আদৌ অনুতপ্ত নয়। তার কারণ রাগ তার তখনও পড়ে নি বিন্দুমাত্রও।

তাছাড়া, সে যেটা করেছে সেটাকেও অসৎ কাজ বলে মনে হয় নি তার তখনও পর্যন্ত।

যা উচিৎ, যা সঙ্গত তাই করেছে সে। তার বৃদ্ধ বাবা মোহগ্রস্ত হয়ে একটা বিষম অসঙ্গত কাজ করছেন, তারই প্রতিকারের জন্য সক্রিয় হয়েছে মাত্র।

আর সেই সক্রিয়তাই তাকে ঘুমোতে দেয় নি সেদিন।

তাছাড়াও—একটা বিরাট দায়িত্বও তার কাঁধে এসে চেপেছে।

রাজা তার কথা শোনামাত্র সঙ্গে অতগুলো সিপাহী দিয়েছেন, কিছুমাত্র দ্বিধা করেন নি। তেমনি এ-ও তাকে বলে দিয়েছেন, যে, যদি বৃন্দাপ্রসাদের কথা সত্য প্রমাণিত হয় তাহ'লে ভালই—যথাসময়ে প্রচুর পুরস্কার পাবে সে—আর যদি তা না হয় তো মালিক বাহ্‌রামের পরিবর্তে তাকেই বেঁধে নিয়ে যাবে সিপাহীরা।

এবং বাহ্‌রামের থেকে একটু ভিন্ন ব্যবস্থার কথাও শুনিয়ে দিয়েছেন রাজা বিজয়দেব তখনই। বাহ্‌রামকে ধরে আনলে বন্দী ক'রে পাঠানো হবে মুহম্মদ ঘুরীর কাছে—বৃন্দাপ্রসাদকে ধরে আনলে সোজা মশানে। একেবারে শূলদণ্ড ব্যবস্থা।

সুতরাং ভয়ও একটা ছিল বৈকি। প্রবল ভয়।

একটা ভালরকমের নৈতিক প্রচেষ্টা যে এমনভাবে নিজের জীবন-মরণ সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে, তা আগে কল্পনাও করতে পারে নি বৃন্দাপ্রসাদ। এ রকম জানলে হয়ত ক্রোধ প্রশমনের অন্য উপায় খুঁজত। হয়ত সোজাসুজি নিজেই কিছু একটা করত। অন্য কোন প্রতিকারের কথা চিন্তা করত। অন্তত দু'বার অগ্রপশ্চাৎ ভাবত। কিন্তু এখন আর ফেরার পথ নেই। হাতের পাশা আর মুখের কথা—একবার বেরোলে আর তাকে ফেরানো যায় না।

যখন রাজদরবারে গিয়েছিল, তখন ওর মনের তার খুব উঁচু সুরেই বাঁধা ছিল। ও যাচ্ছে অন্যায়ের প্রতিকার করতে, যাচ্ছে রাজাকে উপকৃত করতে।

কিন্তু সেই অতিশয় সৎ-প্রচেষ্টা যে এমনভাবে ওর ওপরই এসে পড়বে, বিষময় ফলের বিভীষিকা নিয়ে, তা কে জানত!

যাই হোক, এখন প্রাণের ভয়টাই প্রবল। বিজয়দেবের ক্রোধী স্বভাব সর্বজনবিদিত—তাঁর হুকুম বদলাবে না। সুতরাং ছেলেটাকে ধরিয়ে দিতে না পারলে শূল অনিবার্য। বরং সেটা রাজার হুকুমে যতটা সম্ভব যন্ত্রণাদায়কই হয়ে উঠবে।

তাই একদিকে নিজের ব্যক্তিগত আক্রোশ, অপরদিকে নিদারুণ উৎকণ্ঠা বৃন্দাপ্রসাদকে ঘুমোতে দেয় নি। ঘুমোবার বৃথা চেষ্টাও করে নি সে। সোজাসুজি জেগে বসেই ছিল—উৎকর্ণ হয়ে।

আর ঘুমোতে পারে নি বলেই ছেলেমেয়ের ষড়যন্ত্রও তার অবিদিত ছিল না।

সূর্যপ্রসাদ আর বিশাখা যত নিঃশব্দেই আস্তাবল থেকে টাট্টু বার করবার চেষ্টা করুক, সামান্য একটু শব্দ—অন্তত মাটিতে খালি পা ঘষার শব্দও হয়েছে।

আর সেই নিবাত পার্বত্যরাত্রির নিঃসীম স্তব্ধতায় সেইটুকু শব্দই যথেষ্ট, বিশেষত উৎকণ্ঠ অতন্দ্র বৃন্দাপ্রসাদের সদাসতর্ক কানের পক্ষে। সে শুনেছে, কিন্তু বাইরে আসে নি—ঘরের জানালা খুলেই দেখেছে ওদের গতিবিধি। এবং এই গোপনচারীদের উদ্দেশ্যও বুঝতে বিলম্ব হয় নি একটি মুহূর্তও।

তখনই একটা কিছু বীভৎস কাণ্ড ক'রে বসবার কথা।

কিন্তু ক্রোধ যখন স্বভাবের শেষ সীমাও ছাড়িয়ে যাবার উপক্রম করে তখন নতুন এক ধরণের স্থৈর্য লাভ করে মানুষ।

বৃন্দাপ্রসাদও সেই আশ্চর্য স্থৈর্য লাভ করল। বরং এদের সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করার মধ্যে একটা পৈশাচিক উল্লাস বোধ করতে লাগল।

শেষ মুহূর্তে—একেবারে সব আয়োজন সম্পূর্ণ হওয়ার পর ওদের সাধে বাদ সাধবে সে!···

তারপর থেকে ওরা আর বৃন্দাপ্রসাদের নজর ছাড়া হয় নি।

ওদের পিছু পিছু যায় নি সে, যাবার প্রয়োজন হয় নি। কোন্‌পথে এ ঘোড়া গেল, আর কী এদের লক্ষ্য, তা বুঝে নিয়েছে বৃন্দাপ্রসাদ। ওর দৃষ্টির বাইরে যাওয়া মাত্র সে নিজের ঘরের দরজা খুলে প্রাণপণ-নিঃশব্দে বার হয়ে এমন একটা জায়গায় গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে—নিজেদের গৃহদেবতার মন্দিরের ওপর—যেখান

থেকে বাহ্‌রামের ঘর, ছেলেমেয়েদের গন্তব্য পথ, এমন কি নদীতীর পর্যন্ত পরিষ্কার লক্ষ্য চলে।

অত দূর থেকে বাহ্‌রাম ও বিশাখার কথাবার্তা সে কিছু শোনে নি বটে, কিন্তু বিশাখার দীর্ঘকাল ওর ঘরে থাকা আর হাত ধরে বেরনোই কন্যার মনোভাব ও সম্ভাব্য কার্য-কারণ উপলব্ধির পক্ষে যথেষ্ট।

বৃন্দাপ্রসাদ সেই নির্জন অন্ধকারে শব্দহীন আনন্দহীন একপ্রকারের অদ্ভুত হাসি হেসেছিল।

সে হাসি সাংঘাতিক সংকল্প-দ্যোতক। নিষ্ঠুর, নিষ্করুণ, কঠিন হাসি।

ওরা চোখের বাইরে চলে গেলে আর অপেক্ষা করে নি বৃন্দাপ্রসাদ। ঘরে গিয়ে খাপে-ঢাকা তলোয়ারখানা বার ক'রে আনতেও বেশী সময় লাগে নি। তারপর ওদের এগিয়ে যাবার জন্য আরও খানিকটা সময় দিয়ে অপর একটা সরল সোজা পথে রওনা দিয়েছিল নদীর দিকে।

এদিককার বন-জঙ্গল ওর নখদর্পণে, জীবনের চল্লিশ বছর সময়ের মধ্যে এই গ্রামের বাইরে মোট একমাস কালও কাটায় নি বোধহয়, সুতরাং পায়ে-হাঁটা পথ ওর দরকার লাগে না। বনের মধ্যে দিয়েই স্বচ্ছন্দে যেতে পারে।

আর এদিক দিয়ে গেলে ওরা যতই আগে যাক—এই সংক্ষিপ্ত পথে ঠিক ঘোড়ায় চড়বার সময়টিতেই গিয়ে পৌঁছতে পারবে—বৃন্দাপ্রসাদ তা জানে।

সে আরও একবার হেসে উঠল। তেমনি শব্দহীন আনন্দহীন হাসি।

তবে তৃপ্তির হাসি বলা যায়।

যেন ভয়ঙ্কর বৈরনির্যাতন সফল হওয়ার তৃপ্তি লাভ করেছে সে।

॥ দশ ॥

সংবাদটার সম্যক আক্ষরিক অর্থ অনুধাবন করতেই বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগল বিষ্ণুপ্রসাদের।

তার পরও—অর্থাৎ, শব্দগুলোর অর্থ উপলব্ধি হওয়ার পরও—বহুক্ষণ নির্বাক হয়ে চেয়ে রইলেন ছেলের মুখের দিকে।

কথাটা বিশ্বাস হ'ল না তখনও।

ভোরবেলা স্নান সেরে গৃহদেবতার পূজায় যাবার আগেই বধূমাতা এসে জানিয়েছেন কথাটা—সূর্যপ্রসাদ ও বিশাখাকে পাওয়া যাচ্ছে না কোথাও. আর সেই সঙ্গে বাহ্‌রামকেও না।

কিন্তু তাতে বিশেষ চিন্তিত হন নি তিনি।

ছেলেমানুষ—তিনজনে বন্ধুর মতো হয়ে গেছে—হয়ত ভোরে উঠে কোথাও বেড়াতে গেছে পূর্ব-পরামর্শ মতো। হয়ত—হয়ত শিকারেই গেছে। বৈষ্ণব পিতামহ মত দেবেন না জেনেই চুপিচুপি চলে গেছে।

একটু বরং হাসিই পেয়েছিল তাঁর।

বিশাখার মাকে সান্ত্বনা দিয়ে সেই কথাই বলেছিলেন, 'কোথায় গেছে পাহাড়ে-জঙ্গলে—পাখী ধরতে কি শিকার করতে—এখনই এসে পড়বে।'

বলেছিলেন বটে—কিন্তু একটু ভ্রূকুটিও ঘনিয়ে এসেছিল তাঁর প্রশান্ত ললাটে।

কথাটা ভাল নয়। আদৌ ভাল নয়। তিনি যতই সংসার-বিরাগী উদাসীন হোন, এটুকু সাংসারিক জ্ঞান তাঁর এখনও আছে।

তরুণ কিশোর বাহ্‌রাম, তার সঙ্গে এতটা মেলামেশা হয়ত ভাল হচ্ছে না। বিশেষ মুসলমান, বিধর্মী, বিজয়ীর জাত। বিশাখার বয়স হচ্ছে—ঠিক শিশুটি আর নেই, যদি বাহ্‌রামের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে? সে সর্বনাশের কথাটা যে ভাবাই যায় না!··· না, বড়ই ভুল করেছেন তিনি।

অবশ্য, মেলামেশা করবার স্বাধীনতা তিনি দেনও নি। শুধু খাবারটাই পৌঁছে দিয়ে আমন্ত্রণের কথা বলেছিলেন, কিন্তু তার ফলে যে এ ঘনিষ্ঠতা হ'তে পারে এটাও তাঁর ভাবা উচিত ছিল।

বৃন্দাপ্রসাদ হয়ত সেইজন্যই ক্ষুণ্ন হয়েছে।

কথাটা যদি খুলে বলত ছোকরা!

না, এবার একটু সতর্ক হ'তে হবে।

এসব ভেবেছেন ঠাকুর-ঘরে উঠতে উঠতেই।

তারপর অবশ্য আর কিছু মনে ছিল না। ইষ্ট-পূজায় বসলে পার্থিব জগতের কোন কথাই তাঁর মনে থাকে না।

ইহজগতের সুখ-দুঃখ-বেদনা—সমস্ত রকম অনুভূতি দরবিগলিত অশ্রুর সঙ্গে ঈশ্বরের পায়ে নিবেদন ক'রে সব ভুলে যান তিনি।···

কিন্তু পুজা শেষ ক'রে মন্দির থেকে বেরোবার সঙ্গে-সঙ্গেই কথাটা আবার মনে পড়ে গেল।

অথবা না পড়ে উপায় রইল না আর। বেশ একটু রূঢ়ভাবেই মনে পড়ল।

ঠাকুর ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে বৃন্দাপ্রসাদ।

উদ্‌ভ্রান্ত চেহারা, বিশৃঙ্খল বেশবাস, চোখ দুটি জবাফুলের মতো লাল—

আর সর্বাঙ্গে,—হাতে, কাপড়ে, জামায় রক্ত।

লাল, তাজা রক্ত।

বাড়ির অপর বাসিন্দারা, পুরনারীরা ভিড় ক'রে এসে দাঁড়িয়েছে ; তাদের মুখ শুষ্ক, উৎকণ্ঠায় ব্যাকুল, কিন্তু কেউই কাছে আসতে—বা কোন প্রশ্ন করতে সাহস করছে না।

দূরে, যেন এক জায়গায় জড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তারা, নিঃশ্বাস রোধ ক'রে।

কেবল বিশাখার মা মাটিতে পড়ে আছেন মূর্ছিত অবস্থায়—সম্ভবত দারুণ কোন অজ্ঞাত বিপদের আশঙ্কাতেই জ্ঞান হারিয়েছেন তিনি।

বিষ্ণুপ্রসাদ সব ক'টা সিঁড়ি নামতেও পারলেন না। যেন পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন তিনিও।

কোন প্রশ্নও করতে পারলেন না কাউকে।

অবশ্য তার দরকারও হ'ল না।

বৃন্দাপ্রসাদই আর একটু এগিয়ে এল সামনে—তারপর বাপের মুখের দিকে চেয়ে প্রচণ্ড জোরে একবার হেসে উঠল হা-হা ক'রে।

বিকট পৈশাচিক হাসি, দুর্দান্ত পাগলের মতোই।

সে বিকট হাসি সেই শান্ত নির্জন উপত্যকায় বিকটতর প্রতিধ্বনি তুলে ঘুরে বেড়াতে লাগল। এক অজ্ঞাত আতঙ্ক, নাম-না-জানা বিভীষিকার সৃষ্টি ক'রে।

সে হাসি শুনে ওধারে মেয়েরা অনেকে ডুকরে কেঁদে উঠল, এমন কি বিষ্ণু-প্রসাদের গায়েও কাঁটা দিল সে হাসির আওয়াজে।

কিন্তু তবু কোন প্রশ্ন করতে সাহস হ'ল না কারও। কী বলবে ও, কী শুনতে হবে, ভয়ঙ্কর কী বার্তা—এই আশঙ্কায় কণ্টকিত হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল সবাই।

হাসি থামবার পর সকলের নীরব প্রশ্নের জবাব দিল বৃন্দাপ্রসাদ নিজেই।

বৃন্দাপ্রসাদ এইমাত্র প্রচণ্ড দুটো ভুল সংশোধন ক'রে এসেছে। বিধাতার ভুল এবং তার পিতার ভুল! বৃদ্ধ বয়সের মতিভ্রম থেকে—আর সে মতিভ্রমের শোচনীয় ও অবশ্যম্ভাবী পরিণাম থেকে পিতাকে রক্ষা করেছে সে।

বৃন্দাপ্রসাদ রাজা বিজয়দেবকে সংবাদ দিয়ে একদল ফৌজ এনেছিল মালিক বাহ্‌রামকে ধরিয়ে দেবার জন্য।

হ্যাঁ, তাই সে এনেছিল, তার জন্য তার কোন লজ্জা নেই—নেই কোন

অনুতাপ। এক অন্যায়কে অপর অন্যায় দ্বারাই উৎপাটিত করতে হয়—কাঁটা দিয়ে তুলতে হয় কাঁটা—তা সে জানে।

কিন্তু আরও যে পাপ তার ঘরেই জমা হয়েছিল—তার ঐ নির্বোধ মতিচ্ছন্ন পিতার নির্বুদ্ধিতার জন্য, সেটাই সে জানত না। তার সমস্ত আয়োজন বানচাল হ'তে বসেছিল। সেই সঙ্গে যেতে বসেছিল তার জীবনও। অপঘাত মৃত্যুর সঙ্গে মিথ্যাচরণের দুর্নামও সইতে হ'ত তাকে।

তারই ছেলেমেয়ে, তার বে-জাতক বিশ্বাসঘাতক ধর্মভ্রষ্ট পুত্রকন্যা, গোয়েন্দা-গিরি ক'রে সেই খবর বার করেছিল এবং বাহ্‌রামকে জানিয়ে গোপনে তার পলায়নের সব ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছিল।

কিন্তু বৃন্দাপ্রসাদ নির্বোধ নয়, অসতর্কও নয়। তুচ্ছ অপত্যস্নেহে বিগলিত হবার লোক তো নয়ই।

সে দূর থেকে, নিঃশব্দে সব লক্ষ্য করেছিল।

একেবারে শেষ মুহূর্তে হাতে-নাতে ধরেছে ওদের।

বেইমান পুত্রকন্যাকে নিজের হাতে বধ ক'রে বাহ্‌রামকে বিজয়দেবের সিপাহীদের হাতে সঁপে দিয়ে এইমাত্র ফিরছে সে।

যে ব্রাহ্মণ এবং গুরুবংশের মেয়ে বিধর্মী পুরুষের হাত ধরে, আর যে ছেলে বাপের বিরুদ্ধে বিদেশীর হয়ে ষড়যন্ত্র করে—তারা কেউ ওর সন্তান নয়—অন্তত বৃন্দাপ্রসাদ তাদের সন্তান বলে স্বীকার করে না।

তাদের মুখদর্শন পাপ—তাদের বাঁচতে দেওয়া অন্যায়।

সেই জন্যই বৃন্দাপ্রসাদ স্বহস্তে সে পাপ ধ্বংস ক'রে দিয়ে এসেছে; আর কোন চিন্তা নেই। অঙ্কুরেই বিনষ্ট ক'রে দিয়ে এসেছে—বৃহত্তর পাপের সম্ভাবনা।

বক্তব্য শেষ ক'রে আবার হা-হা ক'রে হেসে উঠল বৃন্দাপ্রসাদ, তেমনি পৈশাচিক, বিকট হাসি।

॥ এগারো ॥

মেয়েদের মধ্যে একটা আর্তনাদ উঠল, কেউ কেউ ছুটে পালিয়ে গেলেন সেখান থেকে। আরও দু-একজন অজ্ঞান হয়ে পড়লেন।

শুধু বিষ্ণুপ্রসাদই কিছু করলেন না।

কিছু করতে পারলেন না।

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন বক্তার মুখের দিকে। কথাগুলোর অর্থ মস্তিষ্কের বুদ্ধিকোষে পৌঁছতে বেশ খানিকটা সময় লাগল তাঁর।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত একটু একটু ক'রে বুঝলেন।

না বুঝে বুঝি উপায়ও ছিল না।

ছেলের মুখ-চোখের চেহারা, ঐ হাসি, হাতে ও কাপড়ে রক্ত—এইগুলো থেকেই বুঝলেন।

ক্রমে বিশ্বাসও করতে হ'ল।

বিস্ময়-বিহ্বলতা ও অবিশ্বাস কাটতে প্রচণ্ড আঘাতের বিমূঢ় প্রতিক্রিয়ায় প্রথমটা সেই সিঁড়িতেই বসে পড়েছিলেন তিনি; আর কিছু করতে পারেন নি, কিছু বলতে তো পারেনই নি। মুখ দিয়ে শুধু একটা অস্ফুট শব্দ বার হয়েছিল, 'হে কেশব!'

অনেকক্ষণ আর কিছু বুঝতেও পারেন নি।

গৃহবাসীদের কান্নাও যেন মনে হয়েছিল দূরাগত কোন শব্দ।

সামনে বৃন্দাপ্রসাদের উন্মত্ত চেহারাটাও অপ্রাকৃত অবাস্তব কিছু বলে মনে হয়েছিল।

শোকও কি খুব একটা অনুভব করতে পেরেছিলেন? কী এবং কতটা ক্ষতি হ'ল—এই বিপুল সর্বনাশের সম্যক পরিমাণই কি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন? বোধ হয় না। কেমন একটা বিমূঢ়তা, কেমন একটা জড়তা যেন আচ্ছন্ন, অভিভূত ক'রে রেখেছিল তাঁকে।

কী করবেন, কী করা উচিত—পৌত্র-পৌত্রীর মৃতদেহের ওপর গিয়ে আছড়ে পড়বেন কিনা, কিছুই যেন তাঁর মাথাতে ঢুকছিল না।

ভেতর থেকে কোন প্রবল আবেগানুভূতির তাগিদও বুঝতে পারছিলেন না। সবটা কি তাহ'লে তাঁর পাথর হয়ে গিয়েছে।

এখন সর্বাগ্রে হয়ত প্রয়োজন ওদের সংকারের ব্যবস্থা করা—বাড়ির সকলেই শোক-বিহ্বল অভিভূত—তারা কেউ পারবেও না, করলে ওঁকেই করতে হবে।

আঘাত? না আঘাতের কথা চিন্তা করার অধিকার তাঁর নেই! তিনি জ্যেষ্ঠ—তাঁর কাছে যা কর্তব্য যা করণীয়—তা-ই শুধু সত্য।

ওরা ছিল তাঁর নয়নের মণি, তাঁর আত্মার আনন্দ—আজ তাদের শাস্ত্রোক্ত শেষ-কৃত্য তাঁরই করা উচিত।

কিন্তু তবু পারলেন না। কিছুই পারলেন না। তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আজ আর তাঁর কোন শাসন মানল না। স্নায়ুগুলো কোন ভ্রূকুটিতেই সক্রিয় হ'ল

না। চিরকাল যা ক'রে এসেছেন—মনকে দমিয়ে রেখে নিজের কাজ ক'রে যাওয়া—আজ সে কোন-কিছুই যেন ঠিক করতে পারলেন না।

ক্রমে বেলা বাড়তে লাগল।

গ্রামের লোক কান্নার শব্দ পেয়ে ছুটে এল সবাই।

পথে পথে জটলা হচ্ছে, নদীর ওপারে ভিড় জমে উঠেছে।

বৃন্দাপ্রসাদ ইতিমধ্যে বাগানে গিয়ে একটা সেব্‌গাছের* তলায় বসেছে গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে। কিন্তু এখনও মাঝে মাঝে তেমনি হেসে উঠছে সে আপন মনেই।

তেমনি প্রচণ্ড, তেমনি ভয়াবহ, তেমনি বিকট প্রতিধ্বনি-জাগানো হাসি—

অবশেষে আর একটি ব্রাহ্মণ, হরকিশোর, বিষ্ণুপ্রসাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন। মাথা হেঁট ক'রে আস্তে আস্তে শুধু বললেন, 'কেশবজীর মন্দিরে এখনও দোর খোলা হয় নি গুরুজী। চাবিটা—'

হঠাৎ যেন ঘুম ভাঙল বিষ্ণুপ্রসাদের, 'দোর খোলা হয় নি—না? এখনও শয়ন থেকে তোলাই হয় নি যে! ইস্—বড্ড ভুল হয়ে গেছে। বড্ড ভুল হয়ে গেছে। চল, আমি যাচ্ছি এখনই—।'

প্রায় ছুটেই চললেন বিষ্ণুপ্রসাদ।

প্রৌঢ় হরকিশোরকে রীতিমত দৌড়তে হ'ল—তাঁর আগে গিয়ে পথ রোধ ক'রে দাঁড়াতে।

'কিন্তু গুরুজী—'

অবাক হয়ে যান বিষ্ণুপ্রসাদ।

একটু বিরক্তও হন যেন।

ভ্রূকুটি ক'রে তাকান হরকিশোরের মুখের দিকে।

'কিন্তু কি? পথ ছাড় হরকিশোর। বেলা হয়ে গেছে অনেক। আগে ভগবানের সেবা, তারপর নিজের পারিবারিক কাজ।'

অনেকক্ষণ পরে কর্তব্য-কর্মে নিজেকে উদ্বোধিত করতে পেরে যেন অনেকটা মানসিক বলও অনুভব করেন বিষ্ণুপ্রসাদ।

'কিন্তু গুরুজী'—আবার বলেন হরকিশোর, বলতেই হয় শেষ পর্যন্ত কথাটা—মনে মনে এই লোকটার জন্য যৎপরোনাস্তি বেদনা বোধ করলেও অন্য কোন উপায় খুঁজে পান না বলা ছাড়া—খানিকটা অকারণ মাথা চুলকে বিব্রত ভাবে

* সেও বা আপেল গাছ।

বলেন, 'কিন্তু আপনার যে অশৌচ পণ্ডিতজী, আপনার তো এখন ক'দিন আর সেবায় অধিকার নেই।'

'ও! অধিকার নেই, না?'

অকস্মাৎ যেন একেবারে বিবর্ণ সাদা হয়ে যায় বিষ্ণুপ্রসাদের মুখ। কণ্ঠ হয়ে আসে স্খলিত। অতিকষ্টে উচ্চারণ করেন কথাগুলো।

সঙ্গে সঙ্গে আবারও যেন কিছু পূর্বের অনড়তা বা জড়তা ফিরে আসে হাতে-পায়ে। সব জোর ফেলেন হারিয়ে।

'সত্যিই তো, বড় ভুল হয়ে গেছে। বড্ডই ভুল হয়ে যাচ্ছে আমার। সত্যিই বটে। আমার অধিকার নেই। আর আমার কোন অধিকার নেই কেশবজীকে সেবা করার। ছেলে-- ছেলে করেছে ঠিকই, কিন্তু সে তো আমারই দায়িত্ব। আমারই দায়িত্ব।'

এতক্ষণে একটা কাঁপুনি ধরেছে তাঁর হাতে-পায়ে।

থর থর ক'রে কাঁপছে তাঁর ঠোঁট দুটোও, কাঁপছে চোখের পাতা।

তারই মধ্যে কোমরের কাপড়ে গোঁজা চাবির থোলোটা বার ক'রে হরকিশোরের প্রসারিত হাতে আলগোছে ফেলে দেন বিষ্ণুপ্রসাদ।

'এই নাও হরকিশোর। তুমি যাও মন্দিরে। আজ নয় শুধু—আজ থেকেই এ সেবার ভার তোমার! ললিতাকেশবের সেবায় আর আমাদের কোন অধিকার রইল না।'

'এসব কথা কেন বলছেন গুরুজী, অশৌচের এই ক'টা দিন কেটে গেলেই তো—' ব্যাকুল হয়ে আরও কি বলতে যান হরকিশোর।

'না না হরকিশোর। আর না, আর না। আর কোন দিন নয়। আমার বংশের আর কোন অধিকার নেই ঈশ্বরের সেবা করার। আমরা পতিত হয়ে গেছি। আমরা ব্রাত্য। আমাদের সমস্ত বংশ পতিত হয়ে গেছে। তুমি যাও, তুমি যাও। বড়ই দেরি হয়ে গেছে। অপরাধ হয়ে যাচ্ছে দেবতার কাছে।'

আর বাদানুবাদের অবকাশ না দিয়ে একেবারে পিছন ফিরে চলতে শুরু করেন বিষ্ণুপ্রসাদ।

স্খলিত পদে টলতে টলতে আর কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে যান তিনি—তাঁর বাড়ির দিকেই।

নিদারুণ কর্তব্য রয়েছে সামনে পড়ে, সে কর্তব্য পালন যে করতেই হবে। অযথা শোক-বিলাসের সময় আর তাঁর নেই।

॥ বারো ॥

তবু প্রথমটা কেউ বুঝতে পারে নি।

বোঝা সম্ভবও ছিল না।

লোকজন ডেকে, ধীরভাবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নির্দেশ দিয়ে, বিহিত শাস্ত্রমতে পৌত্র-পৌত্রীর সৎকারের ব্যবস্থা করল যে মানুষ অমন স্থির থেকে—অপঘাত মৃত্যুর জন্য বিশেষ করণীয় ক্রিয়াকলাপের কোনটা ভুল হ'ল না, এতটুকু ভ্রান্তি, এতটুকু বিচ্যুতি ঘটতে দিল না যে কিছুতে—তার মনে যে এই ছিল তা কে-ই বা অনুমান করতে পারে।

অশৌচান্ত পর্যন্ত স্বাভাবিক জীবনযাত্রার কোথাও কোন ব্যতিক্রম ঘটে নি। সেই প্রথম দিনটির প্রথম কয়েক দণ্ড ছাড়া খুব প্রবল কোন শোকেরও চিহ্ন দেখে নি কেউ তাঁর মুখে।

প্রশান্ত, অনুদ্বিগ্ন মুখ।

ঈষৎ যেন থম্‌থমে গম্ভীর—কিন্তু তার বেশী কিছু নয়।

বরং বাড়ির আর সকলে ঢের বেশী ভেঙ্গে পড়েছিল, ঢের বেশী কাতর হয়েছিল। সূর্যপ্রসাদের মা-র সেই প্রথম মূর্ছাই ভেঙ্গেছিল দু'দিন পরে—তার পরও ঘন ঘন মূর্ছা হচ্ছে। অন্য পুরনারীরাও বিহ্বল। বিষ্ণুপ্রসাদের ছোট ছেলেটি পর্যন্ত দিনরাত কান্নাকাটি করছে।

শুধু বিষ্ণুপ্রসাদই নির্বিকার।

কিন্তু শোক যেমন নেই তেমনি কারুর জন্য কোন উদ্বেগ কি দুশ্চিন্তাও নেই।

সান্ত্বনা দেবারও চেষ্টা করছেন না কাউকে।

শুধু যতটুকু করবার এবং যতটুকু যাকে দিয়ে যা করাবার—করছেন ও করিয়ে নিচ্ছেন।

সেই জন্যই অশৌচান্তের শেষ কৃত্যটি হয়ে যাবার পরই যখন তিনি সহজভাবে বাড়ি থেকে বেরিয়ে নদীর দিকে গেলেন, তখন কেউ কিছু বুঝতে পারে নি।

অস্বাভাবিক কিছু লক্ষ্য করে নি তাঁর আচরণে।

প্রথম সকলে একটু অস্বস্তি বোধ করল—যখন বেশ কয়েক দণ্ড, এমন কি এক প্রহর কাল কেটে যাবার পরও, তিনি নদী থেকে ফিরলেন না—তখনই।

নদীতীরে লোক পাঠানো হ'ল।

বিষ্ণুপ্রসাদ সেখানে নেই।

তবে কি তিনি স্নান ক'রে মন্দিরে গেছেন ?

মন্দিরে ছুটে গেল একজন।

না সেখানেও নেই, আদৌ যান নি। সেদিকে যেতে দেখেও নি কেউ।

এবার রীতিমতো চিন্তিত হয়ে পড়ল সবাই।

চারিদিকে লোক পাঠানো হ'ল।

আশপাশের গ্রামে, আত্মীয়-স্বজনদের বাড়ি। এমন কি দূর শহরেও পরিচিতদের বাড়ি খোঁজ করা হ'ল।

অকারণ জেনেও অপরিচিতদের ডেকে প্রশ্ন করা হ'ল।

কিন্তু কেউ কোন খবর দিতে পারল না।

বিষ্ণুপ্রসাদ নেই। তিনি যেন একেবারে উবে গেছেন, তাঁর এই পরিচিত জগৎ থেকে।

এ বাড়িতে নতুন ক'রে শোকের ছায়া পড়ল।

রমাপ্রসাদের তখনও সেই অর্ধোন্মাদ অবস্থা: জোর ক'রে স্নান করিয়ে দিলে করছে, খেতে দিলে খাচ্ছে। কিন্তু নিদ্রা নেই চোখে। যে কোন জায়গায় বসে থাকছে প্রহরের পর প্রহর—শুধু মধ্যে মধ্যে হাসছে আপন মনেই।

সেই ভয়ঙ্কর পৈশাচিক হাসি।

সুতরাং এক তার ছোট ভাই বলদেওপ্রসাদ অবশিষ্ট রইল এ বাড়ির পুরুষ বলতে। কিন্তু সে বেচারীও ছেলেমানুষ, এতগুলো আঘাতে সে-ও বিহ্বল হয়ে পড়েছে। বেশী কোন চেষ্টা-চরিত্র করা তার পক্ষেও সম্ভব নয়।

অগত্যা গ্রামের লোকদেরই অগ্রণী হ'তে হ'ল।

গ্রামবাসীদের আর মন্দিরের অন্য পূজারীদের।

কিন্তু তারাই বা কোথায় খোঁজ করবে ভেবে পেল না কেউ।

তবু হাল ছেড়ে দেওয়ার আঘাতটা আরও অসহ্য বলেই, একই স্থানে বার বার লোক পাঠাতে লাগল। যদিই থাকেন—যদিই কোন খবর মেলে।

কিন্তু বিষ্ণুপ্রসাদ একেবারে যেন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছেন। কোথাও কোন সূত্র পাওয়া গেল না তাঁর গমনপথের।

অবশেষে—যখন তাঁর আশা প্রায় ছেড়েই দিয়েছে সবাই—তখন, দিন-চারেক পরে, অপ্রত্যাশিতভাবে খবর পাওয়া গেল।

পাশের গ্রামের এক কৈলাসযাত্রী তীর্থ-পরিক্রমা শেষ ক'রে ফিরে এসেছেন—তিনি জানেন বিষ্ণুপ্রসাদের খবর।

বিষ্ণুপ্রসাদের সঙ্গে নাকি তাঁর পথে দেখা হয়েছে। একা একা, পাগলের মতো, সঙ্গে কোন খাদ্য কি শয্যা না নিয়ে প্রায় ছুটে চলেছেন হিমালয়ের পথে।

যেন মহাপ্রস্থানের পথে ছুটে চলেছেন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির। শুধু তাঁর সে অবিচলিত প্রশান্তিটুকু নেই এঁর। অধীর অশান্ত ভাবে ছুটছেন এ বৃদ্ধ।

ঐভাবে যেতে দেখে এ ভদ্রলোক তাঁকে ফেরাবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু বিষ্ণুপ্রসাদ কোন কথাই শোনেন নি।

তাঁর পূর্বপুরুষদের মধ্যে কে একজন সাধক নাকি পবিত্র নন্দাদেবী শৃঙ্গের কোন্ গুহায় সাধনা ক'রে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন—সেইখানেই যাচ্ছেন বিষ্ণুপ্রসাদ প্রায়োপবেশনে প্রাণত্যাগ করতে।

তাঁর এ অদ্ভুত ও ভয়ঙ্কর সংকল্পের কারণ কি—এ প্রশ্ন করেছিলেন বৈকি কৈলাস-মানসের ঐ তীর্থযাত্রীটি।

তাঁর উত্তরে বিষ্ণুপ্রসাদ জানিয়েছেন যে, তিনি মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত করতে যাচ্ছেন।

একাধিক মহাপাতক স্পর্শ করেছে তাঁকে—তাঁর বংশকে।

ব্রহ্মহত্যা, নারীহত্যা, অতিথিহত্যা, আশ্রিতের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা, প্রতিজ্ঞাভঙ্গ। এতগুলি মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত করতেই চলেছেন তিনি—তাঁর নিজের ও তাঁর বংশধরদের হয়ে।

তুষানলই এর উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত, কিন্তু সে প্রায়শ্চিত্ত গৃহে থেকে করাই বিধি। দেশে বাড়িতে বসে সে কাজ করতে গেলে বাধা দিত সবাই, সে সম্ভব হ'ত না।

এ ছাড়া আর যে বিধান আছে শাস্ত্রে—ইষ্টনাম জপ করতে করতে প্রায়োপবেশনে দেহত্যাগ করা—তা-ই করবেন তিনি।

সেই উদ্দেশ্যেই চলেছেন। পূর্ব-পুরুষের সিদ্ধিলাভের স্মৃতিপূত পুণ্য-ভূমিতে।

স্থান চাই বসে জপ করার—উপবাস করার। সেই স্থানের খোঁজেই তিনি চলেছেন।

সময় বড় অল্প—পাছে পূর্ণ প্রায়শ্চিত্তের অবসর না পান তাই এ অস্থিরতা—তাও বলেছেন তিনি।

পরিচিত তীর্থযাত্রীটির বহু অনুনয়-বিনয়, পীড়াপীড়িতেও নিজের সংকল্প ত্যাগ করতে রাজী হন নি তিনি। বলেছেন, 'এ পাতকের প্রায়শ্চিত্ত না করলে আমার বংশের আমার শিষ্যদের কারুর কল্যাণ নেই। উত্তরপুরুষ-পরম্পরায় পাপের ফলভোগী হয় সর্বনাশ টেনে আনে পূর্বপুরুষ-কৃত মহাপাতক। আমিই

যখন এই পাপের জন্য মূলত দায়ী—তখন আমারই এ প্রায়শ্চিত্ত করা বিধেয়! তাছাড়া, ইষ্টপূজা ব্যতীত এখন আমার আর কোন কাম্য নেই—সেই পূজাতেই যখন বঞ্চিত হয়েছি তখন প্রাণ রাখবারও কোন অর্থ হয় না। ওদের জন্য চিন্তা ক'রে কী করব! আমি বৃদ্ধ হয়েছি, এমনিও একদিন মরতাম—তখনও যা হ'ত, এখনও না হয় তাই হবে। বৃথা সেজন্য চিন্তা ক'রে লাভ নেই। বরং আমার প্রায়শ্চিত্ত যদি আমার কেশব গ্রহণ করেন তো ওরা সুখে থাকতে পারবে—ওদের কল্যাণ হবে। আমার আর পার্থিব কোন দায়িত্ব আছে বলে মনে করি না—এখন যত শীঘ্র এই ঘৃণিত দেহটা ত্যাগ ক'রে আমার প্রভুর সঙ্গে মিলিত হ'তে পারি, ততই শুভ!'

এই সংবাদে সমস্ত গ্রামবাসী স্তব্ধ হয়ে গেল আর একবার।

আর একবার এক প্রচণ্ড শোচনীয় ঘটনার আঘাত অনুভব করল তারা।

এবং প্রচণ্ডতর কোন আঘাতের অজ্ঞাত একটা আশঙ্কায় পরস্পরের মুখের দিকে নিঃশব্দে তাকিয়ে রইল শুধু।

কিছুই স্থির হ'ল না।

কী করা উচিত, এখন কী করণীয় সে আলোচনাটা পর্যন্ত কেউ করতে পারল না সেদিন।

সমস্ত গ্রাম যেন নিঃশব্দ শঙ্কায় প্রহর গুনতে লাগল।

॥ তেরো ॥

সেইদিন মধ্যরাত্রে এক বিচিত্র স্বপ্ন দেখলেন পূজারী হরকিশোর।

দেখলেন যে কেশবজীর সেবা করতে গিয়ে তিনি যেন বিগ্রহ খুঁজে পাচ্ছেন না।

কোন এক আশ্চর্য উপায়ে রুদ্ধদ্বার মন্দির থেকে মন্দিরের অধিষ্ঠাতা দেবতা অন্তর্হিত হয়েছেন।

সারা গ্রামের লোক ভেঙ্গে পড়েছে, সেই সংবাদে সকলেই হায় হায় করছে—সকলেই খুঁজছে।

অবশেষে এক সময় হরকিশোরই দেখা পেলেন তাঁর।

কেশবজী যেন গ্রাম ছেড়ে চলে যাচ্ছেন; গ্রামের সীমান্তে নদী পার হচ্ছেন, সেই সময় হরকিশোর ধরলেন তাঁকে।

ঠাকুরের ওষ্ঠাধর অভিমানে স্ফুরিত, দৃষ্টি ছলোছলো।

হরকিশোর হাত জোড় ক রে বললেন, 'প্রভু, আমাদের কী অপরাধ হ'ল—আমাদের ত্যাগ ক'রে যাচ্ছেন ? দয়া ক'রে ফিরে চলুন—আপনার পূজা হয় নি বলে সমস্ত গ্রামবাসী হাহাকার করছে—সকলেই এখনও পর্যন্ত উপবাসী। ভক্তদের প্রতি দয়া করুন।'

এই কথায় কেশবজীর বৈদূর্যমণির চক্ষুদুটি থেকে যেন অনল বর্ষিত হ'ল।

তিনি বললেন, 'কে আমার ভক্ত ? আমার ভক্ত সেই একজন ছিল, তাকে তোরা তাড়িয়েছিস। তার পূজা ছাড়া আমার তৃপ্তি নেই। আমি যাচ্ছি তারই পূজা গ্রহণ করতে।'

অভিমান হরকিশোরেরও কিছু হ'ল।.

তিনি আহত কণ্ঠে,বললেন, 'কিন্তু প্রভু, আমরা তো তাঁকে তাড়াই নি। তিনি নিজেই গেছেন। বরং আমরা অক্লান্ত খুঁজেছি ক'দিন। আর—আপনি তো সকলেরই মালিক, ইচ্ছে করলেই তো তাঁকে ধরে রাখতে পারতেন

'না, তোদের এ গ্রামে পাপ স্পর্শ করেছে! মহাপাপ। বিষ্ণুপ্রসাদের মতো শুদ্ধাচারী ভক্তের পক্ষে এখানে থাকা সম্ভব নয়। তাই সে গেছে। আমিও তাই চলেছি। ভক্ত ছেড়ে ভগবানেরও থাকা সম্ভব নয়।'

হরকিশোরের চোখে জল এসে গেল এই অকারণ তিরস্কারে।

তিনি তো মনে প্রাণে কোন অপরাধ করেন নি। গ্রামবাসীরাও সাধারণ ভাবে কোন দোষে দোষী নয়। কেশবজী তো ভগবান—তিনি কেন একের অপরাধে সকলকে সাজা দেবেন! এ কী অবিচার তাঁর!

হরকিশোর বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, 'আমরা কি কেউই আপনাকে ভক্তি করি না? একজনের পাপে আমাদের ত্যাগ করছেন কেন? কেন আমাদের পূজা গ্রহণ করবেন না আপনি? আমরা কি অপরাধ করলুম?'

তবুও ওদিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন ঠাকুর, 'বিষ্ণুপ্রসাদের পূজা ছাড়া আমার তৃপ্তি নেই হরকিশোর!'

কিছুক্ষণ নির্বাক দাঁড়িয়ে থেকে হরকিশোর এক দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'বেশ, আমি কথা দিচ্ছি যেমন ক'রেই হোক তাঁকে ফিরিয়ে আনব। আপনি দয়া ক'রে ফিরে চলুন। আমি আজই যাত্রা করছি, যদি বিষ্ণুপ্রসাদকে ফিরিয়ে আনতে পারি তো ফিরব, নইলে আর আমি ফিরব না। আমাদের অপরাধে আমাদের উত্তরপুরুষরা যেন তাদের সর্বশ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারে না বঞ্চিত হয়। আপনি না থাকলে গ্রামের কী রইল?'

মুচকি হাসলেন ললিতাকেশব।

আবারও তাঁর বৈদূর্যমণির চোখে আগুন জলে উঠল একবার।

বললেন, 'বেশ, চল আমি যাচ্ছি। তোমাকে আমি বিমুখ করব না। কিন্তু যতক্ষণ না বিষ্ণুপ্রসাদ ফিরবে আমি বিমুখ হয়ে থাকব।...আমাকে না ফেরালেই বোধহয় ভাল করতে হরকিশোর। উত্তরাধিকারের কথা বলছিলে না? পাপের উত্তরাধিকার তার প্রায়শ্চিত্ত।'

এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই যেন অন্তর্হিত হলেন কেশবজী।

আর ঠিক সেই মুহূর্তেই হরকিশোরের ঘুম ভেঙে গেল।

উদ্বেগে, উৎকণ্ঠায় উত্তেজনায়—একটা চাপা অভিমানে ও ক্ষোভে তাঁর বুকের মধ্যেটা যেন আকুলিবিকুলি করছে তখন।

তিনি ঘর্মাক্ত কলেবরে ধড়মড়িয়ে বিছানায় উঠে বসলেন।

সাধারণত রাত্রের দেখা স্বপ্ন রাত্রি প্রভাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই স্মৃতির দিগন্তে মিলিয়ে যায়, একটা অস্পষ্ট ধারণা হয়ত থাকে কোন কোনদিন। কিন্তু আজ স্পষ্ট মনে পড়ল সব কথা।

একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় বুকে যেন হাতুড়ির ঘা পড়তে লাগল।

একবার মনে হ'ল যে, এ তাঁর গত সন্ধ্যায় শোনা বিষ্ণুপ্রসাদের মহাযাত্রার ঐ কাহিনীর প্রতিক্রিয়া।

মনে মনে ঐসব কথা চিন্তা করেছেন বলেই এই রকম স্বপ্ন দেখেছেন।

আবার এ-ও ভাবলেন যে, ক'দিন ধরেই তো বলতে গেলে ক্রমাগত ভেবেছেন এই সব কথা--মনে মনে তোলাপাড়া করেছেন, বৃন্দাপ্রসাদের মহাপাপের ফলাফল—তারই পরিণাম হয়ত এই স্বপ্ন।

মোটকথা উত্তপ্ত মস্তিষ্কের কল্পনা ছাড়া এ কিছু নয়।

স্বপ্ন স্বপ্নই—স্বপ্ন আবার কবে সত্যি হয়?

কিন্তু তবু ঠিক নিশ্চিন্ত হ'তে পারলেন না।

ইচ্ছে হ'ল, একবার সেই রাত্রেই দরজা খুলে দেখে আসেন মন্দিরটা—কিন্তু সাহসে কুলোল না। যদি অমঙ্গল হয়?

তাছাড়া ললিতাকেশব নিত্য বৃন্দাবনে বিহার করতে যান—এমনও একটা কিংবদন্তী আছে। এ সময় উৎপাত করা ঠিক নয়।

এর আগে কে নাকি এক তরুণ যুবক ধৃষ্টতা বা দুঃসাহসের পরিচয় দিয়ে ঐ কাজ করতে গিয়েছিল—নিজের চোখে দেখে কৌতূহল মেটাতে চেষ্টা করেছিল মধ্যরাত্রে মন্দিরের দরজা খুলে—কিন্তু কী দেখেছিল সে কাহিনী আর কাউকে বলা সম্ভব হয় নি তার।

হরকি   মস্তিষ্কের সুস্থতা দুই-ই চলে গিয়েছিল সে হতভাগ্যের

.নে পড়তেই শিউরে উঠলেন হরকিশোর, উদ্দেশে হাত তুলে
.লেন।

অবশ্য, রাত্রি প্রভাতের খুব বেশী দেরিও ছিল না তখন।

কোনমতে দণ্ড-কয়েক সময় বসে বসেই কাটালেন তিনি—তারপর উত্তরের তুষারমৌলি গিরিদেবতার ললাটে ঊষার রক্তিতিলক আভাসে মাত্র স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গেই উঠে পড়লেন শয্যা ত্যাগ ক'রে।

বাইরে তখন প্রচণ্ড বাতাস বইছে, তুহিনশীতল করকা-স্পর্শ হিমবাতাস। চর্ম-মাংস ভেদ করে সে হাওয়ার তীক্ষ্ণতা।

তবু আর এক মুহূর্ত বিলম্ব করলেন না হরকিশোর, আর কোন কারণেই যেন তাঁর ইতস্তত করার সময় নেই।

তিনি ছুটে চলে গেলেন নদীতে—স্নান সেরে দাঁতে-দাঁত-লাগা অবস্থাতেই কাঁপতে কাঁপতে এলেন মন্দিরে।

তখনও ভাল ক'রে ফরসা হয় নি এখানে—পাহাড়ের প্রাচীর ভেদ ক'রে প্রভাত নামে নি উপত্যকায়, তবু নজর চলে। সশব্দে মন্দিরের দোর খুলে ফেলে রুদ্ধ-নিশ্বাসে ভিতরে প্রবেশ করতেই তাঁর চোখে পড়ল—

কেশবজীর মুখ ওদিকে ফেরানো।

ভগবান বিরূপ হয়েছেন!

'হে কেশব, এ কী করলে!'

অস্ফুট কণ্ঠে এই কথা ক'টি উচ্চারণ ক'রে হরকিশোর সেইখানেই বসে পড়লেন।

॥ চোদ্দ ॥

অনেক, অনেকক্ষণ ধরে ভেবে স্থির করলেন হরকিশোর, এ খবরটা আর কাউকে দেবেন না তিনি।

মিছিমিছি আতঙ্কগ্রস্ত হবে সকলে।

একটা অকারণ হৈচৈ, অকারণ কান্নাকাটি। তিনি তো ভগবানের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেনই—সে প্রতিজ্ঞা তিনি প্রাণপণে রক্ষা করবেন। যদি প্রয়োজন হয় তো জীবনের শেষ বিন্দু রক্ত দিয়ে—শেষ শক্তিটুকু দিয়েও।

আজই যাত্রা করবেন বিষ্ণুপ্রসাদকে ফিরিয়ে আনতে।

হয় ফেরাবেন, নয় তো নিজেও আর ফিরবেন না। এই শেষ।

তাঁর প্রাণের বিনিময়েও কি দেবতার রোষ শান্ত হবে না?

মন স্থির করার সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত একটা প্রশান্তি ফিরে এল তাঁর।

শীতের কাঁপুনিও আর যেন রইল না।

বিগ্রহকে ঘুরিয়ে ঠিক ক'রে বসালেন।

তারপর ধীরে-সুস্থে স্নান-বেশ ইত্যাদি সেরে লাড়ুভোগ দিয়ে পূজা-আরতি-স্তব সেরে বাইরে এলেন তিনি।

যে ক'টি পরিবারের কেশবজীর পূজা করার অধিকার আছে—তাদেরই মধ্যে পালা ক'রে এক একজন ভোগ রান্না করে।

হরকিশোর পাকের ঘরে এসে উঁকি মেরে দেখলেন, আজ সুরযনারায়ণ এসেছে ভোগ রান্না করতে।

মুখ উজ্জ্বল হল তাঁর।

সুরযনারায়ণকেই তিনি খুঁজছিলেন মনে-মনে। বড় নিষ্ঠাবান ছেলে এই সুরয—অথচ বয়সে তরুণ বলে কর্মদক্ষ, চটপটে।

ভোগ আজ এখনই রান্না হয়ে যাবে। অর্থাৎ তিনিও অপেক্ষাকৃত তাড়াতাড়ি শয়ন দিয়ে নেমে যেতে পারবেন।

হরকিশোর নিশ্চিন্ত হয়ে মন্দিরে ফিরে গেলেন।

লাড়ুভোগ সরিয়ে আচমন করিয়ে তিনি বসলেন গীতা ও ভাগবত নিয়ে।

প্রত্যহ একটি অধ্যায় ভাগবত ও সম্পূর্ণ গীতা পাঠ করতে হয় কেশবজীর সামনে বসে।

এ নিয়ম বিষ্ণুপ্রসাদই করেছেন, অপরকেও—যেদিন অপরের হাতে সেবার ভার এসে পড়ে সেদিন—এ নিয়ম পালন করতে হয়।

গীতা শেষ ক'রে ভাগবতের পুঁথির বস্ত্রাচ্ছাদন খুলতে শুরু করেছেন—দরজার কাছে কার ছায়া পড়ল।

কোন আগন্তুক বা দর্শনপ্রার্থী এসে দাঁড়িয়েছে নাটমন্দিরে।

এ এমন কিছু বিস্ময়কর ঘটনা নয়—সকালে স্নান সেরে অনেকেই দর্শন ক'রে যায় কেশবজীকে, পাঠ হচ্ছে শুনলে দুচার দণ্ড বসেও থাকে বাইরে।

কিন্তু তবু আজ—কেন কে জানে—মুখ তুলে তাকালেন হরকিশোর। হয়ত মনের মধ্যেকার অস্থিরতা, একটা নাম-না-জানা শঙ্কা থেকেই গিয়েছিল মনে মনে। জোর ক'রে দূর করার চেষ্টা করলেও একেবারে তাড়াতে পারেন নি তাদের।

বাইরে তাকিয়ে সে শঙ্কা ও অস্থিরতা কমল না বিন্দুমাত্র, বরং নিমেষে তা বেড়েই গেল।

বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে সুরথ, মুখে তার গভীর উদ্বেগ।

সে যে কোন আকস্মিক কারণেই উঠে এসেছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই, কারণ এখনও তার দুহাত আটা-মাখা—অর্থাৎ আটা সানতে সানতেই ছুটে চলে এসেছে।

মনে মনে ভগবানের কাছে ও ভাগবতের কাছে মার্জনা চেয়ে নিয়ে প্রণাম ক'রে মুখ খুললেন হরকিশোর—'কি খবর সুরথ? কিছু বলবে?'

কথা বলতে সুরথের বেশ একটু সময় লাগল। তাঁর ঠোঁট দুটো কাঁপছে থর থর ক'রে—গলা দিয়ে যেন স্বর বেরোতে চাইছে না।

'চাচাজী—আমার—আমার ছোট ভাইটা মারা গেছে—ঘুমের মধ্যেই। এই মাত্র বাবা এসে খবর দিয়ে গেলেন। আমার তো অশৌচ লাগল—আর তো আমার দ্বারা ভোগ হবে না!'

বলার সঙ্গে সঙ্গে হু-হু ক'রে কেঁদে উঠল সে। এতক্ষণের কৃত্রিম ধৈর্য ব্যাকুলতার কাছে আত্মসমর্পণ ক'রে সহজ হ'ল।

'সে কি!'

পুঁথিখানায় আবারও কাপড় জড়াতে জড়াতে বলেন হরকিশোর, 'সে কি—কী হয়েছিল! এই তো কালও সন্ধ্যায় তোমার বাবার সঙ্গে এসে আরতি দেখে গেল!'

জবাব দিতে আবারও সময় লাগল সুরথের। রুদ্ধ কণ্ঠ দিয়ে স্বরই বেরোতে চায় না।

অতিকষ্টে বলল, 'কী হয়েছিল কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। যেমন খেয়ে-দেয়ে শোয় তেমনি শুয়েছে, রাত্রে উঠেওছে একবার। মাকে ডেকেছে, মা সঙ্গে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছেন। আমি তো ভোরবেলা উঠে এসেছি আজ—এখানে সেবা আছে বলে—বেলা বাড়তে মা ওঠাতে গিয়ে দেখেন কাঠ হয়ে পড়ে আছে রেজাইয়ের মধ্যে।'

'রেজাই চাপা পড়ে নি তো? দম বন্ধ হয়ে-টয়ে'—আড়ষ্ট অভিভূত হরকিশোর অতিকষ্টে বলতে যান।

'না না। মুখ খোলাই ছিল। মুখে ঢাকা দিয়ে আমরা কেউ ঘুমোতে পারি না।'

'তার পর?' বাইরে এসে দাঁড়ান হরকিশোর। অনেকক্ষণ পরে আবারও

যেন সেই কাঁপুনিটা টের পাচ্ছেন। বুকে একটা চাঞ্চল্য। যেন নিঃশ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে।

হে কেশব! হে কেশব! মনের মধ্যে যেন অপর একটা সত্তা অবিরাম উচ্চারণ ক'রে যাচ্ছে। অকারণেই।

'বাবা তখনও বুঝতে পারেন নি। ছুটে গিয়ে বৈদ্যজীকে ডেকে এনেছেন। তিনিই এসে বললেন—।'

কথাটা মুখে উচ্চারণ করতে পারল না সুরথ, আবারও কান্নায় ভেঙে পড়ল। খানিকটা পরে কান্নার বেগ আবার একটু সামলে বলল, 'কিন্তু কী হয়েছিল, কী রোগ, তা তিনিও বলতে পারলেন না। সাপে কেটেছে সন্দেহ ক'রে ওঝা ও ডাকা হয়েছিল—তারা বললে সাপ নয়। সাপে কাটলে নীল হয়ে যেত —এর দুই হাত ও পায়ের চেটো লাল—টকটকে রক্তের মতো লাল হয়ে উঠেছে।'

'লাল! রক্তের মতো লাল!'

অদ্ভুত ভয়াবহ একটা শব্দ বেরোল হরকিশোরের গলা দিয়ে।

কেমন একরকম চুপি চুপি প্রশ্নটা করলেন তিনি।

সেটা না আর্তনাদ, না হাহাকার, না আতঙ্কের স্বর—বুঝি তিনেরই বিচিত্র সংমিশ্রণ একটা।

তারপর নিজের ললাটে নিজেই করাঘাত করতে লাগলেন বার বার, 'হে কেশব! হে কেশব! তবু তুমি ক্ষমা করলে না, তবু একটু সময় দিলে না। বিশ্বাস করতে পারলে না আমাকে!'

একটা অব্যক্ত অথচ অসহ্য যন্ত্রণায় যেন ছটফট ক'রে উঠলেন হরকিশোর। কুঁকড়ে কুঁকড়ে উঠতে লাগলেন যেন।

তাঁর মুখচোখের অবস্থা দেখে সুরথ কিছুকালের জন্য নিজের শোক ভুলে গেল। ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে এসে ধরল তাঁকে, 'গুরুজী, গুরুজী, শান্ত হোন। শান্ত হোন।'

'শান্ত! হ্যাঁ বাবা, শান্ত হব বৈকি। কিন্তু সুরথ, তুমি তো আর বাকী খবরটা দিলে না বাবা! আমি যে সেইটে শোনবার জন্যই অধীর হয়ে রয়েছি।'

'বাকী খবর?' বিহ্বল হয়ে প্রশ্ন করে সুরথ। ঠিক যেন বুঝতে পারে না ওঁর বক্তব্যটা।

'হ্যাঁ। আর ক'টা মারা গেল! তুমি ছুটে যেতে পার একবার বেটা, দেখে আসতে পার—আরও ক'টা বাড়িতে কান্নার রোল উঠল? আমি শুধু

এখন সেই সংবাদটারই প্রতীক্ষা করছি যে! একটু কান পেতে শোন—কান্নার শব্দ পাচ্ছ না? এ কি শুধুই তোমাদের বাড়ির? না—না, আরও বহু, আরও বহু—খবরটা নিয়ে এসো না বাবা।'

একরকম ঠেলেই তাকে পাঠিয়ে দেন হরকিশোর।

বিহ্বল বিমূঢ় সুরথ কতকটা যন্ত্রচালিতের মতোই নেমে যায়।

কিন্তু নেমে যেতে যেতেই শোনে—সত্যিই যেন চারিদিক থেকে অনেক-গুলো করুণ বিলাপের সুর ভেসে আসছে।

যেন গ্রামের চারিদিকে বেজে উঠেছে মৃত্যুর রাগিণী।

॥ পনের ॥

স্তব্ধ হয়ে সেইখানেই দাঁড়িয়ে থাকেন হরকিশোর—নিচে ছবির মতো আঁকা তাঁর চিরপরিচিত জন্মভূমি, শান্তি ও সুখের নীড় ঐ গ্রামটির দিকে তাকিয়ে থাকেন একদৃষ্টে।

ছবি, হ্যাঁ—ওস্তাদ শিল্পীরই আঁকা ছবি, তাতে সন্দেহ নেই।

পাহাড়ে-গ্রাম, উঁচু-নীচু পথ—উঁচু-নীচু জমি। তার মধ্যে সবচেয়ে উঁচু একটা টিলার ওপর এই ললিতাকেশবের মন্দির, অনেকগুলো সিঁড়ি ভেঙে উঠতে হয় এখানে।

সুতরাং প্রায় গোটা গ্রামটাই নাটমন্দিরের চত্বর থেকে নজরে পড়ে।

হরিতে-হিরণে-সাদায় অপরূপ এক দৃশ্য। মাঠে মাঠে সোনালী ফসল, বাগানে-বাগানে ফল ও ফুলের গাছে গাঢ় সবুজের সমারোহ, তারই মধ্যে ছোট ছোট সাদা ও মেটে-রঙের বাড়ি—সবটা জড়িয়ে যেন কোন শক্তিমান শিল্পীর আঁকা সার্থক চিত্র একখানা।

ইতিমধ্যে রোদ বেশ চড়ে উঠেছে।

তুষার-শুভ্র পর্বতশীর্ষ থেকে তপ্তকাঞ্চন-বর্ণাভা বিদায় নিয়েছে, প্রখর সূর্যকিরণে শ্বেতদ্যুতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে তা থেকে।

ঠিক তার নিচেই সবুজের সমুদ্র, আর সেই সবুজের বেষ্টনীর মাঝখানে ছবিতে আঁকা এই গ্রাম।

আর যেন সেই ছবির সৌন্দর্য বাড়াতেই তাকে তিনদিক দিয়ে বেষ্টন ক'রে রয়েছে শীর্ণ ছোট্ট পাহাড়ী নদীটি—এখান থেকে সাদা সুতোর মতো—শ্যামল-সুন্দরের কণ্ঠে শুভ্র একফালি যজ্ঞোপবীতের মতোই দেখাচ্ছে তাকে।

শান্ত সমাহিত গ্রাম, তন্দ্রালু পরিবেশ।

চিরদিন যেমন দেখে আসছেন—তেমনই।

কোনদিন এখানে কোন জটিল সমস্যা দেখা দেবে তা ভাবেন নি হরকিশোর, আজও ভাবা যাচ্ছে না। আজন্ম একই খাতে বইতে দেখেছেন এখানের জীবনধারা। বাঁধাধরা সে জীবন, একটি সুষম সঙ্গীতের মতোই সুসম্পূর্ণ, মধুর।

আজও তো বাহ্যিক কোন পরিবর্তনই হয় নি। নিত্যকার সেই শান্ত রূপটিই দেখা যাচ্ছে।

দু-একটি বাড়ি থেকে রসুইয়ের চিহ্নস্বরূপ সামান্য-সামান্য ধোঁয়া উঠছে—সে ধোঁয়াও সেইখানে ছোট ছোট কুণ্ডলীর আকারে জমে রয়েছে।

তার ফলে আরও যেন মোহময় হয়ে উঠেছে ছবিটা।

সেদিকে চেয়ে বিশ্বাসই হয় না যে কোন কঠোর সংকট নেমে এসেছে তার মাথায়—সর্বনাশের খড়্গ উদ্যত হয়ে রয়েছে।

তবু কান্নার শব্দটাও অস্বীকার করা যায় কৈ?

হরকিশোর কান পেতে শুনলেন ভাল ক'রে।

অন্তত পাঁচ-ছটি বাড়ি থেকে কান্নার রোল ভেসে আসছে।

এই পরিবেশের সঙ্গে মিলিয়ে দূরাগত কোন করুণ সঙ্গীত বলেই মনে করা চলত তাকে, যদি না হরকিশোর তার অর্থটা এমন মর্মান্তিকভাবে জানতেন।

এ কান্না ভুল বোঝবার কোন সম্ভাবনা নেই, এ কান্না একটিমাত্র ঘটনাই সূচিত করে।

আবারও অস্থির হয়ে উঠলেন হরকিশোর।

কে যেন আলকুশীর বীজ ছড়িয়ে দিয়েছে তাঁর সর্বাঙ্গে। সেই রকম অসহ্য যন্ত্রণায় বেঁকে-বেঁকে উঠতে লাগলেন তিনি।

তারপর আর স্থির থাকতে না পেরে ছুটে নেমে এলেন নিচে।

কিন্তু বেশীদূর তাঁকে যেতে হ'ল না।

সুরযও ছুটে আসছে ওদিক থেকে।

সুরয আর তার সঙ্গে শোকবিহ্বল আতঙ্কবিমূঢ় পাঁচ-ছ জন লোক।

হরকিশোরের অনুমান মিথ্যা নয়। আরও কয়েকটি বাড়িতে এই আকস্মিক, অপ্রত্যাশিত ভয়াবহ মৃত্যু নেমেছে।

যেন রাত্রের অন্ধকারে কোন যমদূত এসে নিঃশ্বাস ফেলে চলে গেছে গ্রামের ওপর।

সে নিঃশ্বাস কোনো রন্ধ্রপথে যে যে বাড়িতে ঢুকেছে, সেই সেই বাড়িতেই ঘটেছে এই ঘটনা।

রোগ নয়, সর্পাঘাত নয়, দুর্ঘটনা নয়—অজ্ঞাত, অবোধ্য, অকারণ মৃত্যু।

প্রত্যেক ক্ষেত্রেই মরেছে একটি ক'রে বালক—প্রত্যেকেরই হাত-পায়ে গাঢ় রক্তচিহ্ন।

বংশ-নাশের লক্ষণ এ—এই শিশু বা বালকের মৃত্যু। সমস্ত গ্রামেরই অস্তিত্বনাশের পূর্বাভাস বুঝি এ ঘটনা।

আবারও একটা চীৎকার ক'রে উঠলেন হরকিশোর।

না, পাগলের চীৎকার নয়। নিদারুণ বেদনাহত মানুষের আর্তনাদ এটা।

মর্মন্তুদ বেদনার অভিব্যক্তি।

'সব মরবে, সব মরবে সুরথ। একজনও বাঁচবে না এ গ্রামে। বুঝতে পারছ না, বুঝতে পারছ না বেটা—ভগবানের রুদ্ররোষ জেগেছে, অভিশাপ নেমেছে এ গ্রামে। এ রক্তচিহ্ন কিসের তা বুঝছ না? গুরুবংশের রক্তের ঋণ শোধ ক'রে যাচ্ছে এক একজন ক'রে। মহাপাতকের মহা প্রায়শ্চিত্ত এ। এ সইতেই হবে আমাদের। এ যে আমাদের কৃতকর্মের ফল!'

হাহাকার ক'রে উঠলেন তিনি।

ক্রমে আরও বহুলোক ভিড় ক'রে এল।

হতচকিত, আতঙ্কগ্রস্ত, বিস্ময়-বিমূঢ় হতভাগ্যের দল। এমনি চিরদিন এসেছে তারা—বিপদে-আপদে দুর্দিনে—গুরুজীর কাছেই ছুটে এসেছে, এসেছে দেবতার কাছে।

বিষ্ণুপ্রসাদ চিরদিন সব সমস্যার সমাধান ক'রে দিয়েছেন তাদের—উপদেশ দিয়ে, নির্দেশ দিয়ে, সান্ত্বনা দিয়ে।

আজও সেই অভ্যাসেই ছুটে এসেছে তারা।···

আঘাতের আকস্মিকতাটা কেটে যেতে হরকিশোর শান্ত হলেন।

সব কথাই খুলে বললেন ওদের। আর গোপন করার কোন অর্থ হয় না।

বললেন তাঁর গত রাত্রির স্বপ্নের কথা, বললেন কেশবের বিমুখ হওয়ার কথা। নিজের সংকল্পের কথাও বললেন।

বলতে বলতে আবার হাহাকার ক'রে উঠলেন, 'শুনলেন না, শুনলেন না ভগবান আমার কথা, একের পাপে আমাদের এত বড় শাস্তি দিলেন। প্রায়শ্চিত্ত করবার প্রতিশ্রুতি দিয়েও রেহাই পেলুম না। কী হবে, এখন কী করব! কী করলে ঠিক প্রায়শ্চিত্ত হবে—কে বলে দেবে সে কথা!'

বিশ্বাসে-অবিশ্বাসে মেশা কাহিনী, লৌকিকে-অলৌকিকে মেশা ঘটনা।

তবু বিশ্বাস না ক'রেও উপায় নেই।

নিষ্পাপ ব্রাহ্মণ কিশোর-কিশোরীর রক্তপাত হয়েছে, সেই রক্তেরই চিহ্ন ফুটে উঠেছে ওই মৃত শিশুদের হাতে-পায়ে, তাদেরই হত্যার শোধ উঠছে এতগুলি শিশুর মৃত্যুতে!

অতগুলি মৃতের সৎকারের আয়োজনে, হাহাকারে ও বিলাপে সারাদিনই যেন এক দুঃস্বপ্নের মধ্যে দিয়ে কেটে গেল সকলের।

কেউ কিছু ভাববারও অবসর পেল না, কোন কর্ম-পদ্ধতি নির্ধারণেরও না।

তাছাড়া, মনের সমস্ত শক্তি-বন্ধনই তখন শিথিল হয়ে এলিয়ে পড়েছে, কারুর পক্ষে কিছু গুছিয়ে ভাবা সম্ভব নয়।

অবশেষে একসময় সেই একান্ত তিক্ত ও অরুচিকর কর্তব্য শেষ হ'ল। আর তারপর নামল এক দুঃসহ ভয়াবহ রাত্রি।

সন্ধ্যার সময় গ্রামের প্রবীণরা এসে মিলিত হলেন মন্দিরের নিচের চত্বরে। সারাদিন ভোগ হয় নি ঠাকুরের—পূজা আরতি শয়ন কিছুই হয় নি।

অধিকাংশেরই অশৌচ। করবে কে?

হরকিশোর দারুণ অভিমানে বেঁকে বসেছেন—তাঁকে যখন কেশবজী বিশ্বাস করলেন না—আর দুটো দিন ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে পারলেন না, তখন বুঝতে হবে যে তাঁর সেবা কেশবজীর মনঃপূত নয়। তাঁর আর সেবার যোগ্যতা নেই।

তিনি আর পূজা করবেন না—কোনদিনই না।

অনেক খোঁজাখুঁজি অনেক তর্কবিতর্কের পর অবশেষে একটি বারো বছরের ছেলেকে ধরে বাইরে থেকে নির্দেশ দিয়ে সন্ধ্যারতি ও শয়নের কাজ সারা হ'ল। ভোগ বলতে একটু ধারোষ্ণ সদ্যোনীত দুধ নিবেদন ক'রে দেওয়া হ'ল শুধু। তখন আর রান্না করার ইচ্ছা বা অবসর কারুরই নেই; শক্তি তো নেই-ই!

দেবতার শয়ন দেবার পর সভা বসল। এখন কী করা যাবে? কী করা উচিত? সকলের মুখেই এক প্রশ্ন।

কী করলে এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে তা ঠাকুর বলেন নি। বলেছেন শুধু বিষ্ণুপ্রসাদকে ফিরিয়ে আনার কথা। কিন্তু যদি বিষ্ণুপ্রসাদ না আসেন? তাহলে?

তাহলে যে কী হবে তা কেউ জানে না।

প্রত্যেকেই প্রত্যেকের মুখের দিকে চায়।

আরও, যেন একটা দুঃসহ আতঙ্কে সকলের মাথা গিয়েছে গোলমাল হয়ে—কেউই কিছু গুছিয়ে ভাবতে পারছে না।

যদি সত্যিই দেবতার রোষ হয়—আর তাই তো মনে হচ্ছে—তাহ'লে একদিনে কি শান্ত হবে?

কে জানে আজ আবার কার অদৃষ্টে কি আছে!

আজ রাত্রের জন্য আরও কী অকল্পনীয় দুর্ভাগ্য অপেক্ষা ক'রে আছে!

সামনেই দুঃসহ অন্ধকার রাত্রি বিভীষিকার মতো দাঁড়িয়ে, ওর অতল রহস্যময় বুকে আরও কী ভয়ঙ্কর উদ্দেশ্য লুকিয়ে আছে কে জানে!

হরকিশোর এতক্ষণ চুপ ক'রে বসে ছিলেন। বসেছিলেন তিনি মন্দিরের দিকে পেছন ফিরে। সারাদিন কিছুই খান নি—প্রসাদী দুধ একজন দিতে এসেছিল, মাথায় ঠেকিয়ে প্রত্যাখ্যান করেছেন। এ গ্রামে কিছুই আর খাবেন না তিনি—এক যদি বিষ্ণুপ্রসাদকে নিয়ে ফিরে আসতে পারেন তাহলেই আবার প্রসাদ পাবেন এ গ্রামে।

তাঁকেও আলোচনার মধ্যে টেনে আনবার চেষ্টা হয়েছিল কয়েকবার কিন্তু কোন ফল হয় নি। তিনি তাঁর নীরবতা ভঙ্গ করেন নি একবারও।

বিষ্ণুপ্রসাদকে ফিরিয়ে আনা ছাড়া আর কোন প্রায়শ্চিত্তের কথা কেশবজীকে জিজ্ঞাসা করা সম্ভব কিনা—হরকিশোর জিজ্ঞাসা করবেন কিনা—কোন কোন শোকগ্রস্ত উৎকণ্ঠিত পিতা এ প্রশ্নও করেছিলেন।

কিন্তু হরকিশোর সাফ্‌ 'না' বলে দিয়েছেন। ঠাকুর স্বপ্নে তাঁকে দেখা দিয়ে বলেছেন। ইচ্ছা হয় তিনিই বলবেন। প্রশ্ন ক'রে উত্তর পেতে যাওয়া মূঢ়তা মাত্র।

সুতরাং তাঁকে বাদ দিয়েই আলোচনা চালাতে হ'ল এবং অনেকক্ষণ ধরে একটা যুক্তিবদ্ধ আলোচনা করার বৃথা চেষ্টা ক'রে অবশেষে একজন হরকিশোরকে আবার প্রশ্ন করলেন, 'ছোটো পূজারীজী, আপনি তাহ'লে কি ঠিক করলেন?'

হরকিশোর কতকটা তন্দ্রাচ্ছন্নের মতো বসে ছিলেন। এখনও গ্রামের মধ্য থেকে একটানা কান্নার কয়েকটা মৃদু সুর ভেসে আসছে। দূরাগত—তবে নিরবচ্ছিন্ন এবং স্পষ্ট। কান পেতে ছিলেন সেই দিকেই। এবার যেন সেই কষ্টদায়ক তন্দ্রা থেকে জেগে সোজা হয়ে উঠে বসলেন।

'আমি? আমি আজ রাত্রি প্রভাত হওয়ার আগেই রওনা দেব।'

'রওনা দেবেন—কিন্তু গুরুজীকে কি ফিরিয়ে আনতে পারবেন? আসবেন কি তিনি? আপনি কী তাঁর দেখাই পাবেন?'

এমনি অসংখ্য প্রশ্ন ওঠে অসংখ্য কণ্ঠে।

শান্ত ধীর ভাবে সব শোনেন হরকিশোর। তারপর এক-রকমের উদাস কণ্ঠে বললেন, 'জানি না। সত্যিই আমি কিছু জানি না। চেষ্টা করব—হয় তাঁকে ফিরিয়ে আনব নয় তো ফিরব না, এই প্রতিজ্ঞা করেছি ঠাকুরের কাছে। সে কথা রাখব। তারপর তাঁর ইচ্ছে। আজই যাওয়া উচিত ছিল আমার, তখনই।—হয়ত সেই জন্যেই—। অবশ্য যেতে যে পারি নি তাতে আমার কোন দোষ ছিল না। তাও ঠাকুর জানেন। তবে কাল আমি যাবই। আর দেরি হবে না।'

সকলেই চুপ ক'রে রইল।

অকস্মাৎ রাত্রির স্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে দূর বনভূমিতে মর্মর জাগিয়ে দমকা পাহাড়ে-বাতাস উঠল একটা।

হু হু বাতাস।

সে বাতাসে হাড় পর্যন্ত কেঁপে উঠল সকলের। শিউরেও উঠল কেউ কেউ।

কানে মাথায় চাদর মুড়ি দিয়ে সকলে উঠে পড়ল।

দেখা যাক ভাগ্যে কি আছে। যা আছে তাই হবে। আর ভাবা সম্ভব নয়—ভাবতেও কেউ পারছে না।

হরকিশোরও বাড়ির পথ ধরলেন।

মন্দিরের চাবি তাঁর কাছে রাখেন নি। কার কাছে রইল তাও খোঁজ করলেন না।

আর দরকার নেই তাঁর।

এ জীবনে হয়ত আর দরকার হবেও না।

হরকিশোর অন্ধকার নির্জন বনপথ ধরে যখন বাড়ির দিকে হাঁটছিলেন তখন একসময় যেন স্পষ্ট অনুভব করলেন অন্ধকারের মধ্যেই তাঁর আশেপাশে কারা ঘুরে বেড়াচ্ছে।

যেন অশরীরী অতৃপ্ত আত্মা কতকগুলো।

তাদের দীর্ঘশ্বাস এই হু-হু ঝোড়ো বাতাসের মধ্যেও পৃথকভাবে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।

আরও বুঝি সাংঘাতিক কোন সর্বনাশের বার্তা রয়েছে তাদের ঐ নিঃশ্বাসে।

হরকিশোর নিজের অজ্ঞাতসারেই একটু জোরে পা চালালেন।

কিন্তু ঠিক নিজের পল্লীতে প্রবেশ করার পথেই বাধা পেলেন তিনি।

অপ্রত্যাশিত ভাবে বাধা।

কে একজন পিছন থেকে তাঁর উত্তরীয় ধরে টানল।

'দাঁড়ান।'

চমকে উঠলেন একটু। ভয় তাঁর নেই—এই অবস্থায় মরণের ভয় তো নেই-ই—তবু সহজাত সংস্কারেই চমকে উঠলেন যেন।

'কে ?

স্খলিত ভগ্ন কম্পিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন হরকিশোর।

'আমি'। যে তাঁকে পিছন থেকে টেনে দাঁড় করিয়েছিল, সে স্পষ্ট উত্তর দিল।

অন্ধকারে নক্ষত্রের আলোতে যতটা দৃষ্টি যায়, হরকিশোর মুখটা কাছে এনে প্রাণপণে চেয়ে দেখলেন—একটি কিশোরী বালিকা।

চিনতেও পারলেন তাকে।

মালতী।

তাঁরই দূর সম্পর্কের ভাইঝি।

সূর্যপ্রসাদের সঙ্গে বিবাহের সম্বন্ধ ঠিক হয়েছিল ওর। সূর্যপ্রসাদের জন্মমাস এবং সামনের পুরুষোত্তম মাস কেটে গেলেই ওর বিবাহ হবার কথা—আগামী বসন্তকালে।

সর্ব-সুলক্ষণযুক্তা এই রূপসী মেয়েটিকে বিষ্ণুপ্রসাদ চার বৎসর পূর্ব থেকেই চিহ্নিত করে রেখেছিলেন পৌত্রের জন্য। তাঁর বংশের বাগ্‌দত্তা বধূরূপে।

'মালতী ?'

অতিকষ্টে প্রশ্ন করেন হরকিশোর।

'হ্যাঁ, আমি। দাঁড়ান।' তার দুই চোখের আগুন এই অন্ধকারেই লক্ষ্য হয়। আকাশের তারার মতোই জলজলে দুই চোখে যেন ঘৃণা আর বিদ্বেষ উপ্‌চে পড়ে।

সে বলে, 'কোথায় পালিয়ে যাচ্ছেন কাকা, কর্তব্য অসম্পূর্ণ রেখে ? কী হবে সে বৃদ্ধকে ফিরিয়ে এনে ? কেশবজী তুষ্ট হবেন ? কখনও না। তাহ'লে তিনি আপনার প্রতিজ্ঞাতেই তুষ্ট হতেন। পাপের শোধ প্রায়শ্চিত্তে। হিংসার প্রায়শ্চিত্ত প্রতিহিংসা। সূর্যপ্রসাদ আর বিশাখার হত্যাকারীকে বলি না দিলে কেশবজী তৃপ্ত হবেন না কাকা !'

দুহাতে কান ঢাকেন হরকিশোর।

'এ কী বলছ মা। তুমি বালিকা, ভবিষ্যৎ জননী—তোমার উপর বহু সংসারের কল্যাণ নির্ভর করছে। তোমার মুখে এ কথা মানায় না।

রক্তপাতে প্রভু তুষ্ট হবেন এ আমরা ভাবতেই প্যারি না। আমরা যে বৈষ্ণব! না মা, আমাদের প্রায়শ্চিত্তের বিধি অন্যরকম। তুমি শান্ত হও মা, তুমি, তুমি ঘরে যাও।'

মালতী হাসল একটু। তাচ্ছিল্যের হাসি। বলল, 'গ্রামকে রক্ষা করার শেষ সুযোগ হারালেন আপনি। তবে আমি আমার পথ ছাড়ব না—এও জেনে রাখুন।'

আর একবার হাসল মালতী, এবার শব্দ ক'রে। তারপর বোধ হয় চলে গেল। বনপথে কোথায় কোন দিকে গেল, তাও হরকিশোর বুঝতে পারলেন না। অন্ধকারেই এসেছিল, আবার অন্ধকারেই মিলিয়ে গেল।

হরকিশোর আর একবার নিঃশ্বাস ফেললেন, 'হে কেশব! হে কেশব!'

॥ ষোল ॥

হরকিশোরের কিন্তু সে রাত্রি-শেষেও যাত্রা করা হ'ল না।

গত সন্ধ্যায় তাঁর প্রতিজ্ঞা করবার সময় বুঝি বিমুখ ভাগ্যদেবতা ধারে-কাছেই কোথাও দাঁড়িয়ে ছিলেন—আর হেসেছিলেন একটু, হরকিশোরের ঈষৎ স্পর্ধিত প্রতিজ্ঞায়।

অসহায় দুর্বল মানুষকে সে যে কত অসহায়, কত দুর্বল সেইটে বুঝিয়ে দেওয়াতেই বুঝি ভগবানের বেশী তৃপ্তি, বেশী আনন্দ।

হরকিশোরের পুত্র নেই। এক কন্যা—তার বিবাহ হয়ে গেছে। জামাইকে নিজেরই জমির খানিকটা দিয়ে বসত করিয়েছেন। বাড়ি থেকে খুব দূরে নয়—তবে নিজের বাড়ির সংলগ্নও বলা যায় না ওদের বাড়ি।

ঘর-জামাই রাখা ওঁর পছন্দ নয়, জামাইও তা থাকতে রাজী হয় নি।

তবু যতটা কাছে থাকে। একমাত্র মেয়ে। টান একটু থাকে বৈকি!

মন্দির থেকে ফেরার পথে একবার দাঁড়িয়েছিলেন মেয়ের ঘরের সামনে।

মেয়ে-জামাই বসতে বলেছিল, বসেন নি। ভালই আছে ওরা—এইটুকু জেনে বিদায় নিয়ে চলে এসেছিলেন।

তাঁর প্রতিজ্ঞার কথা সবাই জানে।

ওরাও জেনেছে।

ছলছল করতে লাগল মেয়ের চোখ। কিন্তু বাবাকে চেনে বলেই প্রতিনিবৃত্ত করবার চেষ্টা করল না।

তবে একটু ভয়-ভয়ও করছে এটা ঠিক।

কেন কে জানে—মেয়ে বিশোকার কেমন মনে হয়েছিল যে যেহেতু সে হরকিশোরের মেয়ে, আর যেহেতু হরকিশোর ঠাকুরকে খুশী করতেই যাচ্ছেন ঐ অজ্ঞাত পথে, সেই হেতু তাদের কোন ভয় নেই।

ভয় বাবার জন্যই বেশী, কি হবে কে জানে!

বিপদসঙ্কুল দুর্গম পথ।

হরকিশোর সামান্য দু'একটা আশ্বাসের কথা বলে বাইরে থেকেই চলে এসেছিলেন।

বাড়িতে স্ত্রীর মুখও থমথম করছে—দুই চোখ লাল। কতকটা ভয়ে, কতকটা বিরহে, কতকটা হরকিশোরের অমঙ্গল আশঙ্কায়।

হরকিশোর কিছু খাবেন না—তা গৃহিণী জানেন। তিনিও কিছু খান নি এতক্ষণ পর্যন্ত।

হরকিশোরই পীড়াপীড়ি ক'রে খাওয়ালেন তাঁকে।

তাঁর প্রতিজ্ঞার কারণ আছে, সে প্রতিজ্ঞা তিনি রাখবেন। সে জন্য গৃহিণীর উপবাস ক'রে দেহকে ক্লান্ত করার কোন অর্থ হয় না।

গৃহিণীও তাঁর তরফ থেকে বহু অনুনয় বিনয় ক'রে রাজী করিয়ে একটা ঝোলাতে কিছু ঝালমাখানো কড়া রুটি, কিছু ছাতু এবং কয়েক ডেলা পরিষ্কার গুড় দিয়ে দিলেন।

ঝোলার আর একদিকে রইল সামান্য পূজার তৈজস ও একখানা অতিরিক্ত বস্ত্র।

বার বার মাথার দিব্যি দিয়ে বলে দিলেন, হরকিশোর যেন গ্রামের সীমানা ছাড়িয়ে গিয়ে অবশ্য কিছু খেয়ে নেন।

তিনি যে প্রতিজ্ঞা করেছেন এ গ্রামের মধ্যেই তা প্রযোজ্য—গ্রামের বাইরে তা রাখতে হবে এমন কোন দায় নেই। তাছাড়া দেহ যদি সুস্থ সবল না থাকে, কেমন ক'রে ফিরিয়ে আনবেন তিনি গুরুজীকে ঐ দুর্গম পথ দিয়ে?

হরকিশোর বিশেষ কিছু বললেন না।

বাধাও দিলেন না স্ত্রীকে।

বাধা দেওয়া বা বলার মতো দেহ-মনের অবস্থা নয়।

শুধু বললেন, 'কাল ঘরে তালা লাগিয়ে বিশোকার বাড়িতে চলে যেয়ো। গরু দুটোকেও নিয়ে যেয়ো। ফিরতে কত দেরি হবে আমার তা তো বলতে পারি না।'

বিছানায় শুয়ে ইষ্টনাম জপ করতে করতে আকাশ পাতাল ভাবতে লাগলেন হরকিশোর।

গত ক'টা দিন কী ঝড়ই না বয়ে গেল গ্রামের ওপর দিয়ে।

কী নিদারুণ উত্তেজনা, কী দুঃসহ আঘাত।

বিশেষত আজ।

উত্তেজনা ও আবেগেই আরও যেন দুর্বল হয়ে পড়েছেন তিনি, নইলে এমন তিন-চার দিন উপবাসেও তাঁর কিছু হয় না।

বিশেষত মনের অবচেতনে বড় ভয়টা থেকেই গেছে—

কে জানে আবার কাল সকালে কী শুনবেন।

তবে সকাল অবধি থাকবেন না তিনি এটা ঠিক।

শেষ রাত্রে শুকতারা দেখলেই বোঝা যাবে ভোর হচ্ছে—সেই সময়ই রওনা দেবেন তিনি।

আর দেরি নয়।

এই আকাশ-পাতাল ভাবতে ভাবতেই—বুঝি বা অতিরিক্ত শারীরিক ক্লান্তি ও মানসিক অবসাদেই—কখন ঘুমিয়ে পড়েছেন।

একেবারে ঘুম ভাঙল বাইরের দরজায় মুহুর্মুহুঃ প্রবল করাঘাত ও আর্তনাদে।

চমকে জেগে উঠে প্রথমটা যেন আতঙ্কেই বিহ্বল হয়ে গেলেন তিনি—তারপর গৃহিণীকে আলো জ্বালবার কথা বলে কোনমতে হাতড়ে হাতড়ে এসে অন্ধকারেই দোর খুলে দিলেন।

না, ভুল হয় নি তাঁর।

জন্মের প্রথম দিন থেকে একটু একটু ক'রে যাদের বড় ক'রে তুলতে হয়—বুকের রক্ত দিয়ে, জীবনের সমস্ত সাধ্য দিয়ে—তাদের কান্না ভুল হবার কথাও নয়।

গাঢ় ঘুমের মধ্যেও এ কান্না কার তা বুঝতে পেরেই অমন বিহ্বল হয়ে গিয়েছিলেন।

দোর খুলে কোন প্রশ্ন করতে হ'ল না। 'কে' এ প্রশ্ন তো অবান্তর, অনাবশ্যক।

আর কিছু বলতেও হ'ল না।

বিশোকোর কোলে তার মৃত শিশুপুত্র। পিছনে জামাতা একটা মশাল হাতে এসে দাঁড়িয়ে।

শোকে আর্তনাদ করছে না, ভয়ে ঠকঠক ক'রে কাঁপছে।

শোক করার মতো, আঘাতটা উপলব্ধি করার মতো অবস্থাও আর তার নেই। জড় জন্তুর মতো হয়ে গেছে।

'কী করলে বাবা তুমি? এ আমার কী হ'ল। কী পূজো করলে এতকাল আদিকেশবের। আমারও এই সর্বনাশ কেন হ'ল! কেন হ'ল!'

হাহাকার ক'রে উঠল বিশোকা।

ছেলের দেহটা প্রায় ছুঁড়ে বাপের পায়ের ওপর ফেলে দিয়ে নিজেও আছাড় খেয়ে পড়ল।

কিন্তু এই তো শেষ নয়।

ঐ যে গ্রামে আরও রব উঠেছে—বুকফাটা কান্নার!

না—গতকালের জের নয়; তা কেউ বলে না দিলেও বুঝতে পারলেন হরকিশোর।

এ টাটকা—এখনকার ঘটনার ফল। নতুন সর্বনাশ ঘটেছে—নতুন নতুন মৃত্যুর সংবাদ পাচ্ছেন তিনি ক্রন্দনের ঐ কলরোলে।

বিশোকার কান্নার শব্দে বহু লোক ছুটে এল।

গ্রাম ভেঙেই এল বলতে গেলে সকলে!

যাদের ছেলেমেয়ে মরেছে তারা মৃত সন্তান নিয়ে ছুটে এল।

'এ আমাদের কি হ'ল! এখন বলে দাও কি করব আমরা, কী করলে এ রোষ শান্ত হবে ভগবানের!'

সকলের মুখেই এই এক প্রশ্ন।

মেয়েদের মুখে অবশ্য।

পুরুষেরা হতবাক হয়ে গেছে। ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেছে তারা।

কাঁপছে ঠক ঠক ক'রে—প্রথম দক্ষিণাবাতাস লাগা বেতস-পত্রের মতো।

রক্তশূন্য সাদা হয়ে গেছে তাদের মুখ—যেন এক রাত্রের মধ্যে কোন ডাকিনী তাদের সকলের রক্ত শুষে নিয়েছে।

তারা কিছু ভাবতেও পারছে না। শোক প্রকাশ করতেও না। আঘাতের অনুভূতিটাও তীব্রভাবে উপলব্ধি করার শক্তি হারিয়েছে তারা।

সেই অজ্ঞাত মহামারীতেই মরেছে এই শিশুগুলোও—সেই হাতে-পায়ে গাঢ় রক্তচিহ্ন, সেই এক ধরনের মুখের ভাব। বুঝি এতে কারও রক্ষা নেই। গ্রামে কারও বংশে বাতি দিতে থাকবে না কেউ।

পাথর হয়ে গিয়েছিলেন হরকিশোরও!

কোন জ্ঞান, কোন অনুভূতিই ছিল না যেন আর।

কী ঘটছে তাও ভাবতে পারছেন না।

কোথায় একটা ভোরের পাখী ডেকে উঠল।

উত্তুরে বাতাস উঠেছে জোর।

মাথার ওপরে পাহাড়ের চূড়াগুলো ঝাপ্‌সা ঝাপ্‌সা দেখা যাচ্ছে—জমাট ডেলাবাঁধা অন্ধকার ফিকে হয়ে এসেছে সেখানে।

শুকতারা কখন ঢলে পড়েছে পশ্চিম দিকের বড় পাহাড়টার আড়ালে, এতক্ষণ লক্ষ্য করে নি কেউ।

ক্রমে ফর্সা হ'ল একটু একটু ক'রে।

পাহাড়ের মাথা রাঙা হয়ে উঠল।

আর একটু পরে রক্ত-তিলকের মতো একফালি রোদ এসে পড়ল উত্তরের বড় পাহাড়টার শিখরে।

প্রভাত আলোর সঙ্গে সঙ্গে গ্রামবাসীদেরও সম্বিৎ ফিরে এল একটু।

হাহাকার ক'রে কাঁদছিল যে মেয়েরা, তারা বুঝি শ্রান্তিতেই শান্ত হয়ে এসেছে।

পুরুষরা এবার মেয়েদের থেকে পৃথক হয়ে এক জায়গায় এসে দাঁড়াল।

কী করা হবে এখন ? কী করা উচিত ?

সেই পুরনো নিরুত্তর প্রশ্ন।

তবে একটা বিষয়ে আর কোন দ্বিমত নেই—যে, যা কিছু ঠিক করতে হবে—আজই, এখনই। আর এতটুকু দেরি করা সম্ভব নয়।

তবু প্রশ্ন আর প্রতি-প্রশ্নে বেলাই বাড়তে থাকে শুধু, কোন মীমাংসা হয় না। কিছুই ঠিক হয় না।

মীমাংসা খোঁজবার মতো, বিচার ক'রে কোনও পথ দেখে নেবার মতো একটুকুও শক্তিও বুঝি কারুর আর অবশিষ্ট নেই।

মনে হ'ল—এমনি ক'রে বসে বসেই তারা মরবে।

এই ''উদ্যতবজ্র মহদ্ভয়' দৈবরোষের সঙ্গে যুদ্ধ করার চেয়ে এই প্রত্যক্ষ, সামনে এসে-দাঁড়ানো মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করার চেয়ে বুঝি সোজাসুজি মরাই তাদের কাছে ঢের সহজ, এমন কি কাম্যও।

আর পারে না তারা, আর পারছে না।

কারুর মাথাতেই এই দুর্দশার, এই দুঃসহ দুঃখের প্রতিকারের কোন উপায় আসে না।

যখন প্রায় হতাশায় সবাই হাল ছেড়ে দিয়েছে তখন এক কাণ্ড ঘটল।

বিশোকা এসে প্রথম আছড়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই হরকিশোরের স্ত্রীও মূর্ছিত হয়ে পড়েছিলেন।

কিন্তু তাঁর দিকে কেউ নজর দেয় নি। কে-ই বা দেবে?

কেউ অজ্ঞান হতে দেখে নি বলে কখন যে তাঁর জ্ঞান হয়েছে, তাও কেউ লক্ষ্য করে নি।

জ্ঞান হবার পরও অনেকক্ষণ মূর্ছাতুরভাবে বসেছিলেন চুপ করে।

হঠাৎ তিনি যেন জ্যা-মুক্ত ধনুকের মতো ছিটকে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

তারপর যা কখনও তিনি করেন নি—কেউ করে না এদেশে—তাই করলেন। সেই অনাত্মীয়বহুল পুরুষদের জমায়েতের সামনে এসে দাঁড়িয়ে বললেন, 'চল, আমরাও সকলে চলে যাই এ গাঁ ছেড়ে। আজই, এখনই। এই এক বস্ত্রে—যেমন আছি তেমনি। দেবতাকে পিছনে রেখে চলে যাই এসো। এ গ্রামে কেশবজীর অভিশাপ লেগেছে—এ গ্রামের কল্যাণ নেই আর। এখানে থাকলে কেউ বাঁচবে না।'

সকলেই অবাক।

এ গাঁ ছেড়ে চলে যাব—সবাই, সকলকে নিয়ে!

কিন্তু তা কি সম্ভব?

প্রত্যেকেই নীরবে প্রত্যেকের মুখের দিকে তাকাতে লাগল।

হরকিশোরের স্ত্রী আবারও বললেন, 'চল, আমরাও সেখানে যাই—গুরুজী যেখানে গেছেন। তাঁকে সব কথা বললে, আমাদের সকলের এই দুঃখ দেখলে হয়ত তাঁর কৃপা হবে। তিনি যদি আমাদের ক্ষমা করেন তো ভগবানও ক্ষমা করবেন—তখন আমরা গুরুজীকে নিয়েই ফিরব।'

'কিন্তু তা কি সম্ভব মাতাজী?'

'কেন সম্ভব নয়? নইলে এমনি ক'রে অসহায়ভাবে বসে বসে নিশ্চিহ্ন হবে সবাই?···কেউ থাকবে না, কেউ বাঁচবার আশা রেখো না। এখন

বংশধররা যাচ্ছে, এর পর তোমরাও যাবে। রুদ্র রুষ্ট হয়েছেন, প্রবল তৃষ্ণা নিয়ে জেগে উঠেছেন—সকলকার রক্ত ছাড়া তাঁর পিপাসা মিটবে না।'

এবার মৃদু গুঞ্জন উঠল একটা। সে গুঞ্জনের তরঙ্গ এসে লাগল নারীদের মধ্যেও।

হ্যাঁ—কথাটা এ মন্দ বলে নি।

হয়ত এ-ই একটা বাঁচবার উপায় আছে এখনও।

গ্রাম ত্যাগ ক'রে গেলে হয়ত এই অভিশাপ আর এই অভিশপ্ত গ্রামের দূষিত আব্‌হাওয়া এড়াতে পারা যাবে।

পথের বিপদ?

না হয় দু'চারজন মরবে।

এখানে থাকলে সকলেই মরবে, গেলে তবু হয়ত দু'চারজনেরও অন্ততঃ বাঁচবার সম্ভাবনা থাকবে।

যতই কথাটা আলোচিত হ'তে থাকে ততই যেন প্রস্তাবটার সম্ভাব্যতাটাও লোকের মনে লাগে।

ছোটখাটো বিরুদ্ধ যুক্তির মেঘ যে না উঠল তা নয়—ছোটখাটো মায়া, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র স্বার্থ—কার গরু ছেড়ে যাওয়ায় অসুবিধা, কার গর্ভিনী পুত্রবধূর সমস্যা—কারো বা আরও ছোট কোন বন্ধন—কিন্তু এসব যুক্তি ও অসুবিধার কাল্পনিক মেঘ অধিকাংশের মতের প্রবল ঝড়ে উড়ে গেল।

যেখানে সমূহ সর্বনাশ সামনে, সেখানে ছোটখাটো অসুবিধার কথা তোলে মূর্খতে।

আপৎকালে অনেক কিছুই ত্যাগ করতে হয়। কার কি ঘটি-বাটি, গরু-বাছুর পড়ে থাকবে তা ভাবতে গেলে আর চলবে না।

প্রাণ যেখানে যেতে বসেছে—বংশনাশের প্রশ্ন যেখানে মুখ্য—সেখানে কী আঁকড়ে ধরে থাকতে চাও তোমরা, ক'দিন ধরে রাখার আশা করো?

শেষে বহু আলোচনা বহু উত্তেজনা—চেঁচামেচি গণ্ডগোলের পর স্থির হ'ল যে, তাই হবে, আজই অপরাহ্নে সকলে রওনা হয়ে যাবে।

শীতবস্ত্র এবং খাদ্য—এ-ছাড়া কেউ কিছু সঙ্গে নেবে না—পাহাড়ে-পথে যে-জিনিস অবশ্য নেওয়া দরকার তা-ই শুধু নেবে।

যে সব শিশু আজ মারা গেছে—স্থির হ'ল তাদের সকলকে একটা চিতায় শুইয়ে মুখাগ্নি দিয়েই রওনা হয়ে পড়বে। যতটুকু পোড়ে পুড়বে—যা না পুড়বে তা পড়ে থাকবে।

যারা গেছে তাদের কথা চিন্তা ক'রে—এখনও যারা আছে তদের জীবন বিপন্ন করার কোন অর্থ হয় না।

পিছনে ফিরে তাকাবার আর অবসর নেই।

বাড়ি? ঘর? ফসল? গোলা? গরু?

সব থাক!

গরু ছেড়ে দাও। গরু, ছাগল, ভেড়া যার যা আছে। তারা চরে খাক।

যদি কোনদিন আবার ফিরে আসি, ফিরে আসতে পারি—তখন দেখা যাবে।

এখন আর কিছু নয়।

'কিন্তু কেশবজী?' কে একজন প্রশ্ন করল যেন পিছন থেকে।

বোধ হয় সুরযের বাবা।

হরকিশোর সেই প্রত্যূষকাল থেকেই স্তব্ধ প্রস্তরবৎ দাঁড়িয়েছিলেন—একবারও নড়েন নি, একটা কথারও উত্তর দেন নি, এইবার যেন তাঁর টনক নড়ল।

তিনি হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, 'থাক, থাক ও পাথরের ঠাকুর পড়ে। যে শ্মশান রচনা করেছে সেই শ্মশানেই পড়ে থাক ও।'

না না। বাপ্‌রে।

সবাই শিউরে উঠল কথাটা শুনে।

তা কখনও হয়।

দেবতা নিরম্বু থাকবেন।

একেই তো ওঁর রোষে পড়ে এই হাল হয়েছে—আবারও ওঁকে রুষ্ট করা!

কিন্তু এ সমস্যারও সমাধান ক'রে দিলেন হরকিশোরের স্ত্রী।

বললেন, 'ঠাকুর আমাদের সঙ্গেই যাবেন। ঠাকুরকে ফেলে যাবার কথা কে বলছে? তবে পথে যতটুকু সেবা সম্ভব তাই হবে। তার বেশী করবই বা কি ক'রে, কি দিয়ে?'

এইবার সবাই খুশী হ'ল।

স্থির হ'ল ব্রাহ্মণরা—এখনও যাদের অশৌচ হয় নি—পালা ক'রে বহন করবেন কেশবজীকে। তাঁরাই যথাসম্ভব সেবাও করবেন।

॥ আঠারো ॥

সে এক বিচিত্র দৃশ্য। অদ্ভুত অভিজ্ঞতা সকলের।

গ্রাম শূন্য ক'রে চলেছে সবাই—নর-নারী বালক-বালিকা—জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে। চলেছে নিরুদ্দেশের পথে, যেন এক দুর্নিবার আতঙ্ক তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে তাদের।

যেতেই হবে।

কোথায় যাচ্ছে তা ঠিক কেউ জানে না।

কী উদ্দেশ্য—তাও খুব স্পষ্ট নয়।

গুরুজীর দেখা না পেলে কী করবে? কিংবা যদি তিনি ফিরে আসতে রাজী না হন?

তা কেউ জানে না, কেউ অত ভেবে দেখে নি।

ওরা কি দেবতার রোষ থেকে পালিয়ে আত্মরক্ষা করতে যাচ্ছে—না শান্ত করতে যাচ্ছে তাঁকে? কে জানে!

চল চল, শুধু এখন বেরিয়ে পড় তাড়াতাড়ি।

ভয়ঙ্করী কালরাত্রি নামবার আগে, মৃত্যুদূতরা তাদের কৃষ্ণপক্ষ বিস্তার করার আগে—পালাও, পালাও!

গত দু রাত্রির বিভীষিকা যেন আর তাদের স্পর্শ করতে না পারে, ক্ষতি করতে না পারে।

চলে গেল সবাই। সত্যি চলে গেল।

সূর্যাস্তের শেষ আভাটুকু পাহাড়ের চূড়ো থেকে মুছে যাবার আগেই সকলে নিরাপদে গ্রাম-সীমানা ছাড়িয়ে চলে গেল নদী পার হয়ে।

সকলেরই চোখে জল, বুকে হাহাকার।

অনেক প্রিয়বস্তু, অনেক আশার সামগ্রী ফেলে রেখে যেতে হ'ল, প্রিয়তম সন্তানদের।

সামনে অজানা পথ, অনির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ।

তবু যেন একটা আশ্বাসও কোথায় অনুভব করছে ওরা।

হয়ত আপাততঃ প্রচণ্ড সর্বনাশটাকে এড়াতে পারবে, রক্ষা পাবে নিশ্চিত ধ্বংস হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থেকে।

তার পর যদি ভগবান মুখ তুলে চান তো ফিরতেও পারবে আবার

একদিন।…এই আশা নিয়েই তারা সেই অভিশপ্ত গ্রাম, তাদের বহু পুরুষের বাসভূমি পেছনে রেখে অজানা বিপদসঙ্কুল ভয়বহুল পথে পা বাড়াল। পেরিয়ে গেল নদী, ছেড়ে চলে গেল অভ্যস্তপথের সীমানা।

সবাই চলে গেল একে একে।

তারপর একসময় সেই অভিশপ্ত মৃত্যুপুরীতে নেমে এল রাত্রির অন্ধকার, নিশ্ছিদ্র সূচীভেদ্য অন্ধকার।

কারণ, কোন বাড়িতে কোন ঘরে সেদিন আলো জ্বল্‌ না—জ্বল্‌ না কোন পাকশালার চুল্লি।

দেবতার মন্দিরও রইল সন্ধ্যারতিহীন, নিষ্প্রদীপ।

হা হা করতে লাগল ঘর-দোর।

তার কোণে কোণে শুধু বুঝি লুকিয়ে রইল ভয়ঙ্কর নাম-না-জানা কোন বিভীষিকা।

রইল এক অকথিত অভিশাপ, আর সেই অভিশাপের নিত্যসঙ্গী একদল অশরীরী প্রেত।

নির্জন নিশীথ রাত্রি।

একটু পরেই হু-হু হাওয়া উঠল—হিমালয়ের বিশেষ নৈশ হাওয়াটি।

সে হাওয়াতে শুধু হাড়ের মধ্যে মধ্যে কাঁপনই জাগায় না, মনের মধ্যে একটা অকারণ অস্থিরতার সৃষ্টি করে।

আতঙ্কের-স্পর্শ-লাগা এক রকমের অস্বস্তি।

এই অন্ধকার জনহীন পুরীতে সে হাওয়া যেন একটা সকরুণ আর্তনাদ তুলে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

সে হাওয়া থেকে আত্মরক্ষা করার আর তাগিদ নেই কারুর ; কেউ জানালাগুলো টেনে বন্ধ ক'রে দিচ্ছে না ভাল ক'রে।

মধ্যে মধ্যে এক একটা দমকা বাতাসে মালিক-পরিত্যক্ত ঘরবাড়ির জানালা-দরজাগুলো শুধু আছড়ে পড়ছে।

আর শব্দ উঠছে, মধ্যে মধ্যে যখন ভয় পেয়ে গৃহহীন গাভী আর নিরাশ্রয় কুকুরগুলো কেঁদে কেঁদে উঠছে।

তা ছাড়া চারিদিক এত নিস্তব্ধ যে, কান পেতে থাকলে মাঠে ইঁদুরগুলোর ঝগড়া করার কিচমিচ শব্দও শোনা যায়।

কিন্তু শুনবে কে? মানুষ আর কেউ নেই সে গ্রামে। শুধু—

হ্যাঁ—শুধু যদি থেকে থাকে তো বৃন্দাপ্রসাদ।

তার খবর কেউ রাখে না। হয়ত সে গ্রাম ছেড়েই চলে গেছে কোথাও—হয়ত আত্মহত্যাই করেছে। কিংবা এখানেই পড়ে আছে এখনও।

এই নির্জন নিস্তব্ধ মৃত্যুপুরীতে। হয়ত কখনও আপনমনেই ঘুরে বেড়াচ্ছে চীর গাছের জঙ্গলে—আর মধ্যে মধ্যে হেসে উঠছে, তার সেই আনন্দহীন, তৃপ্তি-হীন অট্টহাসি।

যদি থাকে তো সে-ই রইল এই জনহীন শূন্য গ্রামে—ঐ অভিশপ্ত অশরীরী আত্মাদের সঙ্গী হয়ে, একমাত্র শরীরী মানুষ।

॥ উনিশ ॥

কিন্তু না, তাও ঠিক নয়।

আরও একজন ছিল।

কেউ লক্ষ্য করে নি তাকে। খোঁজও করে নি কেউ অবশ্য।

লক্ষ্য করার মতো, খোঁজ করার মতো কারুর মনের অবস্থা ছিল না।

ঠিক কে গেল আর কে পড়ে রইল—কে কে মরেছে আর কে কে বেঁচে আছে এখনও—এ হিসেব রাখার মতো মানসিক স্থৈর্য নেই কারুর।

সব হিসেবই যেন গেছে গুলিয়ে। যেমন প্রলয়-রাতে মানুষের সব কীর্তি—তার সব সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনা, তার ছোট-বড় সব ইতিহাস কোথায় মিলিয়ে যায়।

নিজেরই কে কোথায় রইল সে কথা কেউ জানে না।

হয়ত আছে, হয়ত নেই। হয়ত বেঁচেই নেই। কে জানে?

কে কে যেন ম'ল না? কারা কারা যেন? ক'জন ম'ল বল তো? আমার কোন আপন-জন?

এমনি উদ্‌ভ্রান্ত অসংলগ্ন প্রশ্নও করেছে কেউ কেউ। যারা করছে না তাদের মনের মধ্যেও হয়ত অনুচ্চারিত থাকছে এই প্রশ্ন।

জানি না, কিচ্ছু জানি না। কে আছে আর কে নেই।

বিরক্ত ক্লান্ত উত্তরও ধ্বনিত হচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে। কিম্বা অমনিই অনুচ্চারিত থাকছে।

থাকে তো আছেই। একদিন খুঁজে পাবোই।

এই 'মৃত্যু-তরঙ্গিনী-ধারা-মুখরিত ভাঙনের ধারে' এই মহাশোকের প্রদোষ অন্ধকারে ক্ষুদ্র শোকের ক্ষুদ্র স্বার্থের হিসেব কে রাখে!

রাখা সম্ভব নয়।

শুধু চল এখন! পালাও। বাড়ি ঘর ছেড়ে বেরোও।

দ্রুত, দ্রুত— আরও দ্রুত।

বেরিয়ে পড়ো, বেরিয়ে পড়ো—এই ছিল তখনকার মূল কথা, প্রধান নির্দেশ।

অন্ধকার হবার আগে, সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার আগে এ অভিশপ্ত গ্রাম ছাড়তে হবে—এইটেই বড় কথা, আসল কথা।

লগুড়াহত গড্ডলিকার মতো বেরিয়ে পড়েছিল তারা—শোকাহত জড়বৎ শত শত প্রাণী। সে ভিড়ে সে তাড়াতাড়িতে কে কোথায় ছড়িয়ে পড়ল, কার সঙ্গে গেল কে—তা দেখা বা সকলের হিসেব রাখার কথা মনেও পড়ে নি কারও।

আর দরকারই বা কি?

সকলেই সকলের পরিচিত।

বাইরের লোক কেউ আসে নি এ গ্রামে দীর্ঘকালের মধ্যে।

যে এসেছিল সে চলে গেছে। সম্ভবত প্রাণ হারিয়েছে এতদিনে।

বহুদিন ধরে—বহু-পুরুষ ধরে এক জায়গায় বাস করছে; অনেকেই অনেকের আত্মীয়। যারা আত্মীয় নয়, এক বর্ণের লোক নয়—তারাও দীর্ঘ-পরিচিত। আত্মীয়বৎ।

কাজেই কোন শঙ্কা জাগে নি কারুর মনে। হিসেব রাখার কথা মনে হয় নি।

বাঁচাটাই তখন আসল কথা।

কোনমতে বেঁচে থাকা। টিকে থাকা।

তারপর থিতিয়ে বসার, যার যার আত্মীয় একত্রে মিলিত হওয়ার ঢের সময় পাওয়া যাবে।

ঢের সময় পাওয়া যাবে আখেরী হিসেব-নিকেশের।

ততক্ষণ চল, শুধু এগিয়ে চল।

এ গ্রামকে পিছনে ফেলে, মৃত্যুপুরী ত্যাগ ক'রে।

সময় নেই, সময় নেই যে একটুও।

সূর্য ঐ ওধারের দূর বশিষ্ঠ-শৃঙ্গের আড়ালে ঢলে পড়বার আগেই নদী পার হ'তে হবে।

ওপারে আছে জীবন, আছে আশ্বাস।

আছে আবার পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত হবার সুযোগ। নূতন জীবন পত্তনের সম্ভাবনা।

মালতীও জানত সেকথা।

এই মনস্তত্ত্ব সেও বুঝেছিল।

তারই সুযোগ নিয়েছিল সে।

কিছুই করে নি। লুকোবার জন্য, আত্মগোপন করার জন্য, তার কথাটা ভুলিয়ে দেবার জন্য বিশেষ কোন চেষ্টাই করতে হয় নি তাকে।

হ্যাঁ, একসঙ্গেই বেরোতে হয়েছিল, তা নইলে তখনই কথা উঠত: সতর্ক সজাগ হ'তেন বাবা-মা।

নিঃশব্দে সাগ্রহেই বেরিয়ে এসেছিল সে, তার নিজস্ব ছোট্ট পুঁটুলিটি নিয়ে। বরাবরই চলেছিল বাবা-মা ভাই-বোন চাচা-চাচীর সঙ্গে সঙ্গে।

একেবারে গ্রামের প্রান্তে এসে—যেখানে সকলে মিলিত হয়ে নদী পার হওয়ার কথা—সেখানে পৌঁছে সকলের ব্যস্ততার সুযোগে ভিড়ে মিশে গিয়েছিল।

তারপর—তাড়াতাড়িতে চলবার সময় একটু পিছিয়ে পড়া, একটু পাশ-কাটানো—আর তারই মধ্যে একসময় সেব্‌ গাছের বাগিচার ছায়াঘন পত্রপল্লবের আড়ালে লুকিয়ে পড়া—এ আর এমন কঠিন কি?

নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করেছিল সে, যতক্ষণ না শেষ গ্রামবাসীটি নদী পেরিয়ে ওপারের চেনার আর চীর গাছের জঙ্গলের আড়ালে মিলিয়ে যায়।

তার শেষ পরিচিত, আত্মীয়, বন্ধুজন।

এক সময় চলে গেল সকলেই। তার বাবা-মা ভাই-বোন মামা-মামী। সকলেই তারা এ গাঁয়ের। চিরদিনের আপন। চোখ মেলে পর্যন্ত তাদের দেখছে। আপন বলে জেনেছে।

তারা কেউ আর রইল না এপারে পড়ে।

ওই খবর নিতে, ওকে বিপদ থেকে রক্ষা করতে—ভয়ের দিনে আশ্বাস দিতে কেউ অবশিষ্ট থাকল না।

কিন্তু তবু মালতী চলে যেতে পারল না।

পারল না ওদের সঙ্গে দল বেঁধে জীবনের দিকে, নির্ভয়ের দিকে, নিরাপত্তার দিকে এগিয়ে যেতে।

মরণের ভয়ও পারল না তাকে ওদের সঙ্গে বেঁধে দিতে।

পারল না এ গ্রাম ছেড়ে যেতে বাধ্য করাতে।

তার কারণ ওর কিশোরী-মন যাকে সবচেয়ে আপন বলে মনে করতে

শিখেছিল, যাকে ভেবেছিল জীবনের সাথী, কখন মনে মনে কল্পনায় সমস্ত সুখ দুঃখ জীবন মরণ ইহকাল পরকাল জড়িয়ে দিয়েছিল তার সঙ্গে—সে-ই যে রইল এই গ্রামে পড়ে।

ঐ নদীতীরের শ্মশানঘাটে তার ভস্মমাত্র-অবশেষ বাতাসে উড়ছে।

শেষ হয়ে গেছে তার সব।

তার সেই কিশোর কন্দর্পের মতো রূপের, প্রথম-যৌবন-বিকশিত তরুণ শিবের মতো দেবদুর্লভ তনুর আর কোন চিহ্নও নেই কোথাও।

তাকে ছেড়ে যাবে কেমন ক'রে!

ঐ মুষ্টিমেয় ভস্ম যে আজও এখানে আছে। ঐ তো তার শেষ অবলম্বন।

ওরই বা আর কী রইল ইহজীবনে? কিসের লোভে, কোন্ সুখের আশায় বাঁচবে সে?

হ্যাঁ, আনুষ্ঠানিক বিয়ে হয় নি সেটা সত্য। শাস্ত্রমতে কোন আচার-অনুষ্ঠানের বন্ধনে বাঁধা পড়ে নি ওরা, সুতরাং সেরকম আর একটা বিবাহ এখন ওর আটকায় না। স্বচ্ছন্দেই হ'তে পারে—তবু, ওর মন কি পারবে বধূবেশে গিয়ে অপর কোন তরুণের হাতে হাত দিতে?

না, না—সে সম্ভব নয়। কিছুতে সম্ভব নয়।

ভাবতেও যেন শিউরে ওঠে শরীর মন।

তাহ'লে নিজেকে দ্বিচারিণী মনে হবে। মনে হবে নিজেকে অসতী।

সতী মায়ের মেয়ে সে, সতীর পৌত্রী। সতীর দৌহিত্রী।

তার বংশে আজ পর্যন্ত এমন কোন কলঙ্ক, কোন পাপ স্পর্শ করে নি।

তার দ্বারাও করবে না। কোন দুর্নাম লাগতে দেবে না সে ঐ পবিত্র বংশের নামে।

সে মৃত্যুকেই বরণ ক'রে নিত এতদিন,—চিরকালের মতো এই অদ্ভুত বিবাহ হীন বৈধব্য বরণ করার চেয়ে মৃত্যু বরণ করা ঢের ঢের বেশী সহজ এবং কাম্য—শুধু পারে নি একটা কারণে।

এখনও একটি কর্তব্য বাকী আছে তার।

এক মহান দায়িত্ব।

বেচারী সূর্যপ্রসাদের অকালমৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়া হয় নি এখনও।

সূর্যপ্রসাদের হত্যাকারী যে এখনও জীবিত।

পরোপকার করতে যাওয়ার, অপরের জীবন রক্ষা করতে যাওয়ার এমন পুরস্কার আর কেউ এখনও পায় নি—যেমন সূর্যপ্রসাদ পেয়েছে।

একটা মহান্ উদ্দেশ্য, সাধু প্রচেষ্টার পরিবর্তে পেয়েছে ঘৃণিত মৃত্যু; আততায়ীর হাতে ঘাতকের হাতে প্রাণ গিয়েছে তার।

তার সেই কোমল কিশোর প্রাণ বুঝি করুণ ব্যথিত নেত্রে তাকিয়ে আছে মালতীরই দিকে। এই হত্যার, এই অন্যায়ের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য।

যদি কেউ না করে, যদি সারা গ্রামের লোকই ভুলে যায় তাদের অবশ্য কর্তব্য, ভুলে যায় যদি সেই নিষ্করুণ ইতিহাস—তবে মালতীকেই আসতে হবে এগিয়ে।

সে নারী, সে বালিকা—তার সাধ্য তার শক্তি একান্তভাবে সীমিত!

আর সে কথা তার চেয়ে বেশী কে জানে!

তবু প্রাণপণ চেষ্টা করবে সে। চেষ্টা করতে তো দোষ নেই।

না হয় সে চেষ্টায় সে প্রাণই দেবে।

তবু তো সূর্যপ্রসাদের আত্মা তৃপ্ত হবে, শান্ত হবে তার ক্ষোভ।

বুঝবে যে অন্তত একটি প্রাণ, একটি মানুষ জীবনমরণে তার প্রতি বিশ্বস্ত ছিল, তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে নি, ভুলে যায় নি তাকে।

বৃন্দাপ্রসাদকে বধ করা?—সে তো যখন তখনই করতে পারত সে; এ ক'দিনে বহু সুযোগ পেয়েছে, পেয়েছে অনেকবার অনেক অবসর।

কিন্তু উন্মাদকে হত্যা ক'রে কি হবে? সে তো বুঝতেও পারবে না—কেন, কিসের জন্য নিহত হ'ল সে!

আর তাতে উপযুক্ত শোধ নেওয়াও হবে না—তার বন্ধু, তার স্বামী, তার দয়িতের অকাল-মৃত্যুর।

যে কাজে প্রাণ দিল সে, যে উদ্দেশ্যে সে মৃত্যুবরণ করল—সেই কাজকে সফল করতে হবে সকলের আগে।

সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে হবে।

শুধু সূর্যপ্রসাদ নয়—বিশাখাও তৃপ্ত হবে। কৃতজ্ঞ হবে তার প্রতি।

আর সেই একই কাজের দ্বারা বৃন্দাপ্রসাদের এতবড় ঘৃণিত আচরণ—এতবড় পাপও নিষ্ফল হয়ে যাবে।

সেইটে তাকে দেখিয়ে দিতে হবে, বুঝিয়ে দিতে হবে—পাগলকে আরও পাগল ক'রে দিতে হবে—অসহায় ব্যর্থ রোষে, প্রতিকারহীন চিত্তক্ষোভে; তারপর উঠবে তার প্রাণবধের প্রশ্ন।

আসবে পাপিষ্ঠের প্রাণহননের কাল।

অর্থাৎ সর্বাগ্রে চেষ্টা করতে হবে—বাহ্রামকে বাঁচাবার। তাকে মুক্ত করবার!

যদি সম্ভব হয় অবশ্য।

কিন্তু সে কী এতদিন বৃথাই গুরুজীর কাছে শুনেছে যে, কোন কাজ যত্ন ক'রে সম্পাদন করার পরও যদি নিষ্ফল হয়—তবে তাতে কারুর কোন অক্ষমতা বা অপরাধ প্রকাশ পায় না!

॥ কুড়ি ॥

তখনও ওর সেই সব স্বজনদের, ওর গ্রামবাসীদের শেষ পদশব্দ দূর বনান্তরালের স্তব্ধতায় একেবারে বিলীন হয়ে যায় নি! তখনও বোধ হয় তাদের শোকাহত কণ্ঠের অস্ফুট গুঞ্জন পর্বতের কন্দরে কন্দরে প্রতিধ্বনি তুলে মাথা কুটে মরছে—মালতী ঈষৎ অসহিষ্ণুভাবেই সেব্ বাগিচার ছায়ার আশ্রয় ছেড়ে বেরিয়ে এল।

এবার সে স্বাধীন, এবার সে মুক্ত।

আর কারও কৌতূহলী সপ্রশ্ন দৃষ্টি থেকে নিজেকে আড়াল করতে হবে না। অপেক্ষা করতে হবে না কারও অন্যমনস্ক হবার।

সে এবার নিশ্চিন্ত হয়ে ফিরে চলল তাদের পাড়ার দিকে—নিজেদের বাড়ির দিকে।

না, বিষ্ণুপ্রসাদের বাড়ির দিকেই।

দ্রুত নেমে আসছে অন্ধকার; এসব পাহাড়ে-জায়গায় সূর্য অস্ত যাওয়ার মাত্র অপেক্ষা, তারপরই যেন কোথা থেকে হুড়মুড়িয়ে নেমে আসে রাত্রি—যত রাজ্যের অন্ধকার সঙ্গী-সঙ্গিনীদের নিয়ে।

কিন্তু মালতীর মনে কোন ভয় নেই।

ভয় সে বহুদিনই ভুলে গেছে।

এক চিন্তায় নিজের সব সুখদুঃখ ভালমন্দর চিন্তা ডুবে গেছে।

কিছুরই পরোয়া করে না সে। নিজের প্রাণেরও না।

আর যার নিজের প্রাণের চিন্তা নেই, ভবিষ্যতের চিন্তা নেই,—ইহলোকের কোন বিপদ, কোন আশঙ্কাই তাকে ভয় দেখাতে পারে না।

মালতী সেদিক দিয়ে নিশ্চিন্ত। তার নিজের বাঁচবার কোন ইচ্ছা নেই, জীবন সম্বন্ধে কোন আশা নেই, সুতরাং তার কোন ভবিষ্যৎও নেই।

আছে শুধু একটি কর্তব্য।

আর সেইটে সারতেই যাচ্ছে সে। তবে আর তার ভয় কিসের?

তাছাড়া এ পথ তার বিশেষ পরিচিত।

আবাল্য—আজন্মই পরিচিত এ গ্রামের সব পথঘাট।

অন্ধকারে অসুবিধা হয় না কিছু। পথ চিনতে ভুল হয় না।

এমন কি হোঁচট খাবারও প্রশ্ন ওঠে না।

সে খুবই দ্রুত চলতে লাগল। প্রায় ছুটে চলল সে।

ওর লঘু কোমল অনাবৃত পায়ের অতি মৃদু শব্দ—তবু সেই জনহীন নিঃশব্দ অন্ধকারে প্রতিধ্বনি জাগাবার পক্ষে তাই যথেষ্ট।

সেই প্রতিধ্বনিতেই ভয় পাবার কথা। আগের দিন হ'লে গায়ে কাঁটা দিত তার।

মনে হ'ত সদ্য অপহৃত প্রেতাত্মারা তার চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

কিন্তু আজ গ্রাহ্যও করল না সে।

এমন কি বিষ্ণুপ্রসাদের ত্রিধাবিভক্ত বিরাট শূন্য বাড়িটাও কোন আতঙ্ক সৃষ্টি করতে পারল না তার মনে।

একাই বাইরের মহল, অন্দর মহল পেরিয়ে পিছনের আস্তাবলে চলে গেল।

সেই অন্ধকারেই বার ক'রে নিয়ে এল সূর্যপ্রসাদের নিজস্ব ছোট্ট ঘোড়াটাকে।

বৃন্দাপ্রসাদ পুত্রকন্যাকে হত্যা ক'রে বাহ্‌রামকে সঁপে দিয়েছিল রাজা বিজয়দেবের সৈন্যদের হাতে—ওদের বাহন সে ঘোড়াটার কথা তার মনে পড়ে নি।

প্রয়োজনে লাগে নি বিজয়দেবের রক্ষী সৈন্যদেরও।

তার কথা কারুরই মনে পড়ে নি।

সে বেচারা একাই ঘুরে বেড়িয়েছে বনে বনে, পথে পথে।

তার পর—ক'দিন পরে নিজেই ঘুরে এসেছে তার পরিচিত প্রিয় আস্তাবলটিতে।

বোধ হয় ভেবেছে তার ক্ষুদ্র মনিবটি তাকে ভুলে গেলেও বাড়িতে ফিরেছে নিশ্চয়ই, এখানে এলেই সে এসে কাছে দাঁড়াবে, গায়ে হাত রাখবে, অভ্যস্ত পরিচিত নামে ডাকবে।

কেউই তাকে লক্ষ্য করে নি, করেছিল শুধু মালতী।

সে জানে এই ভৈরোদাস কত প্রিয় ছিল সূর্যপ্রসাদের। কতদিন সকলের আড়ালে নির্জন প্রান্তরে নিয়ে মালতীকে ঘোড়ায় চড়া শিখিয়েছে সে। ঐ ভৈরোদাসের পিঠেই চড়িয়েছে ওকে।

'খবরদার ভৈরোদাস, মালতীকে ফেলে দিস নি যেন। তাহ'লে আর তোর মুখ দেখব না কোন দিন।'

কানে কানে চুপি চুপি বলে দিত সূর্যপ্রসাদ। আর সঙ্গে সঙ্গে সে ভেড়ার মতো নিরীহ, ভেড়ার মতোই শান্ত হয়ে যেত। নিশ্চিন্তে তার পিঠে সওয়ার হ'ত মালতী।

ভৈরোদাসের দুর্গতি দেখে মালতী সেদিন চোখে জল রাখতে পারে নি।

ওর নিজের ভালবাসা দিয়ে বুঝেছিল এই নির্বাক প্রাণীটির ভালবাসার গভীরতা।

কী কৃশই হয়ে গিয়েছিল ভৈরোদাস।

সম্ভবত এ ক'দিন কিছুই খায় নি সে। শুধুই মনিবকে খুঁজে বেড়িয়েছে। বনের ঘাস গাছের পাতাও রোচে নি তার মুখে।

দুই চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে গড়িয়ে চোখের কোণে গভীর কালো দাগ হয়ে গেছে।

সবার অলক্ষ্যে মালতীই গিয়ে তার পিঠে হাত দিয়েছে।

মুখের লাগাম পিঠের জীন খুলে দিয়ে খেতে দিয়েছে তাকে। তখনও তার চার পায়ের খুরে কাপড় জড়ানো, নিজে হাতে খুলে দিয়েছে সে ন্যাকড়াগুলো।

তবু তখনও ভৈরোদাস তার ঘাস-দানায় মুখ দিতে চায় নি, মালতীই কানে কানে বলেছে, 'খেয়ে নে, খেয়ে নে ভৈরোদাস। তোর—আমাদের যে এখনও কাজ বাকী। সূর্যপ্রসাদের মৃত্যুর শোধ নিতে হবে যে বেটা!'

কী বুঝেছে কে জানে ভৈরোদাস, অথবা মালতীর পরিচিত কণ্ঠে ও স্পর্শে বুঝি সেই মনিবেরই স্পর্শ বোধ করেছে সে, অথবা পেয়েছে তার আগমনের আভাস—ডাবায় মুখ নামিয়ে খেয়েছে সে দানা-পানি-ঘাস।

তারপর থেকে ক'দিন এই আস্তাবলেই আছে সে।

কোনদিন খেতে পেয়েছে, কোনদিন পায় নি।

কিন্তু তবু কোনখানে নড়ে নি সে। শান্তভাবে অপেক্ষা করেছে সেই প্রিয় পরিচিত কণ্ঠটির, অভ্যস্ত পদশব্দের।

মধ্যে মধ্যে মালতীই এসে তদারক ক'রে গেছে, কানে কানে বলে গেছে, 'আর এই দুটো দিন বেটা, দুটো দিন চুপ ক'রে থাক। তারপর রইলুম তুই আর আমি। আর রইল আমাদের সঙ্গে তোর—তোর সূর্যপ্রসাদ। আর আমারও।'

একটু হেসেছে সে, শেষের কথাটা বলার সঙ্গে। কান্নার মতোই করুণ সে হাসি। প্রভাতের মলিন মালতীর দলে সঞ্চিত পূর্বরাত্রির বৃষ্টি-বিন্দুর মতো।

আজ যাত্রার আগে গোশালা থেকে গরু এবং আস্তাবল থেকে ঘোড়া খুলে দিয়ে গেছে সবাই। ভৈরোদাসেরও গলার বাঁধন খুলে বাইরে আনা হয়েছিল। কিন্তু বাড়ির লোকেরা চলে যেতে আবারও সে আস্তাবলেই গিয়ে ঢুকেছে।

অপেক্ষা করছে নিজের জায়গাটিতেই।

সে বুঝি বুঝতে পেরেছে কেমন ক'রে যে, তার ডাক আসবে এইবার, প্রয়োজন হবে তাকে।

তাই মালতী গিয়ে 'ভৈরোদাস' বলে ডাকতেই এগিয়ে কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। গলা বাড়িয়ে দিয়েছে মালতীর হাতের লাগামের দিকে।

লাগাম এঁটে জিন কষে পিঠে সওয়ার হয়ে উঠে বসে শুধু বলেছে মালতী, 'চল বেটা ভৈরোদাস, এবার আমাদের খেল শুরু করি আমরা'—সঙ্গে সঙ্গে যেন সব কথা বুঝেই চলতে শুরু করেছে ভৈরোদাস।

বাড়ির বাইরে এসে, খোলা পথে পড়ে সে চলা দৌড়ে পরিণত হয়েছে। নক্ষত্রবেগে ছুটেছে সে মালতীকে পিঠে নিয়ে।

ভীত অনভ্যস্ত মালতী দু'হাতে তার গলা জড়িয়ে পিঠে শুয়ে পড়েছে—কিন্তু থামতে বলে নি একবারও।

বরং বাহবা দিয়েছে, 'ঠিক আছে বেটা বাহাদুর। ঠিক আছে!'

মৃত্যুর ভয় আর নেই মালতীর, যা কিছু ভয় এখন ওর জীবনকেই।

ঠিক কোথায় যেতে হবে তা মালতীর জানা ছিল না।

কতদূর তা তো নয়ই।

যে পথে গেছে ওরা মালিক বাহ্‌রামকে নিয়ে সে সম্বন্ধে একটা অস্পষ্ট ধারণা মাত্র ছিল।

রাজধানীর পথ যেটা; জম্মুতে যাবার সোজা রাস্তা—সেই পথেই গিয়েছে নিশ্চয়।

হয় রাজা বিজয়দেবের কাছে নিয়ে যাবে—নয়তো আরও দূরে, বিতস্তার তীরে যেখানে বিজয়ী ঘুরীর সৈন্যরা এখনও তাঁবু ফেলে আছে—সোজা সেইখানেই।

কিন্তু সে পথ একই। অন্তত মালতী যা শুনেছে।

খানিকটা পর্যন্ত একই রাস্তা গিয়েছে—বেশ ক'দিনের রাস্তা—তারপর দুটো পথ দুদিকে ভাগ হয়ে গিয়েছে।

কোনদিক ওরা ধরবে অথবা বলা উচিত ধরেছে—সেটা সেখানে—সেই দুই রাস্তার মোড় পর্যন্ত না গেলে জানা যাবে না।

কিন্তু যতদূর মনে হয় বিজয়দেব একবার স্বচক্ষে না দেখে, আগামী সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় না হয়ে কখনও পাঠাবেন না তাঁর নূতন বন্ধু ঘুরের মুহম্মদ-বিন-সামকে এই শ্রেষ্ঠ উপহারটি।

সুতরাং ঐ দিকেই যেতে হবে।

এ পথটা ঠিক জানা না থাকলেও দিকটা ঠিক আছে। মোটামুটি জানা আছে কোনদিকে যেতে হবে। পাহাড়ে এত অগণন পথ নেই যে বড় রকমের কোন ভুল হবে।

সেদিক দিয়ে মালতী নিশ্চিন্ত আছে।

আর ভৈরোদাস তো চলেছে ঐ পথেই।

দেখা যাক না—কোথায় নিয়ে যায়।

কে জানে, হয়ত ভাগ্যই পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

॥ একুশ ॥

নক্ষত্রের আলো নক্ষত্রের আলোই। ঘোড়ার পক্ষে তাতে পথ দেখে চলা মুশকিল। সুতরাং গ্রাম-সীমানা—এমন কি তার বাইরেও অভ্যস্ত পরিচিত পথ যতটা ঘোরা অভ্যাস আছে তার, ততটা পর্যন্ত বেশ চলল—তার পরই একটা বড় রকম হোঁচট খেয়ে পড়ল সে।

আহত হ'ল একটু মালতীও!

কিন্তু চিন্তা ওর নিজের জন্য তত নয়—যতটা ভৈরোদাসের জন্য।

ভৈরোদাস যদি বড় রকমের চোট খায় তো ওর যে কাজই বন্ধ হয়ে যাবে—কোন দিনই তো সে ধরতে পারবে না বাহ্‌রামদের।

তারা যাচ্ছে ঘোড়ায় চেপে—তাদের কেমন ক'রে ধরবে ও পায়ে-হেঁটে?

তারা যতই আস্তে যাক, যতই বিশ্রাম ক'রে ক'রে যাক্—পায়ে হেঁটে সে কোনদিনই তাদের কাছে পৌঁছতে পারবে না।

ব্যর্থ হবে তার এত আয়োজন—এত তোড়জোড়।

সে তাড়াতাড়ি উঠে অন্ধকারেই যতটা সম্ভব পরীক্ষা করল ভৈরোদাসকে।

না, আঘাত খুব বেশী নয়। অচল ক'রে দেবার মতো তো নয়ই।

তবু আর এগোনো ঠিক হবে না। এত দুঃসাহস ভাল নয়।

একবার অল্পে অব্যাহতি পেয়েছে—বার বার হয়ত না-ও পেতে পারে। হয়ত এটাই ঈশ্বরের হুঁশিয়ারী। ওর ঠাকুর্দা বলতেন, কোন বড় বিপদের

আগে একটা ছোট বিপদ দিয়ে হুঁশিয়ার ক'রে দেন ভগবান। যে তাতে সতর্ক হয় সে বেঁচে যায়—যে অন্ধ কিংবা বোকা সে আবারও ভুল করে আর মরে।

সামান্য সতর্কতার জন্য অসামান্য বিপদ ডেকে আনা মূর্খতা ছাড়া আর কিছু নয়। কয়েকদণ্ডের জন্য অসহিষ্ণু হয়ে কাজ পণ্ড করে অর্বাচীনে।

সে ভৈরোদাসেকে ধরে নিয়ে গিয়ে একটা চীর গাছের নিচু ডালে বেঁধে দিল।

তারপর ঝোলাতে হাত ঢুকিয়ে বার করল চকমকি পাথর আর সোলা। শুকনো পাতা-লতা জড়ো ক'রে আগুন জ্বালল তাতে।

দেখতে দেখতে সে আগুন বেশ জমকে উঠল। তাতে শুধু তাপই নয়, আলোও হ'ল খানিকটা।

সেই আলোতে খুঁজে খুঁজে কুড়িয়ে নিয়ে এল আরও কিছু শুকনো পাতা, কতকগুলি শুকনো ডালপালা।

পাতার আগুন দপ ক'রে জ্বলে ওঠে—আবার দপ ক'রেই নিভে যায়; কতকটা ব্রাহ্মণের রাগের মতো—রহস্য ক'রে বলতেন মালতীর নানী। তাকে জীইয়ে রাখতে গেলে চাই মোটা গাছের ডাল, মজবুত কাঠ কিছু। নানী বলতেন, গুঁড়ির আগুন হ'ল মেয়েছেলের রিষের আগুন, সহজে নেভে না।

ভৈরোদাসের এসব ভাল লাগছিল না।

এই অকারণ বিলম্ব তার পছন্দ নয়।

সে বার-কতক অসহিষ্ণু হ্রেষাতে জানাল প্রতিবাদ, অস্থির পদক্ষেপে জানাল চাঞ্চল্য।

সে যেতে চায়—এগিয়ে যেতে চায়।

সে বুঝি বুঝেছে এই প্রতিশোধের ব্যাপারটা। তাই তার এত অধীরতা।

মালতী উঠে এসে ওর গলা জড়িয়ে ধরল, কানের কাছে মুখ এনে বলল, 'বুঝি রে ভৈরো, বুঝি তোর মনের ভাব। কিন্তু উপায় কি বল্, এই পাহাড়ে পথে যদি আবার তুই পড়িস কোথাও—কী কাণ্ডটা হবে বল দিকি? সব কাজই কি পণ্ড হবে না? তার চেয়ে—এতদিনই যখন গেল আর দুটো দিন একটু ধৈর্য ধরে থাক। মনে রাখিস যে-কোন কাজেই সিদ্ধি পেতে হ'লে চাই ধৈর্য। যে কাজে যেতে তোর এত আগ্রহ—সেই কাজের জন্যেই তোকে যে সুস্থ থাকতে হবে বেটা! যাক্ না কেটে এই তিন পহর রাত—তারপর দেখব কাল সকালে কত ছুটতে পারিস।'

কী বোঝে ভৈরোদাস কে জানে, সে আশ্চর্য রকম শান্ত হয়ে যায়।

তী তার কানে কানে কথা বললেই বুঝি কেমন ক'রে পায় তার মনিবের স্পর্শ—শান্ত হয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে।

মালতী এবার ভৈরোদাসকে কিছু খেতে দিল।

ওর খাবার সে কিছু সঙ্গেই এনেছিল।

পথে আসতে আসতে ঝরনা থেকে জল খেয়ে নিয়েছে—জল আর লাগবে না। কিছু দানা দিলেই হবে।

ওকে খাইয়ে সে নিজেও কিছু খাবার বার ক'রে খেল।

প্রাণধারণের মতো—সামান্য কিছু।

বেঁচে যে থাকতেই হবে। নিষ্ফল হৃদয়াবেগে যারা শুধু কাঁদে আর মরে, যারা ভাগ্যের হাতে অসহায় ক্রীড়নক মাত্র—তাদের ওপর মালতীর বড় ঘৃণা।

আরব্ধ কাজ শেষ করার জন্য তাকে যা কিছু করতে হয় তা সে করবে। সেই জন্যই বাঁচা প্রয়োজন, তাই সে বাঁচবে।

তারপর—মরতে কেমন ক'রে হয় তাও সে জানে।

মরেই দেখিয়ে দেবে তা।

আহার শেষ ক'রে আগুনে আরও কিছু কাঠ ফেলে দিল, তারপর আগুনের পাশে একটা বড় গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বসল সে।

এমনি ভাবে বসে-বসেই প্রতীক্ষা করবে সেই অরুণোদয়ের—যুগ-যুগান্তর ধরে সকল দুঃখনিশার শেষে যে আশ্চর্য জ্যোতির্ময় অভ্যুদয় হয়—সকল প্রতীক্ষাকে সার্থক ক'রে।

এখন তাকে ঘিরে রইল এক অন্ধ তামসী নিশি, নিবিড় নিরন্ধ্র অন্ধকার আর এই নীরব বনস্থলী।

কিন্তু সত্যই কি নীরব এই অরণ্যানী?

কান পেতেও শুনতে হয় না—আপনিই কানে এসে প্রবেশ করে ক্রূর ক্রুদ্ধ অরণ্যের বিদ্বেষ-ভীষণ কণ্ঠস্বর: কত কী জানা অজানা বন্য জন্তুর ডাক। শের আর ভালুর আওয়াজ সে চেনে; তার জন্য চিন্তাও নেই খুব। সন্ধ্যের পর থেকে অসংখ্যবারই তো শুনল সে আওয়াজ। সে জানে, বহুলোকের মুখেই শুনেছে যে শের ভালু আগুনকে ভয় করে—আগুনের ধারে কাছেও ঘেঁষে না।

সেই জন্যই আগুন জ্বেলেছে সে। আর প্রাণপণে জ্বালিয়েও রাখছে সে আগুন।

যাতে ঐ বহ্নিশিখা তার প্রজ্বলন্ত দীপ্তি দিয়ে তার চারপাশে নিরাপত্তার গণ্ডী রচনা করতে পারে।

মৃত্যুকে ঠেকিয়ে রাখা জীবনের গণ্ডী।

যাতে ঐ হিংস্র শ্বাপদদের লোভ-নিষ্ঠুর নখদন্ত না ওদের কাছে পৌঁছতে পারে—ওর আর ভৈরোদাসের।

কিন্তু শুধু শের বা ভালুই তো নয়—আরও তো অনেক আছে। আরও কত জানা-অজানা জীবের ডাকই তো শুনতে পাচ্ছে।

ভয়ঙ্কর সে সব শব্দ।

হয়ত অজানা বলেই এত ভয়ঙ্কর লাগছে, বুকের মধ্যে এমন হিম হয়ে যাচ্ছে বার বার।

কে জানে তারা কী জাতের জানোয়ার—আগুনের শাসন তারা মানবে কিনা, ভয় পাবে কিনা পাবকের ভ্রূকুটিতে।

ভয় যতই হোক, চুপ ক'রেই বসে রইল সে স্থির হয়ে—স্থির ধ্যানমগ্না তপস্বিনীর মতো।

সে জানত সব রাত্রিই প্রভাত হয়—এ রাত্রিও হবে।

যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা হয়, যদি কেশবজী মনে করেন যে তার এ যাত্রার কোন সার্থকতা নেই, তা'হলে তিনিই শেষ ক'রে দেবেন—এ যাত্রা এ চেষ্টা।

সংস্কার প্রবল—তাই বুকের মধ্যে গুরগুর করে—হিম শৈত্য নামে সমস্ত মনোবল আচ্ছন্ন ক'রে—কিন্তু তাকে আবার জয় করে সে।

স্থির হয়ে অপেক্ষা করে রাত্রি অবসানের। আর একসময় তা হয়ও।

সমস্ত অজানা বিপদ অশরীরী ছায়ার মতো মিলিয়ে যায় অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে! মাথার ওপরে দূর তুষার-শৃঙ্গে লাগে ঊষার লজ্জা-রক্তিমা, পথের রেখা ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে ওঠে চোখের সামনে।

আঃ, কী শান্তি! একেই বুঝি নবজীবন বলে।

সে উঠে চারিদিকে তাকাল।

কাছেই একটা ছোট্ট ঝরনা। পাহাড়ের গায়ে একটা সামান্য ফাটল থেকে ঝিরঝির ক'রে জল পড়ছে।

শীতল স্বচ্ছ জল, পুরাণবর্ণিত ভোগবতীর ধারার মতো স্নিগ্ধ ও সুপেয়।

মুখ হাত ধুয়ে আকণ্ঠ পান ক'রে নিল সে সেই জল।

গত রাত্রির ভয়ার্ত জাগরণ আর কোন চিহ্ন রেখে যায় নি—এই আবক্ষ পিপাসা ছাড়া।

নিজের জলপান শেষ হ'লে ভৈরোদাসকেও খানিকটা জল খাইয়ে নিল সে।

অনভ্যস্ত অপটু হাতে কিছুটা দলাই-মলাইয়েরও চেষ্টা করল—তারপর কেশবঙ্গীকে স্মরণ ক'রে আবার সওয়ার হ'ল।

ইঙ্গিতমাত্রে ভৈরোদাস ছুটল তীব্রবেগে।

কালকের মতোই ভয়ে গলা জড়িয়ে শুয়ে পড়ল মালতী ওর পিঠের ওপর—কিন্তু গতি মন্থর করাবার কোন চেষ্টা করল না।

ভৈরোদাসও এই অদ্ভুত সওয়ারীতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। সে ছুটেই চলল ঐ ভাবে জড়িয়ে ধরা সত্ত্বেও।

পথ একটিই মাত্র—সম্মুখে প্রসারিত।

সঙ্কীর্ণ পাহাড়ী-পথ, উচ্চাবচ, উপলাকীর্ণ, বন্ধুর। প্রতিমুহূর্তেই পদস্খলনের সম্ভাবনা। কোথাও কোথাও পাশেই অতলস্পর্শী খদ—একবার এক লহমার অন্যমনস্কতা, সামান্যতম ভুল পদক্ষেপ নিশ্চিত মৃত্যুর মধ্যে টেনে নিয়ে যাবে।

কিন্তু তবুও ওরা কোন রকম সাবধান সতর্ক হবার চেষ্টা করল না—এই মানব ও মানবেতর প্রাণীর অদ্ভুত জুটি।

ছুটেই চলল। তেমনি নক্ষত্রবেগে।

সময় নেই ওদের মোটে। বেশ কয়েকদিনের পথ এখনও অতিক্রম করতে হবে—এই দু'তিন দিনের মধ্যে।

থামলে চলবে না। আরাম করার অবসর নেই!

॥ বাইশ ॥

দ্বিপ্রহরের দিকে একবার থামতে হয়েছিল অবশ্য। নিজের জন্যে যত না হোক, ভৈরোদাসের জন্যেই আরও বেশী।

ওকে একটু অন্তত নিঃশ্বাস নিতে নেওয়া দরকার। দরকার ওকে কিছু খাইয়ে নেওয়ার।

এক ঝরনার ধারে অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত স্থান দেখে সে নেমেছিল।

ভৈরোদাসকে একটু বিশ্রাম নিতে দিয়ে সে নিজে স্নান সেরে নিয়েছিল। তারপর ভৈরোদাসকে দানা দিয়ে ঝরনার পাশ থেকে কচি ঘাস তুলে দিয়ে ভাল ক'রেই খাইয়ে নিয়েছিল। দিয়েছিল পেট ভরে জল খেয়ে নিতে। তারপর নিজেও একখানা শুকনো রুটি চিবিয়ে আঁজলা ভরে জল খেয়ে নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল আবার।

মোট বোধ হয় দু'তিন দণ্ডের বেশি সময় লাগে নি, তবু মালতীর মনে হ'ল বড় বেশী বাজে খরচ হয়ে গেল এই সময়টা।

সে ভৈরোদাসের পিঠে সওয়ার হয়ে—আগের মতোই শুয়ে পড়ে কানে কানে বলে দিল, 'জোরে বেটা ভৈরোদাস, জোরে। এই সময়টা পুষিয়ে নেওয়া চাই কিন্তু।'

ভৈরোদাসকে অবশ্য তা বলার প্রয়োজন ছিল না।

সে কি বুঝেছে কে জানে। বরাবরই চলেছে যেন নক্ষত্রবেগে। কোথাও এক মুহূর্তের জন্যও শিথিল করে নি গতি।

প্রথমটা মালতীর ভয় হয়েছিল ওর জন্যই।

এই প্রচণ্ড পরিশ্রম—এই বিরাম-বিশ্রামহীন গতি—এ কি বেশীক্ষণ পারবে সহ্য করতে ভৈরোদাস?

ভেঙ্গে পড়বে না তো শেষ পর্যন্ত!

হয়ত আর একটু বিশ্রাম করতে দেওয়া উচিত ছিল বেচারীকে।

হয়ত এতটা জুলুম করা ঠিক হচ্ছে না।...

এ চিন্তাটা ছিল অপরাহ্ণের পূর্ব পর্যন্ত।

তারপর যেমন একটু একটু ক'রে সূর্যদেব পশ্চিম দিগন্তের দিকে হেলতে শুরু করলেন, অল্প অল্প ক'রে রোদ উঠতে লাগল চারিদিকের শৈলসানু ত্যাগ ক'রে তার শিখরদেশে—ছায়া ঘনিয়ে আসতে লাগল চারিদিকের গাছেপালায় পত্র-পল্লবে—হাওয়া হয়ে উঠল শীতলতর—তেমনিই একটু একটু ক'রে ও অনুভব করতে লাগল যে চিন্তা ওর নিজের জন্যও বড় কম নেই।

শুদ্ধমাত্র মনের জোরেই—প্রবল ইচ্ছাশক্তিতেই গত কদিন দাঁড়িয়ে আছে সে, বাইরে অনুচ্ছ্বসিত নির্বিকার ভাব বজায় রেখে, কাল যে সারারাতই অমন সোজা হয়ে ঠায় বসে কাটিয়ে দিল, সেও সম্ভব হয়েছে সেই মনের জোরেই; সেই একমুখী সাধনা ও কঠিন ইচ্ছাশক্তিই আজ তাকে এই একটানা এতটা পথ ঘোড়ার পিঠের ওপর এই একান্ত কষ্টদায়ক ভঙ্গিমাতে বসে ছুটিয়ে এনেছে—কিন্তু তবু ইচ্ছাশক্তির, মনের জোরের একটা সীমা আছে।

সেই সীমাটাই কখন লঙ্ঘন ক'রে ফেলেছে মালতী তা সে জানে না।

মন যত বড়ই হোক, প্রত্যেকের মন তার নিজস্ব, তার দেহের খাঁচায় আবদ্ধ।

অর্থাৎ মানুষের মন তার দেহের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী জড়িত। দেহের ওপর অনেকটা নির্ভরশীল।

দেহ যখন সুস্থ থাকে তখন মন অনেক কায়দা দেখায়। দেহ ভেঙ্গে পড়লে সেও পঙ্গু হয়ে পড়ে।

মনের জোর কতকটা শিশুর স্পর্ধার মতো।

স্নেহশীল আত্মীয়রা যেমন খানিকটা পর্যন্ত তাদের অত্যাচার হাসিমুখে সহ্য করেন, অনেক সময় প্রসন্ন মনেই প্রশ্রয় দেন, তারপর একেবারে অসহ্য হয়ে উঠলে একসময় ধমক দিতে বাধ্য হন, কখনও কখনও চড়চাপড়ও মেরে বসেন।

তেমনি দেহও মনের অত্যাচার কিছুক্ষণ সহ্য করে—কিছুদিনও হয়ত। তার পর এমন একসময় আসে যখন থাবড়া মেরে তার শক্তির সীমা সম্বন্ধে তাকে সচেতন করতে হয়। তাকে বুঝিয়ে দিতে হয় যে—কতটা পর্যন্ত বাড়াবাড়ি চলে আর কতটা চলে না।

মালতীর দেহও তাকে যেন প্রথমে ভ্রূকুটি, পরে ধমক, একসময় থাবড়া মেরে তার শক্তির সীমা সম্বন্ধে, নিজের সহনশীলতা সম্বন্ধে সচেতন ক'রে দিল।

পিঠে অসহ্য ব্যথা, শরীরের সমস্ত গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে অসহনীয় যন্ত্রণা।

আর সহ্য হয় না। দুই চোখে রাজ্যের তন্দ্রা—সারা দেহ শিথিল করা ক্লান্তি নেমে আসছে। এ যন্ত্রণাও আর কোনমতে সওয়া যাচ্ছে না।

কাল যদি রাতটা ঘুমিয়ে নিতে পারত, অমন ঠায় আড়ষ্ট হয়ে অজানা জন্তুর ভয়াবহ ধ্বনির দিকে কান পেতে বসে থাকতে না হ'ত—তাহলে আজ অমন ভেঙ্গে পড়ত না শরীর।

সারাদিন ঘোড়ায় চড়ে ছুটে যাওয়া—সে শুনেছে অনেক জোয়ান পুরুষও, অভ্যাস না থাকলে সহ্য করতে পারে না। একে সে মেয়েছেলে তায় সোজা হয়ে বসে থাকতে পারছে না। অত্যন্ত অসুবিধাজনক ভাবে উপুড় হয়ে যেতে হচ্ছে, সেও তো এই যন্ত্রণার আর এক কারণ। মেরুদণ্ডে এই যে অসহ্য যন্ত্রণা—এর জন্যে বোধ হয় ঐ সওয়ার হওয়ার ভঙ্গীটাই বেশী দায়ী।

কিন্তু কারণ যা-ই হোক, এখন বিশ্রাম একটু চাই-ই।

আজ রাত্রে অন্তত যদি কোথাও একটু ঠেস দিয়েও ঘুমিয়ে নিতে না পারে তাহলে কাল আর চলা যাবে না।

কাল তাহলে মূল্যবান দিনের আলো নষ্ট ক'রে দিবাভাগেই কিছুটা ঘুমিয়ে নিতে হবে।

অথচ সেটা হবে কতকটা আত্মহত্যার মতোই আত্মনাশা দুর্বুদ্ধি।

অনেকদিনের পথ এগিয়ে আছে ওরা।

ওদের ধরতে হ'লে দিনগুলো আর একটুও নষ্ট করলে চলবে না, একান্ত অত্যাবশ্যক যেটুকু, ভৈরোদাসকে খেতে দেবার সময়টুকু ছাড়া।

এধারে পার্বত্য সন্ধ্যা হু-হু ক'রে এগিয়ে আসছে।

দেখতে দেখতে অন্ধকার হয়ে গেল চারিদিক।

পথের রেখা দেখে চলা একেবারেই অসম্ভব হয়ে এল।

এখনই থামতে হবে কোথাও।

কিন্তু সে কোথায়? কোথায় থামবে এই নির্জন নিবিড় বনপথে, অরণ্যের এই ভয়াল নিস্তব্ধতায়? কোথায় সে পাবে একটু বিশ্রাম করার মতো নিরাপদ আশ্রয়?

ব্যাকুল হয়ে চাইল মালতী চারিদিকে।

ভৈরোদাসকে থামাতে হয়েছে, এভাবে চলা আর সম্ভব নয়।

অন্ধকারে দৃষ্টি চলে না ঠিকই, কিন্তু কানে আসছে একটানা একটা ঝির্‌ঝির্ শব্দ। বাতাসেও টের পাচ্ছে এক রকমের আর্দ্রতা। অর্থাৎ জল আছে কোথাও, সামান্য হ'লেও ঝরনা আছে ধারে কাছে।

বিশ্রাম নেবার পক্ষে সেদিক দিয়ে এ-ই ঠিক জায়গা।

কিন্তু আবারও সেই কালকের মতো বসে কাটাতে হবে—ভয়ে ভয়ে—অজানা আতঙ্কে কণ্টকিত হয়ে?

আজও একটু ঘুমোতে পারবে না? অন্তত এক প্রহর সময়ও?

হঠাৎ যেন কান্না পেয়ে গেল মালতীর।

নিজেকে বড়ই অসহায় মনে হ'ল।

মনে হ'ল প্রতিকূল ভাগ্যের তুলনায় সে বড় দুর্বল, বড় অকিঞ্চিৎকর।

তার বুঝি উচিত হয় নি এতটা সাহস করা।

এ পুরুষের কাজ; মেয়েদের—বিশেষ ক'রে তার মতো কোন সঙ্গীহীন অভিভাবকহীন কমবয়সী মেয়ের পক্ষে—এ একেবারেই দুঃসাহস, বাতুলতা।

তার বুঝি মরাই উচিত ছিল।

পথের মধ্যেই বসে পড়ল মালতী, ভেঙে পড়ল বলতে গেলে। ভৈরোদাসও ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তার চেয়েও বুঝি চিন্তিত হয়ে উঠেছে সে মালতীর জন্যে।

সে দাঁড়িয়ে রইল পাশেই, চুপ ক'রে। শুধু ঘন ঘন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলতে লাগল। আর যে কিছুই করবার নেই তার, আর কোন সাধ্যই নেই। ঈশ্বর তাকে শুধু দিয়েছেন ছুটে চলার শক্তি আর মানুষের প্রতি ভালবাসা। আর কিছু করতে পারে না সে।

অপরিসীম দৈহিক শ্রান্তি, সীমাহীন মানসিক অবসাদ এবং সর্বোপরি অকারণ একটা আত্ম-ধিকার কিছুকালের জন্য অনড় অচল ক'রে দিল মালতীকে। সে তেমনি পথের ধুলো-কাঁকরের ওপর এলিয়ে পড়ে রইল স্থির হয়ে

—তারপর আবার একসময় নিজেকে যেন চাবুক মেরে সচেতন ও সক্রিয় ক'রে তুলল।

না, তাকে উঠতেই হবে।

ভাগ্যের কাছে এমন ক'রে হার মানবে না সে কিছুতেই।

এতটা যখন এসেছে, তখন শেষ অবধি যাবেও সে। তাতে অদৃষ্টে যা ঘটবার—না হয় ঘটবে তা।

সে আজ আগুন জেলে রেখে—নিজের ও ভৈরোদাসের চারিদিকে আগুন জেলে এই বনের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়বে। তারপরও যদি বাঘ-ভালুকে খায় তো উপায় কি ?

এমনিও মরবে—না হয় ওদের হাতেই মারা পড়ল। প্রাণটা যাওয়ার চেয়ে বেশী ক্ষতি তো করতে পারবে না।

আর যদি দৈবাৎ বেঁচে যায় তো আবার দুটো দিন বিশ্রাম না নিয়েও ছুটতে পারবে।

কিন্তু তার আগে এখনই একটু আগুন জ্বালা দরকার :

শুধু নিরাপত্তার জন্যই নয়, আলোর জন্যও।

ঝরনাটা কোনদিকে তাই যে ঠাওর পাচ্ছে না।

জল খেতে হবে, তার চেয়েও বড় কথা—ভৈরোদাসকে খাওয়াতে হবে।

শিথিল অবশ দেহটাকে টেনে যেন কুড়িয়ে নিয়ে উঠে বসল মালতী।

আর ঠিক সেই সময়ই নজরে পড়ল, ওরা যেখানে বসে রয়েছে তার থেকে সামান্য একটু দূরে—একটি আলোর রেখা—

অর্থাৎ জনবসতির চিহ্ন।

প্রথমে মনে হয়েছিল চোখের ভ্রম।

নিজের ইচ্ছাতুর দৃষ্টির রসিকতা ওর দুর্ভাগ্যের সঙ্গে :

তারপর ভাবল জোনাকি।

কিন্তু কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে বুঝল যে ও দুটোর কোনটা নয়—আলোই।

চোখের ভুল হ'লে এতক্ষণ ধরে তা চোখের সামনে থাকত না।

জোনাকি হ'লে সরে সরে যেত অন্তত। তাছাড়া সে জলে আর নেভে, এমন একই জায়গায় স্থির হয়ে জলে না।

এ মানুষের হাতে জ্বালা আলো। প্রদীপের শিখা।

নিকটেই তাহ'লে নিশ্চয় কারও কুটির আছে।

সেখানে আছে জীবিত আর জাগ্রত কোন মানুষ।

আছে আশ্রয় আর আশ্বাস। আছে নবীন জীবনের মন্ত্র।

আশার মতো সঞ্জীবনী সুধা মানুষের বুঝি আর কিছুই নেই;

নিঃশক্তি শিথিল দেহ মালতীর নিমেষে সক্রিয় হয়ে উঠল।

অধীর আগ্রহে উঠে দাঁড়াল সে।

তারপর সেই ঘন-হয়ে-আসা নিবিড় আঁধারে—সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গে লেগে থাকা শেষ দিবালোকটুকুর প্রতিফলিত আভাস মাত্রে—পথ দেখে দেখে এগিয়ে চলল সে; গাছপালা লতাপাতা সরিয়ে সরিয়ে, ধ্রুবতারার মতো সেই কম্পমান দীপশিখাটি লক্ষ্য ক'রে।

কোথাও কোথাও বন দুর্ভেদ্য, কোনও কোনও লতা দারুণ কঠিন—সরানো বা ছেঁড়া যায় না। কোথাও কোথাও কেটে-নিয়ে-যাওয়া কাঠের গুঁড়ির কোণ বেরিয়ে আছে সূচীতীক্ষ্ণ অস্ত্রের মতো, তাতে পা পড়ে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাচ্ছে —কোথাও বা অদৃশ্য পাথরে হোঁচট লেগে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে—তবু এখন আর ভেঙে পড়লে চলবে না, হতাশ হ'লেও না। ঐ দূরের আলোটিই তাদের জীয়ন-কাঠি, ওখানে যদি আশ্রয় নিতে পারে, যদি পারে আজকের রাতটি বিশ্রাম নিতে, তবেই আবার নতুন ক'রে বেঁচে উঠবে সে, তবেই তার সঙ্কল্প সিদ্ধির সম্ভাবনা থাকবে।

আলোটা একটু একটু ক'রে কাছে এল।

ওটা যে আলোই—আলেয়া কি জোনাকি নয়, সে বিশ্বাসও দৃঢ়তর হ'ল সেই সঙ্গে।

আর সেই সঙ্গে ফিরে এল মনের বল। আবারও একবার দেহ হার মানল মনের কাছে।

তবে পাহাড়ী পথ প্রায়ই প্রতারণা করে মানুষের চোখকে, যাকে মনে হয় হাতের কাছে, নাগালের মধ্যে, চলতে শুরু করলে তাই চ'লে যায় বহুদূরে— আপাত-সামান্য পথ কষ্টকর রকমের দূর হয়ে ওঠে।

আজও, মালতীর অদৃষ্টেও তার অন্যথা হ'ল না।

কাছে এসে গেছে মনে হয়েও বহুদূর যেতে হ'ল তাকে।

তবু একসময় সে দূরত্বেরও অবসান ঘটল।

এতক্ষণের সাধনা এনে দিল সিদ্ধি।

অবশেষে সত্যি-সত্যিই সে আলোর সামনে এসে দাঁড়াল।

কিন্তু এ কী আলো!

এ কী নিদারুণ পরিহাস করল ভাগ্য তার সঙ্গে!

পাহাড়ীবাঁশের একটা সুনিবিড় পুঞ্জ তার দৃষ্টিকে আড়াল ক'রে রেখেছিল বরাবর; একটি বিশেষ ফাঁক দিয়ে আলোটা দেখতে পেলেও আর কিছু দেখতে পায় নি তাই।

এখন একটি নাতিপ্রশস্ত পার্বত্য ঝরনা হেঁটে পেরিয়ে এসে বাঁশবনটাকে অর্ধপ্রদক্ষিণ ক'রে আলোর সামনাসামনি এসে দাঁড়িয়ে দেখল সেটা কোন কুটির নয়, আলোটাও কোন দীপশিখা নয়। আসলে কারা বনের মধ্যে একটা বড় বস্ত্রাবাস বা তাঁবু ফেলেছে, আর সেই বস্ত্রাবাসের সামনে বড় বড় কাঠের গুঁড়ি জড়ো ক'রে আগুন জ্বেলেছে।

মালতী দূর থেকে যেটা দেখেছে সেটা এই আগুনেরই আলো, ঘন বনের ভেতর থেকে দেখেছে বলে ওর প্রদীপের আলো মনে হয়েছে।

বস্ত্রাবাসে যারা ছিল তারা বহু দূর থেকেই ওর আর ভৈরোদাসের পায়ের আওয়াজ পেয়েছে। বিশেষ ক'রে ঝরনা পেরিয়ে আসার ছপছপ শব্দ তো বেশ প্রবলই—সুতরাং তারাও বিপদ আশঙ্কা ক'রে প্রস্তুত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে এদের প্রতীক্ষা করছে।

প্রত্যেকের হাতেই সুদীর্ঘ বর্শা—আর সেই অন্তত পাঁচ-ছটি বর্শার মুখ ঠিক মালতীর দিক লক্ষ্য ক'রেই স্থির, উদ্যত।

মালতীর মুখ থেকে একটা প্রায় অস্ফুট শব্দ আপনিই বেরিয়ে এল। আতঙ্ক ও আশাভঙ্গের বেদনামিশ্রিত আর্তনাদ একটা।

আতঙ্কের আরও কারণ ছিল।

নিবিড় অন্ধকারের মধ্য দিয়ে সে এসেছে—এই আগুনের আলোই তার কাছে যথেষ্ট উজ্জ্বল, তাতে সে এক নিমেষ মাত্র দেখে নিয়েছে—এই কটি লোক সকলেই যুদ্ধ-ব্যবসায়ী, সৈনিক। তাদের সর্বাঙ্গ বর্মে আবৃত, মাথায় ধাতুনির্মিত শিরস্ত্রাণ, কটিতে অসি, বাঁ হাতে বিরাট বর্ম।

এবং এরা কেউই এদেশী—অর্থাৎ বিজয়দেবের সৈন্য নয়—এরা বিজাতীয়, বিদেশী। সম্ভবত বিধর্মীও।

মুসলমান সৈন্য কখনও দেখে নি মালতী—কিন্তু কে জানে কেন এদের দেখেই মনে হ'ল যে এরা সবাই মুসলমান। সম্ভবত ঘুরের মহম্মদ-বিন-সামেরই সৈন্য!

আর্তনাদটা বেরিয়ে এসেছিল অকস্মাৎ, আপনা থেকেই। কিন্তু তাছাড়া,

এদের দেখে পর্যন্ত যেন পাথর হয়ে গিয়েছিল মালতী, চোখে পলক অবধি পড়ে নি বোধ হয় তারপর।

ওদের অবস্থা কিন্তু তার বিপরীত। ওরা এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল পাথরের মতো স্থির ও একাগ্র হয়ে, এখন মালতী আলোর সামনে এসে পড়ায় আগন্তুক বলতে একটি সওয়ারহীন ঘোড়া আর একটি অসহায় নিরস্ত্র কিশোরী মেয়েকে দেখে নিঃশ্বাস ফেলে সহজ হ'ল।—এবং আর এক পলক দেখে নিয়ে মেয়েটিকে নিরতিশয় সুশ্রী বুঝতে পেরে একপ্রকার জান্তব উল্লাসে সমবেত একটা পৈশাচিক ধ্বনি ক'রে উঠল।

যেন এইটেরই শুধু অপেক্ষা ছিল, শুধু এই আঘাতটুকুরই।

দেহ মন একসঙ্গে ভেঙ্গে পড়ল মালতীর।

সে আর একটা অস্ফুট আর্তনাদ ক'রে সেইখানেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল, —সেই উপলবিকীর্ণ কঠিন ভূখণ্ডের ওপর।

॥ তেইশ ॥

মালতীর অনুমান মিথ্যা নয়।

এরা ঘুরীরই সৈন্য তবে এরা কোন রাজকার্যে বা রাজাদেশে আসে নি। এখানে এসে বনের মধ্যে গোপনে তাঁবু ফেলেছে বিচিত্র এক স্বার্থবুদ্ধিতে।

রাজা বিজয়দেবের কাছে থেকে সংবাদ যেতে বন্দীকে নিয়ে যাবার জন্য মুহম্মদ-বিন-সাম বিপুল একদল সৈন্য পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু জম্মু পর্যন্ত পৌছতে হয় নি তাদের—পথেই এক জায়গায় বিজয়দেবের সৈন্যরা অপেক্ষা করছিল বন্দী মালিক বাহ্‌রামকে নিয়ে, সেইখানে এসে বন্দীর ভার বুঝে নিয়েছে ঘুরীর সৈন্যরা।

তার কারণ বিজয়দেব সবচেয়ে তেজী দুই ঘোড়া দিয়ে স্বাস্থ্যবান সাহসী দুই অনুচর পাঠিয়েছিলেন, একজন এসে জম্মুর সৈন্যদের নিষেধ করেছে বন্দীকে রাজধানী পর্যন্ত নিয়ে যেতে, আর একজন ঘুরীর সৈন্যদের মুখ ফিরিয়ে দিয়েছে জম্মুর দিক থেকে এইদিকে।

সুচতুর বিজয়দেব এতদিনে ঘুরীকে চিনতে পেরেছেন ভাল রকমই। তার ক্ষমতারও একটা হিসাব পেয়েছেন।

তাই তিনি চান না যে কোন কারণেই ঘুরীর অনুচররা বেশী সংখ্যক তাঁর রাজধানীতে আসে, তিনি চান না যে তারা দেখে যায় এর পথঘাট, এর প্রাচীর-প্রহরার দুর্বল অন্ধিসন্ধি।

তিনি চান না যে তারা জেনে যায় এখানকার ঐশ্বর্যের পরিমাণ ; তাঁর বা তাঁর প্রজাদের।

সুতরাং ঘুরীর সৈন্যদের হাতে কিছু সময় ছিল।

জম্মু পর্যন্ত যাওয়া-আসার সময় হিসাব ক'রে দিয়েছেন তাদের সেনা-নায়ক। দুচার দিন বিশ্রামের সময়ও ধরে দিয়ে বৈকি।

এই সময়টা তারা ফিরিয়ে দিতে চায় নি—মনিবকে বা মনিবের স্থলাভিষিক্তকে।

তাই বলে সময়টা নষ্ট করতেও চায় নি।

সময়কে অর্থে রূপান্তরিত করতে চেয়েছে।

অর্থ উপার্জনের সম্ভাবনাটাই যথেষ্ট ; কিন্তু তাছাড়াও কিছু লোভনীয় ছিল।

প্রমোদায়োজনও ছিল কিছু, ছিল সম্ভোগের লোভ।

অর্থ উপার্জন আর সম্ভোগ যদি একসঙ্গে এক উপায়ে হয়—সে তো আরও ভাল।

তারা দেখেছে মুহম্মদের খাস বাহিনীর নিজস্ব উট খচ্চর ও হাতীগুলি লুটের মালের ভারে নুয়ে পড়েছে, স্বর্ণ রৌপ্য মণিমাণিক্য—কত কি!

কিন্তু শুধু স্থাবর নয়, জঙ্গম ঐশ্বর্যও তারা সংগ্রহ করেছে কিছু।

বেশ কিছু-সংখ্যক নারী সংগ্রহ করেছে তারা। নিয়ে চলেছে দেশের দিকে।

পথে নিজেদের অবসর-বিনোদন হবে, দেশে ফিরে গিয়ে পছন্দ হয় তো রাখবে—নইলে বিক্রি করবে।

ঘুর কি গজনীতে সুন্দরী নারীর অভাব নেই সত্যি কথা—কিন্তু অধিকন্তু ন দোষায়।

তাছাড়া—তাদের চোখে অন্তত এদেশের মেয়ে বড় ভাল লেগেছে

এ আর এক ধরনের রূপ : যা তারা দেখতে অভ্যস্ত সেরকম নয়। হয়ত সেই জন্যই আরও লোভনীয়।

এ যেন সরোবরের নীলজলে সদ্যঃ-উন্মীলিত প্রভাত-কমল।

এ যেন শুক্লসন্ধ্যায় সদ্য-ফুটে-ওঠা একমুঠো চামেলি ফুল।

তেমনি কোমল, তেমনি ভঙ্গুর, তেমনি উজ্জ্বল অথচ তেমনি সলজ্জ।

এদের কপোলে লাজরক্ত উষার নিত্য আবির্ভাব ; এদের উদারবিস্তৃত চোখে অন্তহীন নীলসাগরের মায়া।

এদের মন আল্লার করুণার মতো—সর্বদাই সর্বস্ব বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত, পাত্রাপাত্র বিচার করে না। স্নেহ দয়া মায়ায় গড়া ফুলের পুতুল এরা।

এ বস্তু অধিকার ক'রে সম্ভোগ ক'রে সুখ আছে।

বিক্রি করাও লাভজনক।

গজনীর হাটে স্থানীয় বাঁদীদের চেয়ে ঢের বেশী চড়া দামে বিক্রি হবে।

এ সবই জানে এরা কিন্তু এখনও সে সুযোগ-সুবিধা পায় নি।

সুলতানের খাস সৈন্যরাই এসব সুবিধার অধিকারী। সাধারণ সৈন্যদের হুকুম নেই কোন প্রকার লুটতরাজের—না নারী না সম্পদ।

হঠাৎ এই আরণ্য-ও পার্বত্য-দেশে এসে সুযোগ যেন আপনিই ধরা দিল ওদের কাছে।

পথ প্রশস্ত হয়ে গেল।

এখানকার মেয়েরা আরও রূপসী।

পঞ্চনদের সমতলবাসিনীদের চেয়ে এই পার্বতীবা ঢের ঢের লোভনীয়।

এখান থেকে কিছু সওদা ক'রে গেলে কী হয়?

নিজেদেরও কাজ চলে, দুপয়সা মুনাফাও হয়!

বিজয়দেব টেরও পাবে না—জনপদ অর্থাৎ গ্রাম বা শহর ছেড়ে ওরা একটু আড়াল আবডাল থেকে যদি সংগ্রহ করে ওদের মাল।

পাহাড় আর অরণ্য, অরণ্য আর পাহাড় চারিদিকে। এর মধ্যে কত ছোট ছোট গ্রাম আছে। যাদের খবর রাজধানীতে পৌছবার আগে ওরা এই ভারতবর্ষ ছেড়ে বহুদূরে চলে যাবে।

কত গ্রাম্য মেয়ে নির্ভয়ে কাঠ কাটতে আসে, আসে বন্য ফল সংগ্রহ করতে।

ঘোরাঘুরি করতে হবে না, খোঁজাখুঁজিও না; গ্রামের কাছাকাছি বনের মধ্যে শুধু ওৎ পেতে বসে থাকার ওয়াস্তা।

সেই মতলবই ভাল লেগেছে সকলের। সেই যুক্তিই মেনে নিয়েছে সবাই।

একশো জন মোট সৈন্য ওরা।

বন্দী তো একটি আঠারো উনিশ বছরের কিশোর ছেলে।

সেও কেমন যেন ভেঙেই আছে। একেবারেই ভেঙে পড়েছে যেন।

কথাও কয় না কারও সঙ্গে, মুখ তুলে তাকায় না পর্যন্ত কোন দিকে। চুপ ক'রে ঘাড় গুঁজে বসে থাকে সর্বদা, আর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে। চোখ তুললেও দৃষ্টিতে যেন এক সুগভীর আতঙ্কের ছাপ।

সবুক্তিগীনের রক্তের কোন প্রকাশ আর ওর মধ্যে নেই। সুলতান মামুদের বীর্য যেন নিঃশেষ হয়ে গেছে ওর পূর্বপুরুষদের মধ্যেই।

ওর দীন মুষড়ে-পড়া হতাশ ভঙ্গী দেখে এক এক সময় ওদের সন্দেহ হয় যে, এ সেই বংশের সন্তান কি না।

এ তো স্ত্রীলোকেরও অধম। বোধ হয় এর হাতের বাঁধন খুলে দিলেও কোনদিন পালাবার চেষ্টা করবে না।

সুতরাং এতগুলো লোক মিলে ওকে ঘিরে বসে থেকে লাভ কি?

অসহায়, নিরস্ত্র বালক। পালাতে যদি চেষ্টাও করে, আর সে চেষ্টায় যদি সফলও হয় তো—কতদূরই বা যাবে? দু'চার ক্রোশ পার হবার আগেই ধরে ফেলবে ওরা, পায়ে ও কোমরে বেড়ি দিয়ে অচল ক'রে দেবে।

এখনও অতটা করে নি—ভূতপূর্ব রাজবংশের প্রতি ঐটুকু সম্মান এখনও বজায় রেখেছে।

অতএব স্থির হ'ল যে পঁচিশ জন মাত্র মূল তাঁবুতে থাকবে বন্দীকে নিয়ে, বাকী সকলে ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে।

অতি সাবধানে ও সন্তর্পণে এগোবে ওরা, প্রকাশ্য জনপদ পরিহার ক'রে রাস্তা ও গ্রামের কাছাকাছি বনের আড়ালে বসে থাকবে আত্মগোপন ক'রে।

ঊর্ণনাভ যেমন ক'রে লূতাতন্তু বিস্তার ক'রে স্থির হয়ে বসে থাকে শিকারের অপেক্ষায়, তেমনি।

সাতদিন সময় ধার্য হ'ল। এর ভেতর যার যা মিলবে, মিলবে। নইলে শুধু-হাতেই ফিরবে। ওর চেয়ে বেশী দেরি করা চলবে না কোন মতেই।

আর, কোন মতেই সংবাদটা না ছড়িয়ে পড়ে।

এত অল্প লোকের ভরসায় এদেশের লোককে বিদ্বিষ্ট ক'রে তোলা চলবে না।

যতই নিরীহ আর যুদ্ধবিমুখ হোক এরা—ক্ষেপে উঠলে এই কটা সশস্ত্র লোকই বা কতক্ষণ?

তাছাড়া, সংবাদটা সুলতানের কানে উঠলে আর রক্ষা থাকবে না।

এখনও বিজয়দেব তাঁর মিত্র রাজা।

অকারণে বিজয়দেবকে শত্রু ক'রে তুলতে চাইবেন না তিনি।

সে সম্ভাবনার কারণ যে হবে তাকেও সহজে ক্ষমা করবেন না।

অতএব সাবধান, খুব সাবধান।

ঊর্ণনাভের মতোই নিঃশব্দে কাজ সারতে হবে, কেউ না টের পায়, সংবাদটা না বাইরে ছড়ায়।

সেই যে কটি দল চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল—বর্তমান দলটি তারই অন্যতম।

কিন্তু এদের দুর্ভাগ্য যে আজ এই ষষ্ঠ দিন অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও একটি শিকারও ওদের জালে পড়ে নি। ধারে-কাছেও আসে নি।

ওরা পরদেশী—এখানের পথঘাট, জনপদ গ্রাম বা নগর সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই নেই।

তারা জানে না যে তারা এমন একটা স্থানে এসে পড়েছে যার কাছাকাছি কোন বর্ধিষ্ণু জনপদ নেই। জনপদ যাকে বলে এমন লোকালয়ই নেই আদৌ।

এ স্থানটা আরণ্য-সম্পদের জন্যেই বিখ্যাত!

যে সম্পদ আহরণ করতে আসে পুরুষের দল, তাও দিনমানে।

কিন্তু এখন সে সময়ও নয়।

মালতী নেহাৎ দৈবপ্রেরিত হয়েই এসে পড়েছে। নইলে এখানে ছ-দিন কেন, ছ-বছর বসে থাকলেও এমন শিকার পেত কি না সন্দেহ।

এসব কথা এরা জানে না। তাই এদের কাছে ছ-দিনই মনে হয়েছে ছ-যুগ।

বহুদিনের ক্ষুধা এবং এই ক'দিনের প্রায় ব্যর্থ প্রতীক্ষার পর, এই নিবিড় নির্জন নিশীথে একেবারে অপ্রত্যাশিত ভাবে এমন লোভনীয় শিকারকে মুখের সামনে নিজে থেকে এগিয়ে আসতে দেখেই ঐ হতাশ ক্ষুধার্ত পশুর দল পৈশাচিক উল্লাসে চিৎকার ক'রে উঠেছিল; যে চিৎকার শুনে মালতী মূর্ছিত হয়ে পড়ে।

এসব তথ্য মালতী সংগ্রহ করেছে অনেক পরে।

ওদের কথাবার্তার ফাঁকে ফাঁকে—আকারে ইঙ্গিতে।

এরা এই ক'মাসেই স্থানীয় ভাষা বেশ আয়ত্ত করেছে; সুতরাং বুঝতে অসুবিধা হয় নি খুব একটা।

কিন্তু সে পরের কথা।

মূর্ছা ভাঙতেও মালতীর দেরি হয় নি।

তার কারণ ওকে পড়ে যেতে দেখেই একজন একটা হুঙ্কার দিয়ে উঠে বর্শা ফেলে ছুটে এসে কোলে তুলে নিয়েছিল।

সে পুরুষ এবং অশুচি স্পর্শে ওর সব জড়তা অবসন্নতা কেটে গিয়েছিল, ছট্‌ফট ক'রে উঠেছিল ও। কিন্তু সেই বজ্র-কঠিন বাহুবন্ধন থেকে, হাজার চেষ্টা করলেও রক্ষা পাওয়া সম্ভব ছিল না মালতীর পক্ষে, তবু রক্ষাই পেল সে শেষ পর্যন্ত।

বিধাতাই সদয় হলেন। দুঃখ ওকে ঢের দিয়েছেন, তাতেই বুঝি গত জন্মের পাপ দূর হয়ে গিয়েছিল ওর। এতটা অপমান আর করবার দরকার হয় নি।

মানুষের ছটি প্রধান রিপু তার ধ্বংসের যেমন কারণ হয়, তেমনি অপর মানুষকে রক্ষাও করে অনেক সময়।

সেই লোকটাকে শিকার অধিগত করতে দেখেই বাকী সকলে হুঙ্কার দিয়ে উঠল।

ঝাঁপিয়ে পড়ল ক্ষুধার্ত ব্যাঘ্রের মতো লোকটার ওপর।

তারপর পশুতে পশুতে বাধল লড়াই।

কি নিয়ে লড়াই তাও বুঝি ভুলে গেছে তখন ওরা।

পশুর সমস্ত হিংস্রতা, সকল নখদন্তই বেরিয়ে পড়েছে।

যে লোকটি মালতীকে তুলে নিয়েছিল সে ওকে প্রায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়েই গিয়ে বর্শা কুড়িয়ে নিয়েছিল আবার।

কিন্তু তার জন্য যেটুকু সময় লেগেছিল সে সময়ের মধ্যে তার সঙ্গীরা অনেকখানি সুবিধা পেয়ে গেছে। সুতরাং অল্পক্ষণ পরেই তার মৃত বা অচৈতন্য রক্তাক্ত দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

তার পরও কিছুক্ষণ চলল লড়াই।

কে প্রথম সম্ভোগ করবে—তাই নিয়ে বিবাদ, তাই নিয়ে রক্তক্ষয়কারী আত্মনাশা যুদ্ধ!

কেউ চায় না অধিকার ছাড়তে।

কেউ এতটুকু কাল অপেক্ষা করতে রাজী নয়।

বহুদিনের ক্ষুধা তাদের।

কোমল উষ্ণ নারীমাংসও বড় লোভনীয়, বড় রুচিকর।

শেষে আরও জন-দুই জখম হ'তে শান্ত হয়ে এল ওরা।

এতটা অকারণ ও অনর্থক রক্তপাতের পর বোধ হয় চৈতন্য হ'ল ওদের।

ওরা প্রথম প্রশ্ন করার অবকাশ পেল নিজেদের যে, এ কাজ কেন করছি!

আত্মীয়রক্তে কামনার আগুন নির্বাপিত হ'ল কতকটা। তখন গোল হয়ে বসল পরামর্শ করতে।

অনেক আলোচনা ও যুক্তিতর্কের অবতারণার পর স্থির হ'ল যে, ওরা কেউই এখন এই খাদ্যের দিকে লোলুপ রসনা প্রসারিত করবে না।

রাত পোহালেই তো ওদের মেয়াদ শেষ; ওরা ফিরে যাবে শিকার নিয়ে

ওদের ঘাঁটিতে। ওদের যিনি সাক্ষাৎ ওপরও'লা, তাঁর কাছেই নিবেদন করবে এ অম্লান পুষ্প, তারপর তিনি যা আদেশ করেন মেনে নেবে ওরা।

তিনি যদি প্রসাদ দেন তো গ্রহণ করবে;—তাঁর নির্দেশ মতোই করবে।

অথবা তিনি যদি আবার তাঁর ওপরও'লার কাছে গিয়ে সে পুষ্প অর্ঘ্যস্বরূপ পৌঁছে দেন তো তাতেও আপত্তি করবে না ওরা।

তারা কিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্য হয়ত দাবি করবে—এতদিনের ধৈর্য, কষ্টস্বীকার ও পরিশ্রমের জন্য।

এই যুক্তিই মেনে নিল সকলে। তখন সুস্থ ও অক্ষত অবশিষ্টরা আহত মৃত বা মৃতবৎ সঙ্গী-বন্ধুদের দিকে মন দিল।

যদি এরা কিঞ্চিৎ সুস্থ এমন কি বহনযোগ্যও হয়ে ওঠে সমস্ত রাতে—তাহ'লে রাত্রি প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গেই রওনা দেবে ওরা, হিসাব-মতো ওদের প্রাপ্য আর একটা দিন—সপ্তম দিন—অতিবাহিত ক'রে যাবার চেষ্টা-মাত্র করবে না।

শিকার এসেছে বটে। কিন্তু আর যে খুব একটা দল বেঁধে কেউ আসবে না, তা এই কদিনে বেশ বুঝতে পেরেছে ওরা।

তাছাড়া আর বুঝি রুচিও নেই।

নিজেদের মনের চেহারাটা দেখে নিজেরাই ভয় পেয়ে গেছে হয়ত।

॥ চব্বিশ ॥

মালতী বসে বসে দেখল সবই।

ভয়ে পাথর হয়ে গিয়েছিল সে। নইলে ওদের আপস লড়াইয়ের ফাঁকে হয়ত পালাতে পারত অনায়াসে।

ভয়ে—তাছাড়া অবসাদ ও ক্লান্তিতেও বটে।

বুঝিবা কেমন একটা হতাশাসও অনুভব করছে সে মনে মনে।

মূর্ছার একটা প্রতিক্রিয়াও আছে।

উপলাস্তীর্ণ নদীতটে আছড়ে পড়ার ফলে সর্বাঙ্গে বেদনাও বোধ করছিল। সেই সঙ্গে তুদিনের ঘোড়ায় চড়ার ব্যথা তো আছেই।

কিন্তু সর্বোপরি ভয়।

নাম-না-জানা আতঙ্ক একটা—। সেইটেতেই পাথর হয়ে গিয়েছিল সে।

তাব বুদ্ধি পর্যন্ত কেমন যেন আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল।

কিছুই ভাল ক'রে ভাবতে পারছিল না।

শুধু মনে মনে কেমন যেন একটা অন্যমনস্ক, আত্মগত ভাবে ক্রমাগত ধিক্কার দিয়ে যাচ্ছিল নিজের নারীজন্মকে।

ধিক্ ধিক্! বৃথা তাদের আস্ফালন: বৃথা তাদের স্পর্ধা। মেয়েদের কোন ক্ষমতাই নেই। কিছুই পারে না তারা।

না আছে তাদের দেহে বল, না আছে তাদের মনে শক্তি।

বড় দুর্বল, বড় অসহায় তারা। তারা শুধু পারে ঘরের কোণে বসে কাঁদতে আর হাহাকার করতে।

তারও তাই করা উচিত ছিল। হাহাকার করা, কাঁদা, আর শেষ পর্যন্ত মরা। এই তাদের সাধ্য, এই তাদের কর্তব্য।

উচিত হয় নি তার এই দুঃসাহস করতে আসার।

এদের হুঙ্কার, এদের এই লোলুপ বীভৎস মূর্তি, এদের এই পৈশাচিক হিংস্রতা দেখেই দেহের সমস্ত রক্ত হিম হয়ে গেছে, ভয়ে গুরুগুরু করছে বুকটা। অসাড়-করা ব্যথার মধ্যেও অনুভব করছে সমস্ত দেহে একটা অসহ্য কাঁপুনি।

এইটুকু শক্তি নিয়ে, এইটুকু সাহস নিয়ে এসেছে সে প্রতিশোধ নিতে! দিগ্বিজয়ী রাজার কাছ থেকে তাঁর বন্দী ছিনিয়ে নিতে!

ধিক্! ধিক্ তাকে, আর ধিক্ তার স্পর্ধাকে।—

মন তার যতই দ্রুত কাজ ক'রে যাক্ দেহ কিছুই করতে পারল না। অনড় পঙ্গুর মতো একদিকে পড়ে রইল সে।

রণক্ষেত্রের মধ্যেই বলতে গেলে।

ওদের আঘাত দু'একটা তার ওপর এসে পড়াও আশ্চর্য নয়। আহতদের রক্ত তো ছিটকে এসে লাগলই বার-কয়েক। তবু নড়া তো দূরের কথা, সে সরে বসতেও পারল না। অসহায় বিমূঢ় দৃষ্টি মেলে সেই আধো-অন্ধকারে বসে বসে দেখতে লাগল ওদের শ্বাপদ-হিংস্রতা।

তারপর লড়াই থামিয়ে যখন পরামর্শ-সভা বসল তখনও চুপ ক'রেই বসে রইল সে।

কিছু বুঝল—কিছু বুঝল না ওদের যুক্তি-পরামর্শ।

বুঝল, যখন পরামর্শ-সভা শেষ হ'লে একটা লোক ওর হাত দুটো ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে একটা গাছের গুঁড়ির সঙ্গে বাঁধতে লাগল—তখন।

প্রথমটা আতঙ্কে চীৎকার ক'রে উঠেছিল ও।

চরম সর্বনাশই আশঙ্কা করেছিল।

তবু বাধা দিতে পারে নি। বাধা দেওয়া হয়ত অসম্ভবই ছিল—চেষ্টাও করতে পারে নি।

শুধুই চীৎকার ক'রে উঠেছিল!

কিন্তু যখন তাঁবুর মধ্যে নিয়ে যাবার চেষ্টা না ক'রে ওকে বাইরেই একটা চীরগাছের গুঁড়ির সঙ্গে বাঁধল—তখন চুপ ক'রে গেল সে।

হয়ত কিছুটা আশ্বস্তও হ'ল।

সর্বনাশ নিশ্চয়ই আছে অদৃষ্টে, তবে সেটা একেবারে আসন্ন নয়—যা সে ভেবেছিল!

সময় যখন পাওয়া গেছে—তখন হয়ত শেষ পর্যন্ত এড়ানোও যেতে পারে সে দুর্ভাগ্য। কে বলতে পারে।

পশুটা বাকা সকলের কী সব নির্দেশমতো একটা পাত্রে ক'রে খানিকটা জল এনে সামনে রাখল ওর।

একটা হাত খুলে দিয়ে ইঙ্গিত করল জলের দিকে।

একটা পাতায় ক'রে গোটাকতক সেব্ এনে রাখল; আর খানকতক মোটা মোটা শুকনো রুটি।

প্রথমটা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল মালতী।

বিধর্মীর খাদ্য!

ঐ খেয়ে প্রাণ-ধারণ করবে সে? তার চেয়ে মৃত্যুই ভাল!

কিন্তু পরক্ষণেই মনে হ'ল, উদ্দেশ্য সিদ্ধি করতে হ'লে সক্রিয় থাকা দরকার।

এখান থেকে, এদের হাত থেকে যদি মুক্তি পাবার চেষ্টা করতে হয় তাহ'লেও। আর সক্রিয় থাকতে হ'লে চাই দেহে কিছু প্রাণশক্তি।

সেই দুপুরে একখানা রুটি খেয়েছে সে, আর দু'আঁজলা জল।

তৃষ্ণায় আবক্ষ শুকিয়ে উঠেছে।

সম্ভবত ক্ষুধাতেই এত ক্লান্তিবোধ করেছে সে।

দেহকে সবল রাখতে গেলে তাকে কিছু খাদ্য দেওয়া দরকার।

কিন্তু তাই বলে এদের দেওয়া জল? এদের দেওয়া খাদ্য?

ঘৃণায় সর্বশরীর শিউরে উঠল।

কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়ল গুরুজীর কথা—আপৎকালে কিছুতেই দোষ নেই। তাছাড়া ফল কখনও অশুচি হয় না—জলও না।

গুরুজী বলতেন, জল নারায়ণ। জল কখনও কোন কালেই অশুচি হয় না নাকি!

আর ওর এই বর্তমান অবস্থার চেয়ে আপৎকাল আর কী হ'তে পারে।

সে একবার গ্রামগুরু বিষ্ণুপ্রসাদ আর গ্রামদেবতা ললিতা-কেশবকে ক'রে হাত বাড়াল জলের পাত্রের দিকে।

জল পান করল আকণ্ঠ। তার পর দুটো সেব্ তুলে নিল। সুপক্ক মিষ্ট বলকারকও বটে।

পাষণ্ডটা দেখিয়ে দিল রুটির দিকে।

মালতী মুখ ফিরিয়ে নিল।

জীবনধারণের মতো খাওয়া তার হয়ে গেছে।

আর প্রয়োজন নেই।

কী বুঝল কে জানে, খানিকটা নির্বোধের মতো হেসে নিয়ে সে রুটির সরিয়ে নিয়ে গেল।

তার পর আবার হাতটা বাঁধতে যাচ্ছিল, কে বুঝি পিছন থেকে বারণ সম্ভবত বলল যে, 'আমরা তো আছিই, কী দরকার মিছিমিছি এত করার?'

আর একবার অকারণ হা-হা ক'রে হেসে নিয়ে দড়িটা ফেলে চলে গে

পরের দিন সকালে একেবারেই ছেড়ে দিল ওকে। ইঙ্গিত করল প্রা সেরে আসতে। দেখিয়ে দিল নদীর দিক।

স্বাধীনতা বৈকি! কিন্তু মালতী জানে যে সজাগ সতর্ক হয়ে আছে পালাবার এতটুকু চেষ্টা করলেই ওরা সচেতন হয়ে উঠবে।

ওরা সবল, সশস্ত্র, ওদের প্রত্যেকের ঘোড়া আছে।

কোথায় পালাবে সে ওদের হাত থেকে?

সুতরাং সে চেষ্টাও সে করল না।

মুখহাত ধুয়ে মাথায় জল দিয়ে এসে বসল।

ইতিমধ্যে ওরাই নিজেদের ঘোড়ার সঙ্গে ভৈরোদাসকে খাইয়ে দি অনেকদিন পরে কিছু দলাই-মলাইও জুটেছে তার অদৃষ্টে।

কাল মালতীর রুটি প্রত্যাখ্যান করা দেখেই বোধ করি ওরা ব বুঝতে পেরেছে! এখানে এসে পর্যন্তই তো দেখছে—ভারতে পা দিয়ে

বরং ওর ফল আর জল খাওয়াতেই ওরা কিছু বিস্মিত হয়েছিল।

ওরা নিজেরা তাই সকালে সেই মোটা মোটা পোড়া রুটির সঙ্গে ঝ হরিণের মাংস প্রাতরাশ সারলেও ওকে দেবার চেষ্টা করল না।

আগের দিনের মতো পাতায় ক'রে কটা সেব্, পাহাড়ী মিষ্ট ফল

কয়েক রকম, এনে রাখল।

আজ আর ওদের পাত্রে জলও দিল না।

দেখিয়ে দিল নদীর দিক।

পেট ভরেই ফল খেয়ে নিল মালতী। কোন দ্বিধা বা সঙ্কোচ করল না।

একবার যখন খেয়েছেই তখন আর সঙ্কোচ ক'রে লাভ কি? বরং দেহে একটু বল ফিরিয়ে আনাই দরকার। কে জানে অদৃষ্টে কী আছে, আজকের প্রভাত কী নবতর দুর্ভাগ্যের বোঝা বহন ক'রে এনেছে ওর জন্য।

আহারাদির পর ওরা তাঁবু তুলল ওখান থেকে।

সব সেরে গুটিয়ে নিয়ে খচ্চর ও ঘোড়ায় চাপান দিতে দিতে দুপুর গড়িয়ে গেল প্রায়।

তার পর ওরা রওনা দিল সেখান থেকে।

মালতীকেও উঠতে বলল ভৈরোদাসের পিঠে।

ওদের ভাষা জানে অনেকেই। অনেকটাই জানে—তাতে কাজ চলে যায় অনায়াসেই। তবু ইশারা-ইঙ্গিতেই কাজ চলছিল বেশির ভাগ।

আজ সকালে ওদের মধ্যে মাতব্বর গোছের একজন—ইয়াসিন তার নাম—অন্তত মালতীর মনে হ'ল সেই নামেই ডাকছে তার সঙ্গীরা,—মালতীকে ডেকে সামনে দাঁড়াতে বলে জেরা করেছিল কিছু।

এই ইয়াসিন প্রায় পরিষ্কারই বলেছিল মালতীদের অঞ্চলের বুলি।

শহর-বাজারের বুলির সঙ্গে দেহাতী বুলির যতটা তফাৎ থাকে তার চেয়ে বেশী নয়। সুতরাং বুঝতে কোনই অসুবিধা হয় নি।

ইয়াসিন জানতে চেয়েছিল তার কথা।

কী নাম তার, কোথায় কোন্ গ্রামে বাড়ি, কেন এমন ভাবে একা এই বিপদসঙ্কুল নির্জন পথে চলেছিল সে, এমন অদ্ভুত অস্বাভাবিক ভাবে।

অস্বাভাবিক যে সেটা ওদের মতো প্রায়-নবাগতরাও জানে। এদেশে মেয়েরা—সাধারণ দেহাতী মেয়েরা অন্তত ঘোড়ায় বিশেষ চড়ে না!

মালতী শান্ত ভাবেই উত্তর দিয়েছিল ইয়াসিনের সমস্ত প্রশ্নের।

কেবল থেমেছিল একটি প্রশ্নের জায়গায় এসে।

সে প্রশ্নটা হচ্ছে উদ্দেশ্যের প্রশ্ন।

কেন চলেছিল সে একা এই বিপদসঙ্কুল পথে—এই প্রশ্নের জবাবটাই ও সহজে দিতে পারে নি।

ইয়াসিন পুনরাবৃত্তি করেছিল প্রশ্নটার—ঈষৎ একটু কঠিন স্বরেই হয়ত

আর ঠিক সেই সময়েই খেয়ালটা খেলে গিয়েছিল মাথায়।

কোন কারণ ছিল না কথাটা বলার, কোন যুক্তি তো নয়ই। বিশেষ কোন উদ্দেশ্য নিয়েও বলে নি। একেবারেই খেয়ালের মাথায় বলে ফেলেছিল।

'মালিক বাহ্‌রামের সন্ধানে যাচ্ছিলুম!'

'মালিক বাহ্‌রাম!'

লাফিয়ে উঠেছিল ইয়াসিন।

শব্দটা কানে যেতে লাফিয়ে উঠেছিল ইয়াসিনের অন্য সঙ্গীরাও। তারা কথা না বুঝলেও নামটা বুঝেছিল বৈকি।

'মালিক বাহ্‌রাম! তার মানে? তার সঙ্গে তোমার কী?'

'তার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিলাম, মিলতে!'

'কিন্তু কেন তাই তো জিজ্ঞাসা করছি। সে বিদেশী বিধর্মী, তুমি হিন্দুর মেয়ে। তাছাড়া তাকে চিনলেই বা কী ক'রে?

অসহিষ্ণু কণ্ঠে প্রশ্ন করে ইয়াসিন।

'মনের সঙ্গে যখন মনের মোলাকাৎ হয় তখন দেশ-ধর্মের গণ্ডী দিয়ে তাকে আটকানো যায় না। তোমার এত বয়স হ'ল খাঁ সাহেব, তাও জান না?'

ঈষৎ অবজ্ঞার সুরেই বলে মালতী।

'তাকে চিনলে কি ক'রে? এত মনের মোলাকাৎ হ'ল কোথায়?'

'ওমা, তাকে যে আমাদের গ্রামে আশ্রয় দিয়ে রেখেছিলেন আমাদের গুরুজী বিষ্ণুপ্রসাদ। ওঁর ছেলে রাজা বিজয়দেবের লোককে সেই খবর দেয়। তাতে কোথাকার কোন ঘুবের রাজার কাছ থেকে বকশিশ পাবার আশায় লোক পাঠিয়ে তাকে বেঁধে নিয়ে গেছে। তাই তো তার সঙ্গে মিলতে ঘরের বার হয়েছি।'

বিশ্বাসযোগ্য নয়, বিশ্বাস করা উচিতও নয়—তবু এ কথাগুলো যে সত্যি বলছে তাতেও তো কোন সন্দেহ নেই।

ওরাও তো এই রকম ইতিহাসই শুনেছে।

তাহ'লে কি সবটাই সত্যি বলছে?

'তাহ'লে তুমি এত দেরি করলে কেন? তাকে তো ধরে নিয়ে গেছে অনেকদিন!'

'তুমি বুঝি সংসারে বাস করো নি কখনও।' আশ্চর্য রকম সাহস বেড়ে যায় মালতীর, সে ধমকের সুরেই কথা বলে, 'ঘরকন্নার মধ্যে? তাহ'লে তুমি এমন বলতে না! আমার মতো অল্পবয়সী মেয়ে—বিশেষত আমাদের সমাজে—ঘর

থেকে গ্রাম থেকে বেরোনো কি খুব সোজা? আমার মাথার ওপর মা-বাবা অভিভাবক নেই? আমি কি স্বাধীন—পুরুষের মতো? তাও পুরুষকেও কৈফিয়ৎ দিতে হয়। অল্পবয়সী হ'লে তো কথাই নেই···আসবার ব্যবস্থা করতে, ঘোড়া পেতেই যে কত দেরি হয়ে গেল!'

তা বটে। এ কথাগুলোও বিশ্বাসযোগ্য যে, তাও অস্বীকার করা যায় না।

ইয়াসিন একবার তার ছাঁটা ছুঁচলো দাড়িতে হাত বুলিয়ে নিল।

'বেশ চলো। তোমার পেয়ারের লোকের সঙ্গেই মিলিয়ে দিচ্ছি!'

হাসল একটু ইয়াসিন। নিষ্ঠুর, পৈশাচিক হাসি। দিনের আলোতে সে দেখেছে মালতীকে আজ। তার রক্তে আগুন ধরেছে তাই।

সে হাসি মালতী লক্ষ্য করল কি না কে জানে—তার আচরণে বা কণ্ঠস্বরে অন্তত তা প্রকাশ পেল না।

সে সামনের দিকে একটু ঝুঁকে পড়ে সাগ্রহে বলল, 'দেবে, দেবে তার সঙ্গে মিলিয়ে? তোমরা জানো সে কোথায় আছে? তোমরাই তাহ'লে ঘুরের রাজার লোক? সে—সে কোথায় আছে? মালিক বাহ্‌রাম ভাল আছে তো?'

'ভালই আছে। খুশ মেজাজে, বহাল তবিয়তে। আরও ভাল থাকবে সে —আগে সুলতানের সঙ্গে দেখা হোক।'

হা হা ক'রে হেসে উঠল ইয়াসিন। কিন্তু সে হাসি আর যা-ই হোক—উল্লাসের নয়।

সে হাসির শব্দে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল মালতীর।

তবু সে ভয় পেল না। মাথা উঁচু ক'রেই দাঁড়িয়ে রইল।

'চল ভাই, রওনা দেওয়া যাক্ এবার!'

হাসি থামিয়ে বলল ইয়াসিন।

রওনা হ'ল ওরা প্রায় দ্বিতীয় প্রহর নাগাদ।

মালতীকে ভৈরোদাসের ওপর চাপতে বলে ভৈরোদাসের লাগামটা নিজের হাতে রাখল ইয়াসিন। যারা অল্পস্বল্প আহত হয়েছিল তারা কী সব ঘাস গাছের পাতা বেটে ঘায়ে লাগিয়ে ঘোড়ার ওপর সওয়ার হ'ল। দুজন খুব বেশী জখম হয়েছিল, তাদের জন্যে করা হ'ল বিচিত্র ব্যবস্থা। বাঁশ কেটে চিরে চালিমতো তৈরী করা হ'ল, সেই চালিতে তাদের শুইয়ে চালিটা বেঁধে দেওয়া হ'ল ঘোড়ার পিঠে। সেই ভাবেই আধশোয়া ক'রে চলতে লাগল তারা। তাদের ঘোড়ার লাগামও এক এক জন ক'রে সুস্থ লোক নিজের হাতে রাখল।

সবাই রওনা হয়ে গেল।

যেতে পারল না শুধু একজন।

যে আগে এসে মালতীকে বুকে তুলে নিয়েছিল—সে-ই আর উঠতে পারল না।

আর পারবেও না কোনদিন।

একেবারেই ঘায়েল হয়েছিল সে।

তার সঙ্গী-বন্ধু-ঘাতকরা আজ সকালে তাকে এইখানেই মাটি দিয়েছে—মালতী তা বসে-বসেই দেখেছে।

দেখেছে আর ললিতাকেশবকে ধন্যবাদ দিয়েছে মনে মনে।

তিনিই রক্ষা করেছেন, নইলে রাক্ষসগুলোর অমন মতিগতি হবে কেন?

॥ পঁচিশ ॥

বড় তাঁবুতে পৌছতে ওদের মোট দুদিন সময় লাগল।

মধ্যে একটা রাত কাটাতে হ'ল বনের মধ্যেই।

রাত্রের একটা মায়া আছে।

অন্ধকারের মোহ আছে একটা।

বিশেষত সে অন্ধকার যদি ঝাপ্‌সা আলোয় বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে তো কথাই নেই।

এতগুলি ক্ষুধার্ত পুরুষের সন্নিধানে একটি কিশোরী মেয়ে।

সুশ্রী, ভঙ্গুর, লোভনীয়।

বিচিত্র আর রহস্যময় মেয়ে।

তার ওপর চারিদিকের অসংখ্য অগ্নিশিখার কম্পমান দ্যুতি তার মুখে-চোখে সর্বাঙ্গে পড়ে তাকে আরও বিচিত্র, আরও রহস্যময় ক'রে তুলেছিল। চারিদিকে কয়েকজোড়া লোলুপ চোখ যেন লেহন করছিল সে রহস্যময়তা।

লোলুপতা ও বুভুক্ষা হিংস্র হয়ে উঠতে দেরি হ'ত না—যদি সকলেই না সমান অধৈর্য হ'ত।

দু-একজন উশখুশ করতেই অপরজনরা তলোয়ার বার করেছে।

খবরদার!

মুখে না বললেও চোখে চোখে সেই হুঁশিয়ারীই ব্যক্ত হয়েছে।

সুতরাং সেরাত্রেও কোনমতে রক্ষা পেয়ে গেছে মালতী।

মনে মনে গুরুজীকে প্রণাম জানিয়েছে সে। প্রণাম জানিয়েছে ললিতা-কেশবকে।...

রাত্রি প্রভাত হ'তে প্রাতঃকৃত্য শেষ ক'রে আবার শুরু হয়েছে যাত্রা।

সে দিন পূর্বদিনেরই পুনরাবৃত্তি ক'রে গেছে মাত্র। এমন কোন স্মরণীয় ঘটনা ঘটে নি।

তার পর সন্ধ্যায় এসে পৌঁচেছে বড় তাঁবুতে।

তখনও অন্য দল সব ফিরে আসে নি।

মালিক বাহ্‌রামকে পাহারা দিতে আছে মোট জনাদশেক সৈন্য আর তাদের দলপতি কুৎব্‌।

কুৎব্‌ তখন সবেমাত্র শিকার ক'রে স্নানাহার শেষ ক'রে একটু আরামের আয়োজন করছেন।

প্রথমত এখন কিছু ভাবতে হবে এবং সিদ্ধান্ত নিতে হবে এইটেই যথেষ্ট বিরক্তিকর, তার ওপর আবার তাঁর প্রধান বন্দী মালিক বাহ্‌রাম সংক্রান্ত ব্যাপার, বিপুল দায়িত্বের কথা।

তিনি অর্ধ-নিমীলিত নেত্রে সব শুনে হুকুম করলেন যে, সর্বাগ্রে উক্ত নও-জোয়ান ছোরীকে গোসল করার পানি দেওয়া হোক, আর কিছু খানা। ওঁদের খানা যদি না খায় তো ফলই বরং বেশী ক'রে আনিয়ে দেওয়া হোক। আর নিরিবিলি একটু শোওয়ার ব্যবস্থাও যেন ক'রে দেওয়া হয়; একটা ছোট তাঁবু খালি ক'রে দিলেই হবে। যা শোনা যাচ্ছে বহুদিনের পথশ্রম সহ্য করেছে বেচারী —ধুলো-ময়লা আর উপবাসে মুখে কালি পড়েছে নিশ্চয়। একটু সাফ্‌ আর তাজা হোক আজকের রাতটা বিশ্রাম ক'রে—তারপর কাল সকালে তিনি ওকে ডেকে পাঠাবেন।

তবে হ্যাঁ—বেঁধে রাখার দরকার নেই বটে কিন্তু পাহারা না আল্‌গা রাখা হয়। হিন্দু নওজোয়ান লড়কী ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে নিজের পিয়ারাকে খুঁজতে বেরিয়েছে—ও বড় জবরদস্ত মেয়ে। খুব হুঁশিয়ার।

এই পর্যন্ত বলেই চোখ বুজলেন কুৎব্‌উদ্দীন। এইটুকুতেই যথেষ্ট কষ্ট হয়েছে তাঁর। আসলে সারাদিনের ক্লান্তির পর গরমজলে গোসল ক'রে উঠতেই চোখ দুটি বুজে এসেছে। তারপর প্রচুর আহার এবং তদুপযুক্ত মদ্যপান করেছেন —দুটি অল্পবয়সী ছেলে দুদিক থেকে অঙ্গমার্জনা করছে—ফলে আরামে-আলস্যে তাঁর সমস্ত ইন্দ্রিয় ও চৈতন্য শিথিল হয়ে এলিয়ে পড়েছে—চোখ খুলে চাওয়াই যাচ্ছে না ভাল ক'রে। এ অবস্থায় বেহেস্তের হুরীও তাঁর কাছে তুচ্ছ, গৌণ।

মালতীর বুক কাঁপছিল বৈকি!

এখনই হয়ত বাহ্‌রামের সঙ্গে হবে মুখোমুখি—মিথ্যা ধরা পড়ে যাবে। তার পর শুরু হবে বিশ্রী জেরা আর জবাবদিহি। কী বলবে সে?

তার পর, হয়ত এই ওপরওলার ভয়েই, ঐ দুর্দান্ত রাক্ষসগুলো কিছু করে নি কিন্তু ওপরওয়ালা কি ছাড়বে?

কিন্তু সেই পৈশাচিক কিছু ব্যবহারের বদলে এই রাজকীয় অভ্যর্থনা—স্নানের জল, সুস্বাদু সুমিষ্ট ফল এবং চারপাইয়ের ওপরে একটি প্রস্তুত শয্যা পেয়ে সে চমকে উঠল।

আবারও সে গুরুজী আর কেশবজীকে ধন্যবাদ দিল।

আশ্বস্তও হ'ল একটু মনে মনে।

বার বার এই দারুণ বিপদে রক্ষা পাচ্ছে যখন, তখন শেষ পর্যন্তও হয়ত পাবে।

সে অনেকদিন পরে আরাম ক'রে স্নান করল। পোশাকটা বদলাতে পারলে ভাল হ'ত, ভৈরোদাসের পিঠের ঝোলাতে আছেও একপ্রস্থ, কিন্তু ওদের কাছে এটুকু অনুরোধ জানাতেও তার ইচ্ছা হ'ল না—সুতরাং সেই পুরাতন ধূলিধূসরিত পোশাকটাই একটু ঝেড়েঝুড়ে পরল আবার এবং পেটপুরে আহার ক'রে টান মেরে বিছানাটা নামিয়ে ফেলে দিয়ে শুধু খাটিয়ার ওপরই শুয়ে পড়ল।

সম্ভবত ঐ দানবগুলোরই কারুর ব্যবহৃত শয্যা—ওতে শুতে ইচ্ছা হ'ল না।

যে বনের মধ্যে রাত কাটিয়েছে—কঠিন কাঁকরের ওপর শুয়েছে—তার কাছে এই খাটিয়াই যথেষ্ট আরামদায়ক।

আরামেই শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল সে—নিশ্চিন্ত হয়ে।

এটুকু সে বুঝেছে যে এদের ওপরওলার ভারী কড়া শাসন, তাঁর কাছে যখন খবর পৌঁচেছে তখন তিনি ছাড়া আর কারও অধিকার নেই তাকে কোন-রকম বেইজ্জৎ করার।

পরের দিন সকালে নাস্তা করার পর মালতীকে তলব করলেন কুৎব্‌উদ্দীন সাহেব।

প্রথমটা অত কিছু ভাবেন নি। দুঃসাহসী মেয়ে, হুঁশিয়ার হয়ে জেরা করতে হবে এইটুকুই ধরে নিয়েছিলেন।

কিন্তু বন্দিনীকে দেখে চমকে উঠলেন তিনি।

স্নান আহার ও সুনিদ্রার পর পরিচ্ছন্ন মালতী তার সেই ধূলিধূসিত সামান্য বেশেই অসামান্য হয়ে উঠেছে।

বন্দিনী যে শুধু অসম-সাহসিনী নয়—অসাধারণ রূপসীও, এটা কুৎব্ আন্দাজ করতে পারেন নি।

কিছুক্ষণ শুধু চেয়েই রইলেন তিনি অবাক হয়ে।

চোখে পলক পড়ল না, নিঃশ্বাস পর্যন্ত রুদ্ধ হয়ে রইল অনেকক্ষণ।

বাহবা-বা, এ মেয়ে যাকে ভালবাসবে তার নসীব ভাল সন্দেহ নেই।

কিন্তু ঐ মালিক বাহ্‌রামটা—মেয়েদের মতো যে নুয়েই আছে অহরহ, কথায় কথায় যার চোখে জল এসে যায়!

ছোঃ!

বড় অপাত্রে দিল্ দিয়েছ পিয়ারী—বড় অপাত্রে।

তোমার উচিত কোন দুঃসাহসী বীর' জোয়ান মরদকে দিল্ দেওয়া—দিগ্বিজয়ী কোন যোদ্ধাকে। তবেই ঠিক জোড় মিলবে।

আছে—হাতের কাছেই আছেও তো।

তিনিই তো আছেন।

সামান্য ক্রীতদাস থেকে দিগ্বিজয়ী সুলতানের বিশ্বস্ত সেনানায়ক হয়েছেন।

উমীদ আছে একদিন কোন তখ্‌তেও বসবেন।

বসবেনই। রাজত্ব করার জন্যেই খোদা তাঁকে পাঠিয়েছেন এ দুনিয়ায়—অপরের তাঁবেদারি করার জন্যে নয়। এ বিষয়ে তিনি নিশ্চিত।

কিন্তু—

না, এ মেয়ে যতই ভাল হোক, যতই তাঁর পাঠান রক্তে আগুন লাগাক, এ মেয়েকে সম্ভোগ করা চলবে না।

খবরদার! তাঁর স্বাভাবিক প্রবৃত্তির রাশ তিনি ছেড়ে দেন নি কখনও। বাসনা কামনা তাঁর প্রভু নয়—তিনিই ওদের প্রভু।

আর, সে তুচ্ছ প্রবৃত্তির রাশ আল্‌গা দেন নি বলেই ক্রীতদাস থেকে আজ সেনাপতি হ'তে পেরেছেন।

তিনিই একদিন পা টিপতেন অপরের, আজ অপরে তাঁর পা টিপছে।

তিনি জানেন কোনখানে ইচ্ছাকে দমন করতে হয়, কঠোর হাতে রাশ টেনে ধরতে হয় চিত্তবৃত্তির।

এই মেয়েটিকে দেখা মাত্র তাঁর দেহের রক্ত উত্তাল হয়ে উঠেছে, বহুদিনের ক্ষুধা জেগেছে স্নায়ুতে স্নায়ুতে—সহস্র রসনা বিস্তার ক'রে।

পাঠানের রক্তই শুধু নয়—তাতারের রক্তও আছে তাঁর ধমনীতে।

তাঁর ক্রীতদাসী মা জনৈক তাতার মনিবের সন্তানই গর্ভে ধারণ করেছিলেন।

তবু—

তিনি জানেন, সম্ভোগ যে কোন রকমেরই হোক না কেন—তার আনন্দ ক্ষণিকের। জিন্দিগীর দাম তার চেয়ে বেশী।

তাঁর দেহেই শুধু শক্তি নেই, মাথাতেও বুদ্ধি আছে। তিনি এই পশুগুলোর মতো দেহসর্বস্ব নন।

এবং চিরকাল বুদ্ধির দ্বারাই চালিত তিনি।

সেই বুদ্ধি তাঁর কানে কানে বলছে, সম্ভোগ ক'রো না একে—কাজে লাগাও। এই দুষ্প্রাপ্য ফুলটি কলঙ্কিত না ক'রে অম্লান অবস্থায় রাজার কাছে, মালিকের কাছে ভেট পাঠাও. আখেরে এ স্বার্থত্যাগ অনেক কাজে দেখবে।

সুদূর কল্পনায় মালিকের সেই প্রসন্ন দৃষ্টির আভাস পেয়ে প্রাণপণ চেষ্টায় আত্মসম্বরণ করলেন কুৎব্‌উদ্দীন।

ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে যথাসাধ্য কঠোর করলেন তাঁর দৃষ্টি. তার পর প্রশ্ন করলেন, 'এসব কি শুনছি, তুমি ঐ বেইমান অমানুষ মালিক বাহ্‌রামের জন্যে তোমার বাপ-মা সংসার দেশভুঁই সব ত্যাগ ক'রে বেরিয়ে এসেছ ?'

'জী।' নত মুখে কিন্তু দৃঢ় কণ্ঠে উত্তর দেয় মালতী।

'তুমি এই আজগুবী কিস্‌সা আমাকে বিশ্বাস করতে বল ?'

'সে আপনার মর্জি আর গরজ। আমি তো আপনাকে এ কথা বিশ্বাস করতে বলি নি। তাতে আমারই বা কি লাভ!'

কোথা থেকে এই দুর্দান্ত সাহস লাভ করে মালতী, কে এই কথা গুলো যুগিয়ে দেয় মুখে তা সে নিজেই ভেবে পায় না।

চমকে ওঠেন কুৎব্‌ও। আবারও চমকে ওঠেন তিনি।

অবাক হয়ে যান।

এ রকম উত্তরের জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন না।

বেশ একটু সময় লাগল তাঁর নিজেকে সামলে নিতে।

তার পর বললেন, 'কিন্তু তুমি আমার ফৌজী নওজোয়ানদের কাছে এ কথা বলেছ কেন ?'

'ওরা জিজ্ঞাসা করেছিল তাই বলেছি। যা সত্য তাই বলেছি। অকারণ মিথ্যাই বা বলব কেন ? মিথ্যা বলার রেওয়াজও আমাদের এ মুলুকে নেই।

ছাড়া—আপনাদের হাতে যখন পড়েছি, মরতে তো হবেই—যদি মরার আগে আমার মনের মানুষকে একবার দেখতে পাই, এই আশায় বলেছি !'

'ছাখো, যত সহজে আমার ঐ মাথা-মোটা সিপাহীগুলোকে ভুলিয়েছ তত সহজে আমাকে ভোলাতে পারবে না। তোমার মতলব কী বল দিকি ? সাফ সাফ জবাব দাও। তুমি মহা শয়তানী—তা আমি এক লহমাতেই বুঝেছি !'

মালতী অন্যদিকে মুখে ফিরিয়ে চুপ ক'রে রইল, কোন জবাব দিল না।

'কী, তোমার এত বড় হিকমৎ ! আমার কথার জবাব দাও না তুমি !'

কি ক'রে ধমক দিতে হয়, গলার আওয়াজে অপরের বুকের মধ্যে কাঁপুনি লাগাতে হয় সে ইলম্ আছে বৈকি তাঁর—নইলে এদেরই তলোয়ারের জোরে উঁচু হয়ে থেকে এদের শাসন করতে পারতেন না—এই অর্ধ-বর্বরগুলোকে !

কিন্তু মালতী তখন মরীয়া, সেও দু'চোখে আগুন ছড়িয়ে সোজা তাকাল কুৎবের দিকে। বলল, 'আমার যা বলবার বলেছি—তারপর আপনার যা ভাববার ভাবুন। আমার একটা মতলব আছে এটা যখন বুঝতে পারছেন তখন মতলবটাও নিজের মগজে খুঁজে পাবেন হয় তো। কিন্তু আমি আপনাকে খুশী করবার জন্যে ঝুট বলতে পারব না, ভগবানের কাছে বেইমান হ'তে পারব না।'

এবার সত্যিসত্যিই ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন কুৎব্।

দুই চোখে তাঁরও আগুন জ্বলল।

শুভ্র সুগৌর ললাটে সেই আগুনের বর্ণ-রেখাই বুঝি ছড়িয়ে পড়ল রক্তিম আভায়।

এতগুলি অনুচরের সামনে এই অপমান যদি তিনি সহ্য করেন, এই ধৃষ্ট জবাবের উপযুক্ত জবাব যদি না দিতে পারেন তো এদের শাসনে রাখবেন কেমন ক'রে ?

তিনি ভয়ঙ্কর কণ্ঠে বললেন, 'আচ্ছা, সাচ-ঝুট এখনই পরখ করছি। যদি সাচ্ ব'লে থাকো তো অল্পে রেহাই পাবে আর ঝুট বলে থাকো তো এখনই জ্যান্ত তোমাকে কুকুর দিয়ে খাওয়াব, আর তার আগে সকলের সামনে মেথর দিয়ে তোমাকে বেইজ্জৎ করাব। এই—কে আছ—ঘিয়াস্ যাও তো, এখনই সেই কুত্তাকে-বাচ্ছা সেই মালিক বাহ্‌রামকে নিয়ে এসো। উঃ! নাম রেখেছে আবার মালিক ! মালিকই বটে। বান্দার বান্দা !'

মালিক বাহ্‌রাম এলে কি সুবিধা হবে তা বোধ করি কুৎব্‌ও ভেবে দেখেন নি অত।

কী করবেন আসলে তা-ই ভেবে পান নি তিনি, অত তাড়াতাড়িতে।

শুধু এইটে মনে ছিল তাঁর যে এখনই কিছু একটা করা দরকার, নইলে তাঁর এই গোলামদের কাছে তাঁর মর্যাদা থাকে না। এখনই সকলের চোখে কৌতুক —আর একটু পরেই মুখে হাত আড়াল দিয়ে হাসবে ওরা।

এতটুকু একফোঁটা একটা মেয়ের কাছে নাকাল হয়ে যদি তিনি হার মানেন, তাহ'লে ওরা যে মহা আস্পর্ধা পেয়ে যাবে : আর কি কেউ মানবে তাঁকে!

একটু সময় চাই তাঁর, কী করবেন ভেবে দেখার—

কেমন ক'রে মুখের মতো জবাব দেবেন এই ধৃষ্ট মেয়েটাকে!

প্রমাণ ক'রে দেবেন যে সত্যিই কোন গূঢ় মতলব আছে ওর।

আর সে মতলব সকলের আগে উনিই আন্দাজ করতে পেরেছেন। সকলকে বোকা বানালেও ওঁকে বোকা বানাতে পারে নি।

এটা যদি না করতে পারেন, ওর ঐ একরত্তি অথচ উদ্ধত কাঁচা মাথাটাকে যদি হেঁট করিয়ে দিতে না পারেন, তাহ'লে আর রক্ষা নেই।

ভয়ের, সম্ভ্রমের একটা আবরণ তৈরী ক'রে তার আড়ালে আছেন বলেই ওরা তাঁকে মাথায় ক'রে রেখেছে, সে অদৃশ্য সূক্ষ্ম জাল যদি ছিঁড়ে যায়—এক নিমেষে তিনি যে ওদের সমান হয়ে যাবেন।

তার পর আর তাঁর শাসন মানবে কেন ওরা।

সুতরাং ভেবে নিতে হবে কিছু একটা। অত্যন্ত দ্রুত ভাবতে হবে।

সেই সময়টুকু চাই।

সেই জন্যই বাহ্‌রামকে আনতে পাঠালেন তিনি, আর তাঁর জীবনের সত্যকার ইষ্ট বুদ্ধিদেবীকে ডাকতে লাগলেন প্রাণপণে, কিছু একটা উপায় বাত্‌লে দেবার জন্য।...

বাহ্‌রামকে ডেকে কী সুবিধে হবে তাঁর, মালতীও তা বুঝতে পারে নি।

কিন্তু তবু তার সত্যিই ভয় ধরেছিল এবার।

এতক্ষণ ধরে তো বিরাট একটা ধাপ্পা চালিয়ে এসেছিল—নিরাপদেই।

কিন্তু এবার?

শেষরক্ষা কি হবে?

মালতীকে চিনতেই পারবে না মালিক বাহ্‌রাম।

মালতী তাকে দেখেছে বহুবারই, কিন্তু গুরুজনদের শাসনের ভয়ে বিধর্মী তরুণ পুরুষের সামনে গিয়ে আলাপ করতে সাহস করে নি।

দূর থেকে হয়ত ওকে দেখেছে বাহ্‌রামও।

বিশাখাদের বাড়িতে যাতায়াতের পথে।

কিন্তু তাতে সে ওকে চিনে রেখেছে বলে তো মনে হয় না।

নাম ধাম পরিচয় কিছুই তো জানে না সে।

যদি অস্বীকার করে? যদি মালতীর দিক থেকে কোন ইঙ্গিত করার সুযোগ মেলবার আগেই সে কোন উল্‌টো উত্তর দিয়ে বসে?

অবশ্য লাভ নেই তার এটা ঠিকই।

মালতীর উপকার হবে জানলে হয়ত মিথ্যাও বলবে সে—কিন্তু সেইটে জানানো যায় কী ক'রে?

নিশ্চয়ই এই নিদারুণ শোকে দুঃখে সে ম্রিয়মাণ হয়ে আছে, হয়ত ওর দিকে চাইবেই না। তার আগেই বলে বসবে, 'কৈ, আমি তো ওকে চিনি না। কখনও পরিচয় হয় নি তো!'

অত মাথাও ঘামাবে না সে,—যে, এর মধ্যে মালতীর কোন অভিপ্রায় থাকতে পারে—এই মিথ্যাভাষণের মধ্যে।

সে এমনই সরল আর উদাসীন যে, মালতী কেন এমন ক'রে দুঃসাহসের বশে বেরিয়ে এল বাড়িঘর ছেড়ে, তাও ভেবে দেখবার চেষ্টা করবে না।

ওঃ, শুধু যদি একবার চোখে চোখ মেলাবার অবকাশ পায় সে!

কোন রকমে এক লহমার জন্যও।

গুরুজী আর ঠাকুর কেশবজী এতটা অনুগ্রহ করলেন—এটুকু কি করবেন না!···

তার এই বিব্রত এবং বিপন্ন অবস্থা আর কেউ লক্ষ্য না করলেও একজন করেছিলেন।

কুৎবের তীক্ষ্ণ সন্ধানী চোখে কিছুই এড়ায় নি।

তার সেই মুখের ঈষৎ বিবর্ণতা, সুডৌল ললাটের প্রান্তে ছড়িয়ে পড়া চূর্ণ কুন্তলগুলিকে অবলম্বন ক'রে ফুটে ওঠা স্বেদকণার আভাস—কিছুই না।

সঙ্গে সঙ্গে উৎসাহিত হয়ে উঠেছিলেন তিনি।

সোজা হয়ে উঠে বসে তাঁর শ্মশ্রুতে হাত বুলিয়েছিলেন একবার।

তাহ'লে ঠিক পথই ধরেছেন তিনি—ঠিক রাস্তায় চলেছেন।

এইবার শয়তানীকে দেখে নেবেন তিনি।

ওর এই গুস্তাকীকে কী ক'রে সায়েস্তা করতে হয়—তাও দেখিয়ে দেবেন।

না হয় পূজা সুলতানের কাছে পৌঁছবেই না শেষ পর্যন্ত।

সুলতান বহুদূরে আছেন।

তাঁর প্রসন্নতার চেয়ে এদের সম্ভ্রমের দাম আপাতত অনেক বেশী।

এরা দাপটে থাকলে তবে তাঁর চোখে থাকবেন কুৎব্।

যে বাঁদীকে স্থলতান চোখে দেখেন নি, তার জন্য এমন কিছু আকুল হয়ে উঠবেন না। যদি-বা কথাটা কানে যায়ও।

এখন তাঁর অনেক আছে।

তাছাড়া একটা ভাল রকম জবাবদিহি তৈরী করাও বিশেষ কিছু কঠি হবে না।

আপাতত এর ঐ উদ্ধত মাথাটাকে মাটিতে নামিয়ে দেওয়াই হ'ল প্রধা কাজ।

তিনি উৎসুক হয়ে তাঁর দরবারী তাঁবুর প্রবেশপথের দিকে চেয়ে রইলেন।

অবশ্য বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হ'ল না কাউকেই।

একটা তাঁবু থেকে আর একটা তাঁবু—কতটুকুই বা!

একটু পরেই মালিক বাহ্‌রামকে ঘিরে নিয়ে প্রবেশ করল তিন চারজন প্রহরী।

ছিন্ন মলিন বেশ, রুক্ষ ধূলিধূসর মূর্তি।

কী চেহারাই না হয়েছে বেচারীর!

সেদিকে চেয়ে চোখে জল এসে গেল মালতীর।

সেইদিন থেকেই হয়ত স্নান হয় নি,—পোশাক বদলানোর কথা তো ওঠে না।

খাচ্ছেও না হয়ত কিছু—অথবা খেতে পারছে না। নইলে অমন কঙ্কালসার হয়ে উঠবে কেন এই ক'দিনে!

কোমল ভঙ্গুর মন ওর মেয়েদের মতো—তা সূর্যপ্রসাদের মুখে অনেকবার শুনেছে মালতী। বিশাখাও কত হাসাহাসি করেছে তাই নিয়ে।

ওর পক্ষে সেদিনের সেই পৈশাচিক কাণ্ডকারখানা দেখার পর কোন খা মুখে তোলা কঠিন বৈকি।

বাষ্পাচ্ছন্ন চোখে চেয়েই রইল মালতী—যদি একবার মুখ তুলে বাহ্‌রা তার দিকে তাকায় এই ভরসায়, কিন্তু যেমন মাথা হেঁট ক'রে তাঁবুতে ঢুকেছি সে—তেমনিই রইল, একবার মাথা তুলল না।

সমস্ত প্রাণশক্তিই নিঃশেষিত হয়ে গেছে বেচারীর—প্রাণটা যে কেন এখনও আছে এইটে আশ্চর্য।

বৃথাই ওর হাতে দড়ি বেঁধে রেখেছে এরা—আর ঘিরে রয়েছে প্রাণপণে।

একেবারে ছেড়ে দিলেও পালাত না ও, পালাতে পারত না।

নিজের আসন্ন সর্বনাশের দুশ্চিন্তার মধ্যেও মালতীর অন্তর ওর জন্যই যেন হাহাকার ক'রে উঠল।

আর তার সেই ক্ষণিক চিত্তবৈকল্যের মধ্যে শুনল, মেঘগর্জনের মতো ভয়ঙ্কর শব্দে কি প্রশ্ন করলেন কুৎব্। তার ভাষা বুঝল না মালতী কিন্তু অর্থটা অনুমান করতে পারল।

আর ঠিক সেই মুহূর্তেই বিদ্যুৎশিহরণের মতো বুদ্ধিটা খেলে গেল মাথায়।

কিছুমাত্র প্রস্তুতি ছিল না তার মনে, একটু আগেও অন্ধকারে দিশা খুঁজে বেড়াচ্ছিল তার বিপন্ন হরিণী-মন। যেন চতুর্দিকে শিকারীর মধ্যে ছট্ফট করছিল একটু পথের জন্য।

সেই পথ এখন আপনিই অবারিত হয়ে গেল চোখের সামনে।

বাঁচবার হয়ত উপায় আর নেই-ই, তবু চেষ্টা ক'রে দেখতে দোষ কি ?

যদি বাঁচে তো দুজনেই বাঁচতে পারে।

একেই হয়ত বলে জীবন নিয়ে জুয়া খেলা। তা হোক, আর যে উপায়ও নেই।

তা ছাড়া—এ হয়ত দৈবনির্দেশই, বুঝি সত্যই ললিতাকেশব তার সহা নইলে কথাটা হঠাৎ এমন ভাবে মাথাতে আসবেই বা কেন ?

সে আর ইতস্তত করল না।

বাহ্‌রাম মাথা তোলবার বা কোন জবাব দেবার আগেই চিৎকার ক'রে ব উঠল সে, 'এ কাকে এনেছ তোমরা ? এ তো মালিক বাহ্‌রাম নয় !'

॥ ছাব্বিশ ॥

সমস্ত দরবার ঘর যেন এক নিমেষে স্তব্ধ হয়ে গেল। পাথর হয়ে গেল উপ সবাই।

হাত-পা নাড়া তো দূরের কথা, নিঃশ্বাস পর্যন্ত পড়ল না কারুর কিছুক্ষণ।

মালিক বাহ্‌রাম নয়। কী সর্বনাশ !

কী বলছে এ বাওরা মেয়েটা !

অনুচ্চারিত এই প্রশ্ন সকলের কণ্ঠে কণ্ঠে মাথা কুটে মরতে লাগল—কেউ একটি শব্দও করতে পারল না।

প্রচণ্ড, অচিন্তিতপূর্ব বিস্ময়ের আঘাতে সকলের বাক্‌শক্তিও বুঝি চলে গিয়েছিল সেই কটি মুহূর্তের জন্য।

'মালিক বাহ্‌রাম নয়! কী বলছ তুমি ছোরী—হুঁশিয়ারীসে বলো!'

অবশেষে কুৎব্‌ই উচ্চারণ করলেন, সকলের মনের সেই অনুচ্চারিত প্রশ্নটি।

'না, মালিক বাহ্‌রাম নয়। এ অন্য লোক। ঠকেছো তোমরা। ঠকিয়েছে তোমাদের। হায়, হায়। কী মরীচিকার পেছনে ছুটে এসে আমি এমন সর্বনাশ করলুম!'

কিন্তু তার বিলাপোক্তির দিকে আদৌ কান ছিল না কুৎবের। একটু আগে যে মর্যাদার প্রশ্নটা বিরাট হয়ে দাঁড়িয়েছিল—'নিদ্রাভঙ্গে ক্ষণিকের বিস্মৃত স্বপনে'র মতো তা-ও কোথায় মিলিয়ে গেল, সে জায়গায় মানসচক্ষুর সামনে ফুটে উঠল প্রভুর ক্রূর ক্রুদ্ধ মুখ।

সর্বনাশ!

এই উন্মাদ মেয়েটার কথা যদি সত্য হয়, তাঁর যে সর্বনাশ হবে তার পরিমাণ যে ভাবাই যায় না।

এতদিন ধরে বসে আছেন তাঁরা নিশ্চিন্ত হয়ে—নিজেদের আখের গুছিয়ে নেবার তালে। সেকথা মালিকের কানে গেলে রক্ষা আছে? এতকালের এত বিশ্বস্ততার কিছুমাত্র মূল্য মিলবে না—বোধ করি সকলকেই জীয়ন্ত অবস্থায় কুকুর দিয়ে খাওয়াবেন, যে শাস্তি একটু আগে কুৎব্‌উদ্দিন মেয়েটার জন্য মনে মনে নির্দিষ্ট করছিলেন।

এবার ললাটের প্রান্তে ঘাম দেখা দেবার পালা কুৎব্‌-এর।

'কী বলছ তুমি!' আবারও অসহায় বিহ্বল ভাবে প্রশ্ন করেন কুৎব্‌। অকারণ প্রশ্ন।

তারপর হুংকার দিয়ে ওঠেন বাহ্‌রামের দিকে, 'এই বেইমান কুত্তা, মাথা উঁচু কর, মুখ তুলে তাকা। কী বলছে এ মেয়েটা—তুই মালিক বাহ্‌রাম নোস্‌!'

মুখ তুলে তাকাল বাহ্‌রাম নিজে থেকেই।

তারও বিস্ময়ের সীমা ছিল না।

কে এ মেয়েটি? এমন অদ্ভুত কথা বলছে!

মনে হচ্ছে একে যেন কোথায় দেখেছে সে। হ্যাঁ, ওখানেই দেখেছে নিশ্চয়, বিশাখাদের বাড়িতে, কিংবা আসা-যাওয়ার পথে—বেরোবার সময়।

কিন্তু ওর তো জানা উচিত যে সে-ই মালিক বাহ্‌রাম।

তবে এমন কথা বলছে কেন ও?

ও এখানে এলই বা কি ক'রে? এরা ধরে এনেছে?

তবে কি সারা গ্রামটাই এরা ধ্বংস করেছে? এদের হাত থেকে কি তা হ'লে কেউ রক্ষা পায় নি?

তার জন্যই কি এদের সকলের সর্বনাশ হ'ল?

এমনি এলোমেলো অসংলগ্ন প্রশ্ন ওর মনে দেখা দিতে লাগল। ওর বিহ্বল দৃষ্টি আরও বিহ্বল হয়ে উঠল।

'বলো, জবাব দাও। নইলে—কোড়ার চোটে জবাব কী ক'রে আদায় করতে হয় তা আমি জানি।'

আবারও গর্জন ক'রে উঠলেন কুৎব্‌উদ্দীন।

বাহরাম শিউরে উঠল আতঙ্কে।

যে কোন প্রকার শারীরিক নির্যাতনেই তার বড় ভয়।

চিরকাল এমনি ভয় তার।

প্রাণটা দেওয়া ঢের সহজ, সে একটা আঘাতের ওয়াস্তা।

কিন্তু বেঁচে থেকে আঘাতের পর আঘাত সহ্য করা—সে বড় কষ্টকর।

ভয়ে ভয়ে মুখ তুলে তাকাল বাহ্‌রাম।

ভয়েই গলা শুকিয়ে এসেছে তার। জিভ্‌ আড়ষ্ট হয়ে গেছে।

অসহায় ভাবে একবার চাইল সে চারদিকে। মালতীর মুখের দিকেও চাইল।

কিন্তু কোথাও কোন সান্ত্বনা পেল না সে।

সবচেয়ে বিহ্বল হয়ে পড়েছে সে মালতীর ব্যাপারটাতেই।

কী কঠিন উগ্র দৃষ্টি তার, কী জ্বলন্ত দুই চোখ।

বাহ্‌রাম কী অপরাধ করল ওর কাছে?

অপরাধ হয়ত করতে পারে, হয়ত তার জন্যেই ওর এই দুর্দশা। কিন্তু তাকে চিনতে পারছে না কেন?

আর—যদি ওর এই বিশ্বাসই হয়ে থাকে যে সে মালিক বাহ্‌রাম নয়—তবে কেন এই প্রচণ্ড বিদ্বেষ!

কুৎব্‌ বললেন, 'গোলাম হায়দার, কোড়া আনো—বেশ শক্ত আর মজবুত কোড়া!'

এ কী করছে বাহ্‌রাম! কী সব খাপছাড়া কথা ভাবছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই আসন্ন বিপদের সামনে?

সে কোনমতে জড়িয়ে জড়িয়ে বলে উঠল, 'আমি তো—আমি তো মালিক—মালিক বাহ্‌রামই। এ মেয়ে কে, একে আমি চিনি না, কেন এমন মিথ্যা কথা

বলছে তাও জানি না।'

'মিথ্যা কথা!' ক্রুদ্ধা সর্পিণীর মতো যেন হিস হিস ক'রে উঠল মালতী।

'মিথ্যা কথা বলছ তুমিই। কৈ, স্পষ্ট আমার দিকে চেয়ে বলো দিকি—তুমি মালিক বাহ্‌রাম!'

মনের মধ্যে বল পেয়েছে মালতী, সে বুঝেছে যে সত্য কথাও জোর ক'রে বলবার মতো মনের জোর নেই বাহ্‌রামের।

সে যত জোর দেবে বাহ্‌রাম তত বিহ্বল হয়ে পড়বে—আর সেইখানেই পাবে সে সুবিধা।

ওর বিহ্বলতাকে মিথ্যার প্রকাশ বলে ধরে নেবে এরা।

মালিক বাহ্‌রাম আরও বিব্রত হয়ে পড়ল। আরও জড়িত কণ্ঠে বলল, 'তুমি কেন এমন কথা বলছ তা আমি জানি না। তুমি, তুমি তো আমাকে চেনো—তবে কেন বলছ যে আমি মালিক বাহ্‌রাম নই?'

এবার যেন আহত ব্যাঘ্রীর মতো লাফিয়ে উঠল মালতী, গর্জন ক'রে উঠে বলল, 'তবে যে তুমি এই এক লহমা আগে বলছিলে তুমি আমাকে চেনো না—কেন একথা বলছি তা জান না। আর এখন বলছ আমি তোমাকে চিনি!'

ওর যে এতদূর অভিনয় করার শক্তি আছে, এত জোর দিয়ে এমন নির্জলা মিথ্যা বলতে পারে, তা কি মালতী নিজেই জানত!

হে ঈশ্বর, হে কেশবজী—আর একটু, আর একটু এমনি বুদ্ধি, এমনি সাহস দাও।

পিছন থেকে কুৎব্‌উদ্দীন অদ্ভুত একটা শব্দ ক'রে উঠলেন।

কোন শব্দ উচ্চারিত হ'ল না—কিন্তু তাঁর মনের অবস্থাটা পরিষ্কার বোঝা গেল সে শব্দে।

ক্রোধ, ক্ষোভ, আতঙ্ক—আর সর্বোপরি একটা পৈশাচিক হিংস্রতা প্রকাশ পেল সেই অদ্ভুত একটা আওয়াজে।

ক্ষেপে উঠেছেন তিনি। ক্ষিপ্ত সিংহের মতো ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছেন।

কিন্তু সেই দুঃসহ ক্রোধ কোথাও কোন অনিষ্ট করার আগেই আবার চেঁচিয়ে উঠল মালতী।

'হ্যাঁ, চিনেছি তোমায়! এবার চিনতে পেরেছি। তুমি মালিক বাহ্‌রা-মের সেই দুধ-ভাই। আমাদের আশেপাশে কোথায় যেন লুকিয়ে ছিলে। নিশীথ রাত্রে দেখা করতে আসতে। বিশাখার মুখে শুনেছি সব কথা। একদিন মাত্র দেখেছিলাম তোমাকে—তাই চিনতে এত দেরি হচ্ছিল।'

দুধ-ভাই !

মালিক বাহ্‌রামের দুধ-ভাই।

কুৎব্‌ এই মেয়েটার সব ধৃষ্টতা ভুলে গিয়ে ওকেই প্রশ্ন করলেন, 'তাই যদি হবে তবে ওকে নিয়ে পালাচ্ছিল কেন ওরা ? ওকে বাঁচানোর কী এত গরজ !'

'আশ্চর্য !' কণ্ঠে অবজ্ঞা আর অনুকম্পা একসঙ্গেই ঝরে পড়ে মালতীর, 'এই বুদ্ধি নিয়ে আপনারা কী ক'রে লড়াই করেন তা ভেবে পাই না। আসলে আপনাদের চোখে ধোঁকা দেবার জন্যই এত ষড়যন্ত্র। এ লোকটা মরতে এসেছে ওর মালিকের ছেলেকে বাঁচাবার জন্যে, নিজে প্রাণ দিয়ে মনিবের নিমকের দাম দেবার জন্যে। সোজাসুজি একে ধরিয়ে দিলে আপনারা সন্দেহ করতেন, জেরা করতেন, হয়ত কিছুটা খোঁজখবরও করতেন—তাই এমন ভাবে ঘটনাটা সাজানো হয়েছিল যেন সত্যিকারের মালিকবাহ্‌রামকেই সরাচ্ছে।···আমাকেও বলে নি ওরা, বিশাখা আর সূর্যপ্রসাদ। বেশ হয়েছে, ওরা মরেছে। এই ক'রে ভেবেছিল বাহ্‌রামের ভালবাসা কেড়ে নেবে আমার কাছ থেকে। মুখ-পুড়ী সর্বনাশী !'

অভিনয় নিখুঁত। আর তার সঙ্গে বাহ্‌রামের বিস্ময়ব্যাকুলতা মিশে সত্য-সত্যই সত্য হয়ে উঠেছে মিথ্যাটা।

ভোলবারই কথা ; কুৎব্‌ও ভুলেছেন।

কিন্তু তবু সম্পূর্ণ বুদ্ধিনাশ ঘটে নি তখনও।

যুক্তি একেবারে পরিত্যাগ করে নি তাঁকে।

তিনি বললেন, 'সবটা অভিনয় হ'তে পারে—আমাদের ঠকানোর আয়োজন হ'তে পারে—শুনেছি সেই বৃন্দাপ্রসাদ লোকটা তার নিজের ছেলেমেয়েকে কেটে ফেলেছিল রাগে—সেটাও কি মিথ্যা ? ওরা কি আমার কাছে এসে মিথ্যা বলেছে, বিজয়দেবের লোকেরা ? তুমি বলতে চাও সেটাও অভিনয় ? কিন্তু অভিনয় নিখুঁত করার জন্যে কেউ নিজের ছেলেমেয়েকে মেরে ফেলে না। বলো এর কী জবাব ?'

'না, সেটা অভিনয় নয়। আর বিজয়দেবের লোকেরাও আপনাকে মিথ্যা বলে নি !'

'তবে কী সেটা ?'

এবার কুৎব্‌ও যেন একটু বিহ্বল হয়ে পড়েন। কী বলতে চায় এ মেয়েটা ? কোনদিকে নিয়ে যাচ্ছে তাঁদের ? এই একরত্তি বাচ্চা মেয়ে তাঁদের সব কজনকে বাঁদর-নাচ নাচাচ্ছে নাকি ?

ক্ষণিক অন্যমনস্কতার মধ্যেই কানে গেল মালতী বলছে, 'বৃন্দাপ্রসাদের প্রচণ্ড বিদ্বেষ ছিল বাহ্‌রামের ওপর। সে বাইরের ঐ ঘরটাতে বাসা নেবার পর একবারও বৃন্দাপ্রসাদ যায় নি ওদিকে। ওদিকে তাকাতেন না পর্যন্ত। কখনই ভাল ক'রে তাকিয়ে দেখেন নি বাহ্‌রামের দিকের। তাই তিনি ওকে চিনতেও পারেন নি। এই নকল লোকটাকেই ভেবেছেন আসল বাহ্‌রাম। কাউকেই তো বলে নি তারা—সূর্যপ্রসাদরা—আর কী ক'রে জানবেন! তাছাড়া তিনি তো ওদের কোন কথা বুঝিয়ে বলার, কি কোন কৈফিয়ৎ দেবার অবসর দেন নি, তারা ব্যাপারটা কি বোঝবার আগেই তলোয়ার দিয়ে কেটে ফেলেছেন। সেই জন্যেই জুচ্চুরিটুকু ধরা পড়ে নি—তাদের উদ্দেশ্য সফল হয়েছে।'

এর পর আর অবিশ্বাস করা সম্ভব নয়। কুৎব্‌ও পারলেন না অবিশ্বাস করতে।

দুরন্ত ক্রোধে ও বিপুল দুশ্চিন্তায় তাঁর মুখে ক্রমান্বয়ে লাল-কালোর খেলা চলতে লাগল।

মনের সেই দুঃসহ ও দুই বিপরীতমুখী আবেগ দমন করতে কিছু সময়ও লাগল।

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন তিনি।

চুপ ক'রে থাকতে বাধ্য হলেন।

মনে হচ্ছে ঐ বেইমান কুত্তার বাচ্ছা—ঐ ছেলেটাকে আর এই সর্বনাশী মেয়েটাকে নিজের হাতে টুকরো টুকরো ক'রে ফেলেন।

হিংস্র আরণ্য জন্তুর মতো ওদের উষ্ণ রক্ত পান করতে ইচ্ছা করছে তাঁর।

এমন কি ওদের ঐ নরম মাংসে দাঁত বসিয়ে খানিকটা কেটে নিয়ে ওদের চোখের সামনে চিবোতে পারলে হয়ত তাঁর এখনকার এই ক্ষিপ্ত হিংস্রতা, এই জিঘাংসা কিছুটা প্রশমিত হয়।

কিন্তু না, এখন তুচ্ছ হৃদয়াবেগকে প্রশ্রয় দিলে চলবে না। মনের তৃপ্তি-সাধনের চেয়ে যথার্থ ইষ্টসাধনই সর্বথা শ্রেয়—এ তিনি জানেন।

মনের চেয়ে মাথা ঢের বড়।

দাসত্ব যদি করতে হয় তো মাথারই করবেন—মনের নয়।

সবই জানেন—তবু বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগল মনকে দমন করতে।

আস্তে আস্তে শান্ত ক'রে আনলেন মনের সহজ হিংস্রতা, শান্ত করলেন মুখভাব।

তারপর সেই স্থির শান্ত দৃষ্টি মালতীর মুখের ওপর নিবদ্ধ ক'রে বললেন,

"তোমার সঙ্গে যদি কিছু লোক দিই, তুমি সেই গ্রামে ফিরে গিয়ে বাহ্‌রামকে খুঁজে বার ক'রে ধরিয়ে দিতে পারবে?'

'আমি!' যেন শিউরে উঠে দু'পা পিছিয়ে গেল মালতী, 'আমি ধরিয়ে দেব বাহ্‌রামকে আপনাদের হাতে? কী ক'রে আশা করেন এটা!'

'দিতেই হবে। তা যদি দিতে পার তো তোমাকে ছাড়ব, নইলে তোমার রক্ষা নেই!'

কঠিন কণ্ঠে বলেন কুৎব্‌।

সে কণ্ঠ জঙ্গী নওজোয়ানদের প্রাণে ত্রাসের সঞ্চার করলেও মালতীর বুক একটুও কাঁপল না। সে অবজ্ঞার সুরে বলল, 'না-ই বা রইল রক্ষা। আমি যে নিজেকে বাঁচাবার জন্যে এত ব্যস্ত তাই বা কে বলল আপনাদের? আপনি কি আশা করেন নিজের এই তুচ্ছ প্রাণটা বাঁচাবার জন্য আমার ভালবাসার লোকের সর্বনাশ করব? কোন মেয়ে করে?'

এবার সাংঘাতিক রকমের একটা ক্রূর হাসি ফুটে উঠল কুৎবের মুখে।

সে হাসির অর্থ বুঝতে কিছুমাত্র ভুল হবার কথা নয়।

একটিই মাত্র অর্থ হয় সে হাসির যে, মৃত্যুটাই সব সময় মানুষের কাছে চরম বিপদ নয়।

মুখেও বললেন সেই কথাই, 'কিন্তু তুমি শুধু মৃত্যুর কথাই বা ভাবছ কেন। সেটা যে তুচ্ছ তা আমিও জানি। তাই সেক্ষেত্রে—যদি আমাদের কথা না শোন তো—বরং সাবধানে বাঁচিয়ে রাখব তোমাকে, যাতে প্রতিদিন তিলে তিলে দৈহিক মৃত্যুর চেয়ে বেশী মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করতে পার, যাতে মৃত্যু দেবার জন্যেই মাথা কোটে তোমার খুদার কাছে। ছাখো—ভেবে ছাখো। বাহ্‌রামকে আমরা ধরবই, তুমি সাহায্য না করলেও ধরতে পারব শেষ পর্যন্ত ঠিকই, হয়ত কিছু দেরি হবে। কিন্তু তুমি যদি সাহায্য করো তো তুমি লাভ-বান হবে অনেক বেশী!'

এবার যেন একটু ভয় পেল মালতী, যেন বুঝল যে এযাত্রা এদের হাত থেকে তার পরিত্রাণ নেই—এদের কথা না শুনলে।

মাথাটা নিচু হয়ে গেল একটু একটু ক'রে, স্তব্ধ হয়ে গেল সে একেবারে।

এবারে কিছুটা তৃপ্ত হলেন কুৎব্‌।

পেরেছেন তিনি, হেঁট করিয়ে দিতে পেরেছেন ঐ মেয়েটার উদ্ধত দুর্বিনীত মাথা।

তিনি একটু সময় দিলেন।

পাকা খেলোয়াড়ের মতোই অপেক্ষা ক'রে রইলেন। মাছ বঁড়শী গিললে সুতোয় ঢিল দিয়ে খেলাতে হয়। একবার যখন বঁড়শী বিঁধেছে গলায়—তখন আর ছাড়াতে পারবে না।

খানিকক্ষণ তিনিও চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'কী করবে মনটা স্থির ক'রে ফ্যালো। সময় বড় কম আমাদের হাতে, এখনই রওনা হ'তে হবে।'

এবার মাথা তুলল মালতী। তবে সে গর্বোদ্ধত দৃপ্ত ভাব আর নেই তার—তা লক্ষ্য ক'রে কুৎব্ আরও খুশী হলেন।

ধমক-খাওয়া আদুরে শিশুর মতোই মুখ ক'রে মালতী বলল, 'কিন্তু সে কোথায় আছে কেমন ক'রে জানব আমি? যদি খুঁজে না পাই? এতদিন কী আর সে চুপ ক'রে বসে আছে? নিশ্চয়ই পালাবার চেষ্টা করেছে সে ওখান থেকে!'

'তা আমিও জানি। সেই জন্যেই তো তোমাকে পাঠাচ্ছি ওদের সঙ্গে—যাতে অকারণ আমার লোকরা না হয়রান হয়। সে কোথায় গেছে কী ভাবে পালিয়েছে তা তোমার গ্রামের কেউ না কেউ নিশ্চয়ই জানে—আর সেটা তাদের কাছ থেকে বার করা তোমার পক্ষে খুব কঠিন হবে না। তোমার বাবা মা আছেন নিশ্চয়ই, তাঁরাই সাহায্য করতে পারবেন তোমাকে। তোমার এত বড় বিপদ দেখেও কিছু চুপ ক'রে থাকতে পারবেন না। একজন বিধর্মীর জন্যে দুটো প্রাণ এর মধ্যেই গেছে—আরও যাতে না যায়, সেজন্যে তাঁরা চেষ্টা করবেন নিশ্চয়ই।'

আবারও একটা বিচিত্র হাসি ফুটে ওঠে কুৎবের মুখে।

ক্রূর এবং কুটিল। তার সঙ্গে ধূর্ততা মাখা।

মালতী অবনত মুখে যেন আরও খানিকক্ষণ ভেবে দেখল কথাটা। তারপর হঠাৎ আবার মুখ তুলে বলল, 'ঐ লোকটাকে বলুন, ও যদি সঙ্গে যায় আর আমাকে সাহায্য করতে রাজী থাকে তো আমি চেষ্টা ক'রে দেখতে পারি।'

'তার মানে? ওকে আবার তোমার কী দরকার? নতুন কোন শয়তানী খেলতে চাও বুঝি?'

'এর মানে যদি না বুঝতে পেরে থাকেন তো বাহ্‌রামকে খুঁজে বার করবার দুঃসাহস আর করবেন না। এ কোন্‌খানে কোন্ গ্রামে কার বাড়ি লুকিয়ে ছিল তা আমরা জানি না। কেউই হয়ত জানে না—তাই বাহ্‌রামের পক্ষে এর জায়গায় সেইখানে লুকিয়ে থাকাই স্বাভাবিক। এ যদি সেই জায়গাটা দেখিয়ে দেয় তো অনেকটা কাজ হাল্‌কা হয় না কি?'

তা বটে !

আশ্চর্য এ মেয়ে। মনে মনে তারিফ না ক'রে পারেন না কুৎব। যা সব যুক্তি দেয় তা একেবারে অকাট্য, জবাব দেবার কিছু থাকে না।

না, এ মেয়েকে তিনি ছাড়তে পারবেন না, একে তাঁর চাই-ই।

কাজ উদ্ধার হোক আগে, তারপর একটা ছুতো ক'রে কথা ফিরিয়ে নেওয়া এমন কিছু কঠিন হবে না।

সে তিনি পারবেন খুব সহজেই।

তাই বলে সুলতানের কাছেও পাঠাবেন না তিনি।

এ মাল নিজের কাছে নিজস্ব ক'রে রাখতে না পারলে সুখ নেই।

মন নাকি বাতাসের চেয়েও দ্রুতগামী, এই চিন্তাগুলো মনে খেলে যেতে এক লহমাও সময় লাগল না।

মালতীর কথার উত্তর দিলেন তিনি সঙ্গে সঙ্গেই।

অবজ্ঞার সুরে বললেন, 'ওকে দিয়ে যা খুশি তাই করাতে পারব। এমনি না করে, দু'চার ঘা কোড়া পিঠে পড়লেই করবে। এই বেইমান, শুনলি এ মেয়েটার কথা ?'

খুব নির্বোধ লোকও বহুক্ষণ ধরে হাতড়াতে হাতড়াতে একসময় হঠাৎ এক একটা কথার গূঢ়ার্থ ধরে ফেলে।

বাহ্‌রাম সেরকম নির্বোধ নয়। সে শান্তি- ও আরাম-প্রিয় ভালমানুষ লোক। আবেগপ্রবণ কোমল মন তার। তাই সে বিহ্বল হয়ে পড়লেও একেবারে বুদ্ধি হারায় নি।

মালতীর এতগুলো মিথ্যা কথার মূলে যে কোন সূক্ষ্ম অভিসন্ধি আছে—হয়ত বা ওকে মুক্ত করারই অভিসন্ধি সেটা—তা এতক্ষণে একটু একটু ক'রে বাহ্‌রামের মাথায় গেছে।

তবু মুখ তুলে কথা কইতে সাহস হ'ল না তার।

মালতীর চোখের দিকে তাকাতে তো নয়ই। সে ঘাড় নেড়ে শুধু জানাল যে সে সবই শুনেছে।

'তোর সেই আস্তানা একে দেখিয়ে দিবি ভালমানুষের মতো। যদি না দিস—সঙ্গে কোড়া থাকবে।'

মাথা হেঁট ক'রেই আবারও সম্মতি জানাল বাহ্‌রাম নীরবে।

দেখাই যাক না এই রহস্যময়ী কোন্ দিকে নিয়ে যাবে তাকে। কোন্ কূলে ভেড়ায় তার এই ফুটো, প্রায়-ডোবা জীবনতরীটা।

কে জানে কী ওর মতলব। কেন এমন ক'রে অম্লানবদনে ঝুড়ি ঝুড়ি মিছে কথা বলে গেল।

কিন্তু মতলব যাই থাক, তার আর ক্ষতিবৃদ্ধি কি!

ওর কথাই বিশ্বাস করেছে এরা। সুতরাং এখন সত্য কথা বললেও বিপদ। সেইটেই কেউ বিশ্বাস করবে না। কোড়া খেতেই হবে হয়ত শেষ পর্যন্ত—মিথ্যা তো একসময় ধরা পড়বেই—কিন্তু এখন 'না' বললে এখনই সেটা পিঠে এসে পড়বে।

প্রাণের মায়া আর নেই তার, এখনই মরতে পারে সে অনায়াসে।

কিন্তু ঐ বর্বরদের হাতে মার খাওয়া!

কোড়ার গাঁটগুলো কেটে কেটে বসে চামড়ায়।

চামড়া ফেটে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছোটে।

তাতে দেয় নুন।

কোড়া খেতে অনেককেই দেখেছে সে।

না না, তাতে দরকার নেই।

তা ছাড়া, সে জানে না এর কী মতলব। যদি ওকে মুক্ত করাই মতলব হয়—আর সেটা শেষ পর্যন্ত হয়েই যায় তো—হয়ত আর কখনই কোড়া খেতে হবে না।

এই কথাগুলো ভাবতে ভাবতেই শুনল কুৎব্ আদেশ করছেন, 'তোমরা কুড়ি-জন সওয়ার যাবে এদের সঙ্গে। আগে পিছে তোমরা থাকবে—মাঝখানে এদের রাখবে। এদের বাঁধবার দরকার নেই, কোন বদমাশী করার চেষ্টা যদি ছ্যাখো তো বাঁধবে। শুধু এদের ঘোড়ার লাগাম থাকবে তোমাদের কারুর হাতে। চারদণ্ড সময় দিলুম তোমাদের, তার মধ্যে তোমরা কিছু খেয়ে, এদের খাইয়ে তৈরী হয়ে নেবে। তোমাদের ঘোড়াকে দানাপানি খাইয়ে কিছু রসদ দিয়ে ঠিক ক'রে রাখা হবে ততক্ষণে। সে অপরে করবে—তোমাদের সেজন্যে সময় নষ্ট করতে হবে না। গোলাম হায়দার, তুমি যাবে—আর উনিশ জন লোক, তুমি বেছে নাও। আজ যে দল এসে পৌছল তারা থাকবে আমার কাছে। আরও সবাই আসুক, আমিও এগোব ঐ দিকে। যদি তেমন বোঝ কাউকে পাঠিয়ে দিও, আরও লোক দিতে পারব।'

'যো হুকুম!'

গোলাম হায়দার অভিবাদন ক'রে বেরিয়ে যাচ্ছিল, কী ভেবে ইঙ্গিতে নিরস্ত করলেন কুৎব্।

'হ্যাঁ শোন, ওদের গ্রাম—মানে যেখানে বাহ্‌রাম ছিল, এই মেয়েটা যেখানে থাকে—আগে সেখানটা ঘুরে যেও, কে জানে ওখানে আর আমরা খোঁজ করব না ভেবে যদি ওখানেই থাকে।'

হে ঈশ্বর, হে কেশব, তাহ'লে তুমি সত্যিই মালতীর সহায় আছ!

জয় গুরুজী!

ওদের গ্রাম! হায় রে, এই বর্বর জন্তুটা যদি জানত ওদের গ্রামের কী অবস্থা এখন!...

এত উদ্বেগের মধ্যেও চকিতে একটু হাসি ফুটে উঠে মিলিয়ে গেল মালতীর মুখে।

॥ সাতাশ ॥

তিনদিন ক্রমাগত চলে তৃতীয় দিনের সন্ধ্যাবেলা—অথবা বলা যায় সন্ধ্যার কিছু আগে—লালতাকেশৌ গ্রামের প্রান্তে এসে পৌছল।

পথশ্রম ও অশ্বারোহণে অনভ্যস্ত মালতীর খুবই কষ্ট হয়েছিল, কারণ তার আগেও কদিন ক্রমাগত ঘোড়ায় চড়ে চলতে হয়েছে তাকে। তার কোমর-পিঠ ফেটে যাচ্ছিল যন্ত্রণায়, আশঙ্কা হচ্ছিল যে এর থেকে হয়ত অপর কোন সাংঘাতিক রোগ জন্মে যাবে শরীরে কিন্তু তবু গর্বিণী তার কষ্টের কথা কাউকে বলে নি। প্রাণপণে দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করেছে সব। বলা মানেই তো একরকম এদের অনুগ্রহ প্রার্থনা করা।

ছিঃ!

প্রাণ তো এমনিই যাবে, না গেলেও স্বেচ্ছায়ই দেবে সে—কারণ সূর্যপ্রসাদকে হারিয়ে তার জীবনের কোন মূল্য নেই। তাছাড়া বাগদত্তা মানে অর্ধবিবাহিতা—এ কথা কতদিন মা-র মুখে শুনেছে সে।

সুতরাং ধর্মত সে এখন বিধবা।

এই বয়স থেকে দীর্ঘকাল—হয়ত দীর্ঘ জীবনই নির্দিষ্ট করেছেন বিধাতা তার জন্ম—বৈধব্য ভোগ করা?

না, সে সম্ভব নয়।

প্রাণই যখন সে রাখবে না—এই দেহকে ত্যাগ করবে স্বেচ্ছায় জীর্ণ গাত্রবস্ত্রের মতো—তখন এ দেহের একটু কষ্ট হ'লেই বা কি?

এই দেহটাই সব নয়।

সম্মান তার থেকে অনেক বড়।

সে সম্মান খোয়াতে রাজী নয় সে—ওদের কাছে একটু বিশ্রাম চেয়ে। ওদের জানিয়ে দিয়ে যে, সে ওদের মতো কষ্ট সহ্য করতে পারে না; বাইরে যতই দর্প দেখাক—ভেতরে সে সাধারণ সুকুমার নারী মাত্র।

তাই সে জোর ক'রেই ওদের সঙ্গে সমানে তাল রেখে চলেছে।

শুধু যখন খুব অসহ্য হয়েছে এক-একবার, কষ্টে চোখে জল এসে গেছে, তখন ওদের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে প্রাণপণে সে উদ্গত অশ্রু দমন করেছে এবং মনে মনে ঈশ্বরকে ডেকেছে, 'হে কেশব! হে কেশব!'

বাল্যকাল থেকে, জ্ঞান হওয়ার পর থেকে ঈশ্বরের ঐ একটি রূপ দেখতেই সে অভ্যস্ত; ঐ একটি নামই তার জ্ঞাত।

তবে অবশ্য রাত্রিগুলো পেয়েছে সে।

রাত্রে ওরা চলত না, কোথাও না কোথাও তাঁবু ফেলে বিশ্রাম করত।

একেবারে শেষরাত্রে উঠে মশালের আলোয় প্রস্তুত হয়ে আকাশে উষার আভাস লাগা মাত্র যাত্রা শুরু করত। আবার সন্ধ্যা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে যাত্রা বন্ধ হ'ত।

রাত্রিগুলোতে পেয়েছে পরিপূর্ণ বিশ্রাম।

নিশ্চিন্ত হয়েই ঘুমিয়েছে সে।

কুড়িটি ক্ষুধার্ত দানবের দ্বারা পরিবৃত থেকেও কিছুমাত্র ভয় করে নি তার।

কারণ—তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালিনী মালতী লক্ষ্য করেছিল কুৎব্‌এর চোখে ঐকান্তিক এবং তীব্র লালসা।

এটাও সে লক্ষ্য করেছিল যে, সে লালসা সম্বন্ধে তার অনুচররাও সচেতন।

সুতরাং এখন আর এরা কেউ তাকে স্পর্শ করতে বা তার কোন ক্ষতি করতে সাহস করবে না।

যা কিছু বোঝাপড়া হবে—যদি তার দুর্ভাগ্যবশতঃ তার দুঃসাহসের সেই শোচনীয় পরিণামই হয়—সে হবে এদের ঐ নেতার সঙ্গেই।

আর সেক্ষেত্রে কী করবে তা মালতীর জানাই আছে।

মধুর রভসরঙ্গে যখন সকল সতর্কতা শিথিল হয়ে আসবে—অথবা নিজের সকাম আলিঙ্গনের মধ্যে পেয়ে উন্মত্ত জন্তুটা যখন উন্মত্ততর হয়ে উঠবে—তখন আর কিছু না হোক তার এই মজবুত তীক্ষ্ণ দাঁতগুলো তো থাকবে। চুম্বনছলে ওর ঐ খাঁড়ার মতো নাকটা তো দাঁতে কেটে নিতে পারবে।

তারপর?

ওকে মারবে ? অশেষ যন্ত্রণা দিয়ে শেষ অবধি বধ করবে ?

করুক। মরতেই তো সে চায়।

আর যন্ত্রণা ?

সব যন্ত্রণাই সহ্য করা যায়, যদি—এটা জানা থাকে যে এর শেষে আছে মধুর শ্রান্তিহরা, সুপ্তিভরা মৃত্যু !

কথাটা চিন্তা করতে করতে কঠিন একটা হাসি ফুটে উঠল মালতীর বুকে।

না, অত কিছু করতে হবে না। সে জানে এ যাত্রায় কেশবজী তার সহায়।

এই যাত্রার মধ্যে, এদের ক্ষণিক অন্যমনস্কতা বা পরস্পরের সঙ্গে গল্প-গুজবের ফাঁকে ফাঁকে, একটা কাজ সে সেরে নিতে পেরেছিল।

তাদের গ্রামের অবস্থা, কেন কিসের উদ্দেশে সে এমন ক'রে দিওয়ানার মতো ঘর ছেড়ে বেরিয়েছে, সেটা জানিয়ে দিতে পেরেছিল মালিক বাহ্‌রামকে।

'ওদের যে খাস দেহাতী বুলি—গ্রাম্য ভাষ', তা বাহ্‌রাম কতকটা শিখেছিল বিশাখা-সূর্যর সঙ্গে কথা বলতে বলতে।

এরা তাতে অভ্যস্ত নয়।

এদেশী ভাষা কেউ কেউ শিখেছে বটে, তবে সে মোটামুটি।

যে দেশে এক এক ক্রোশ তফাতে তফাতে শব্দের উচ্চারণ এবং কথার টান পাল্‌টায়—সে দেশের কোন এক বিশেষ গ্রামের টান বোঝা সম্ভব নয় বিদেশীর পক্ষে।

মালতী তাদের গ্রাম্য বুলিতেই কথা বলেছিল।

বলেছিল অবশ্য খুব সতর্ক হয়েই। এক সময় দুটো একটার বেশী বলবার চেষ্টা করে নি।

তাও সিপাহীদের কথাবার্তা বা গল্পগুজব যখন ঘন হয়ে আসত কিম্বা কেউ কেউ গলা ছেড়ে গান ধরত—তখনই।

তবু এক আধবার হঠাৎ ধরা পড়ে গিয়েছে বৈকি !

দলের নায়ক গোলাম হায়দার থাকত ওদের পিছনে।

পিছন থেকেই দৃষ্টি রাখা বেশী সহজ বলে।

সে-ই ধরে ফেলেছিল একবার।

কর্কশকণ্ঠে বলে উঠছিল, 'খবরদার ! খুব সাবধান ! কী গুজগুজ করছ তোমরা, য়্যাঁ ? বলি শলা-পরামর্শটা কিসের ?'

একটু থমকে পিছিয়ে এসে গোলাম হায়দারের চোখের ওপর চোখ রেখে

ইঙ্গিত ক'রে চাপা গলায় বলেছিল, 'ওর সঙ্গে কথা কয়ে ওকে বুঝিয়ে আমি ভেতরের কথাটাই টেনে বার করার চেষ্টা করছি সাহেব। এখন গোল ক'রো না, তাহ'লে ভয় পেয়ে যাবে।'

'হুঁ। তা বলছে কিছু?'

'এত সহজে বলে? যে অপরের জান বাঁচাবার জন্যে নিজের জান দিতে আসে—সে কী এত সোজা লোক? ওকে দেখতেই অমনি নরম কিন্তু যেখানে ইমানের কথা—মনিবের নিমকের কথা, সেখানে ও খুব শক্ত। আর সেকথা তোমাদের নতুন ক'রে বোঝাব কি, তোমরা ইমানদার লোক—এর মর্ম তোমরাই তো ভাল বোঝ!'

এত বুদ্ধি এত কথা কে তার কণ্ঠে এমন ক'রে যুগিয়ে যাচ্ছে তা মালতী নিজেই ভেবে পায় না।

ইমানের কথাটায় কেমন যেন অপ্রতিভ হয়ে তখনকার মতো চুপ ক'রে গিয়েছিল গোলাম হায়দার।

শুধু একটা ঘোঁৎ-ঘোঁৎ মতো শব্দ করেছিল শুধু। সেটা মালতীর প্রতি আস্থা- বা সন্দেহ-সূচক শব্দ—তখন বোঝা যায় নি।

বোঝা গিয়েছিল আর খানিক পরে।

ওদের আর একবার কথাবার্তার সূত্রপাতে সন্দিগ্ধ কণ্ঠে গোলাম হায়দার বলেছিল, 'তা যা কথা কইবে সাফ সাফ বলো না। ওসব জংলী দেহাতী বুলিতে বলছ কেন? আমরা বুঝতে পারছি না—তাতে সন্দেহ হচ্ছে যে আমাদের বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্র করছ!'

আবারও গলা নিচু ক'রে জবাব দিয়েছে মালতী, 'তোমরা বুঝতে পারছ এ কথা জানতে পারলে আর মুখই খুলবে না। এমনি হয় তো আমার অনুনয় বিনয়ে কিছু বলতে পারে—কিম্বা কথার ফাঁকে দু'একটা কথা টেনে বার করতে পারি। কিন্তু তোমরা শুনছ জানলে একেবারে কুলুপ এঁটে মুখ বন্ধ করবে, শামুকের মতো গুটিয়ে যাবে। যে রোগের যা মন্তর, তোমরা এত বুদ্ধি ধরো আর এই সহজ কথাটা বুঝতে পারছ না?'

তা বটে।

এর পর কিছু বলতে যাওয়া মানে নিজের বুদ্ধিকেই অপমানিত করা।

সুতরাং চুপ ক'রে যেতে হয়েছিল গোলাম হায়দারকে।

মালতীরও আর বিশেষ বাধা হয় নি—যদিও সে তার পরও সতর্কতার ত্রুটি করে নি।

আগুনের সঙ্গে পাপের সঙ্গে সাবধানে খেলতে হয়, বেশী ঘাঁটাতে নেই—তা সে জানে।

অবশ্য বলাও সব হয়ে গিয়েছিল।

সব শুনে দুচোখ ভরে জল এসেছিল মালিক বাহ্‌রামের।

অতি কষ্টে কোনমতে সে অশ্রু আড়াল ক'রে রেখেছিল মালতী এদের চোখ থেকে। নইলে আরও কৈফিয়ৎ দিতে হ'ত, আরও মিথ্যার জাল বুনতে হ'ত।

হায় হায় করেছিল বাহ্‌রাম।

'আমার জন্যই এই সর্বনাশটা হ'ল! আমিই অভিশাপ হয়ে উঠলুম তোমাদের।......তোমরা অসময়ে আশ্রয় দিয়েছিলে, আমার প্রাণদান দিয়েছিলে, তার খুব প্রতিদানই দিলুম। ইস—এতগুলো প্রাণ! এতগুলো শিশুর প্রাণ!......বা'জান বা'জান, কেন আমাকে তখন তোমার সঙ্গে মরতে দাও নি! তোমারও কোন কাজে এলুম না, মিছিমিছি এতগুলি সৎ সরল লোকের কী সর্বনাশই না করলুম!'

কণ্ঠস্বর খুবই নিচু পর্দায় ছিল, তবু এই বিলাপোক্তি এদের কারুর কারুর কানে পৌঁচেছিল।

'কী বলছে ও জানোয়ারটা? মেয়েদের মতো নাকে কাঁদছে কেন?'

'শেষ পর্যন্ত ওর দুধ-ভাইকে বাঁচাতে পারল না—শুধু তাই নয়, তার সঙ্গে নিমকহারামীও করতে হ'ল—এই দুঃখেই কাঁদছে।'

কৈফিয়ৎ দিয়েছিল মালতী।

আর ধমক দিয়েছিল বাহ্‌রামকে।

'এমনি ক'রে মেয়েদের মতো হায় হায় করবে আর কাঁদবে বলেই কি তোমার কাছে ছুটে এলুম? বিশাখা তোমার জন্য প্রাণ দিল—তুমি কিছুই করতে পারবে না তার হত্যার প্রতিশোধ নিতে?'

চোখের জল ছেঁড়া ময়লা জামার হাতায় মুছে ফেলেছিল বাহ্‌রাম সঙ্গে সঙ্গে।

ঘোড়ার ওপর সোজা হয়ে বসেছিল সে।

কণ্ঠস্বরে—তার পক্ষে অভাবনীয়—দৃঢ়তা এনে বলেছিল, 'হ্যাঁ, করব। শোধ নেব মালতী। তুমি নিশ্চিন্ত থেকো, আমার যথাসাধ্য আমি করব। আমি ভীরু দুর্বল—হয়ত কাপুরুষও। কিন্তু বিশাখা, বেচারী বিশাখার হত্যার প্রতিশোধ নিতে যা কিছু করতে হয় আমি করব। তুমি দেখে নিও—এর নড়চড় হবে না, খুদা জামিন!'

মালতীর মুখে হাসি ফুটেছিল, পরিচ্ছন্ন তৃপ্তির হাসি—অনেকদিন পরে।

॥ আঠাশ ॥

লাল্ভা-কেশৌ গ্রামের প্রান্তে যখন ওরা পৌছল তখন সন্ধ্যা হয়-হয়।

দূর থেকে গ্রাম দেখিয়ে দিয়েছিল মালতী, এদিকের পাহাড়ে নেমেই।

দারুণ উৎসাহে এটুকু পথ প্রায় ছুটে এসেছে ওরা।

কিন্তু গ্রামে ঢোকবার মুখে সেই সব উৎসাহ সহসা নষ্ট হয়ে গেল।

যেন একটি উজ্জ্বল-হয়ে-ওঠা দীপশিখা এক ফুঁয়ে নিভিয়ে দিল কে।

এই গ্রাম?

গ্রাম তো নিশ্চয়ই।

ঘরবাড়ি যখন এতগুলো দেখা যাচ্ছে।

কিন্তু এ কী গ্রাম?

শান্ত নিস্তব্ধ অন্ধকার। জনবসতির চিহ্ন পর্যন্ত শূন্য।

একটু ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে না কোথাও। জ্বলছে না কোথাও একটা আলো।

একটা কুকুরও ডেকে উঠল না—এতগুলো ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ পাওয়া সত্ত্বেও।

প্রাণহীন মৃত্যুপুরী।

তবে কি এ গ্রামে শুধু অশরীরী প্রেতরাই থাকে?

জেনেশুনে মারবার জন্যই এই প্রেতপুরীতে টেনে এনেছে মেয়েটা!

আতঙ্কে, সন্দেহে, বিস্ময়ে—অভূতপূর্ব এই অভিজ্ঞতায় সকলে যেন ক্ষণকালের জন্য পাথর হয়ে উঠল।

এমন কি ঘোড়াগুলোও নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইল; শব্দ করল না, কিম্বা চাঞ্চল্য প্রকাশ করল না কোন প্রকার।

স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল মালতীও।

কিন্তু সে ভয়ে নয়—বিস্ময়ে নয়, আবেগে!

তার চিরপরিচিত পল্লী, তার জন্মস্থান।

আজন্ম শুধু এই গ্রামটির সঙ্গেই পরিচয় তার।

এর বাইরে একটা জগৎ আছে জানত, কিন্তু সে জগতে কোনদিন পা দেবার দরকার হয় নি। প্রয়োজন হয় নি তার সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখবার।

তার দেহ এই গ্রামের জলহাওয়াতেই একটু একটু ক'রে পুষ্ট হয়ে উঠেছে; তার কৈশোর পদ্মটি একটি একটি ক'রে দল মেলে বিকশিত হয়েছে এখানেই।

এইখানেই তার প্রাণ, তার সমস্ত সত্তা—জীবনের অর্থ খুঁজে পেয়েছে একদা।

তার প্রাণের আরাম, তার আত্মার আনন্দ—তার সূর্যপ্রসাদকে পেয়েছে।

এইখানকার মাঠে প্রান্তরে নদীতীরে তার সঙ্গে খেলাধুলো ক'রে বেড়িয়েছে আশৈশব।

তারপর একদিন এইখানকার বসন্ত-বাতাসেই মুকুলিত হয়েছে তাদের দুটি আত্মার প্রণয়কোরক।

একদিন এইখানেই শুনেছে যে তাদের শৈশবের খেলা পরিণতি লাভ করবে যৌবনের লীলায়।

জীবনলীলারও সঙ্গী হবে তারা পরস্পরের।

সেই দিনটি থেকে বহুদিন পর্যন্ত—দিনের পর দিন, রাতের পর রাত—সুমধুর স্বপ্ন-কল্পনার জাল বুনেছে এইখানে বসেই।

এখানকার ফুলের গন্ধে, পাখীর গানে, হিল্লোলিত শস্যশীর্ষের বিচিত্র নর্তনে তার প্রাণের সুরও নিজের ছন্দ খুঁজে পেয়েছে—তার জীবনের স্বপ্ন পেয়েছে সার্থকতা।

তারপর একদিন এই মাটিতেই এক নিষ্ঠুর দানবীয় আঘাতে সে স্বপ্ন ভেঙে খান খান হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে।

পরিসমাপ্তি ঘটেছে তার জীবনের সকল সফল সম্ভাবনার।

সব সুখ-সৌভাগ্যের অর্থ মূল্যহীন হয়ে পড়েছে।

সব প্রয়োজনও বুঝি গেছে ফুরিয়ে।

চোখ মেলে দেখেছিল এই গ্রাম হাসিতে আনন্দে, নাচে গানে, উৎসবে পূজায়—সমারোহে প্রাচুর্যে বিকশিত শতদলের মতো প্রাণ-সরোবরে টলটল করছে।

সেই গ্রামই পরিণত হ'তে দেখল সে শ্মশানে।

তার জন্মভূমি।

তার পিতামাতার—পিতামহ-পিতামহীরও জন্মভূমি। আজ কোলাহলহীন প্রাণস্পন্দনহীন মহা-স্তব্ধতায় পূর্ণ মহাশ্মশান।

বাষ্পাচ্ছন্ন চোখে সেদিকে চেয়ে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল তাই।

অকস্মাৎ সে স্তব্ধতা ভেঙে কে একজন অতি রূঢ় কর্কশ কণ্ঠে প্রশ্ন ক'রে উঠল, 'এ কী, এ কোথায় নিয়ে এলে আমাদের! আবার কী নতুন শয়তানি এ সব?'

গোলাম হায়দারেরই কণ্ঠ।

আতঙ্কের জড়তা কাটাতে অস্বাভাবিক জোর দিতে হয়েছে গলায়। তাতেই স্বভাব-কর্কশ কণ্ঠ কর্কশতর হয়ে উঠেছে।

কিন্তু এবার আর সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিতে পারল না মালতী।

কয়েক মুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে ঈষৎ রুদ্ধকণ্ঠে বলল, 'এই আমাদের গ্রাম, লালতা-কেশৌ। এইখানেই ছিল মালিক বাহ্‌রাম।'

'ঝুট্! আবার ঝুট্ বলছ তুমি!'

'সাচ্। আমার ভগবানের দিব্যি। এই সেই গ্রাম।'

'কিন্তু এ গ্রামে লোক কোথায়? কোথাও তো জনবসতির চিহ্ন নেই। কোথায় গেল তোমার সব আত্মীয়স্বজন?'

'কেমন ক'রে জানব। কিছুই তো বুঝতে পারছি না।'

'হুঁ—এ সব তোমার শয়তানি, চালাকি।'

'চালাকি ক'রে কতক্ষণ চালাব। একদিন তো ধরা পড়বেই। আমার সঙ্গে ভেতরে চলো—আমি প্রমাণ ক'রে দিচ্ছি।...আর ঐ ছাখো, আমাদের ভগবান ললিতাকেশবজীর মন্দির!'

নিচের দিকে অন্ধকার ঘনিয়ে এলেও মন্দিরের সু-উচ্চশীর্ষে সোনার চক্র তখনও দিনের আলোর আভায় ঝকমক করছে।

সকলেই দেখতে পেল তা একসঙ্গে।

মন্দির বলেও চিনতে পারবার কোন অসুবিধা নেই।

বিপন্ন গোলাম হায়দার নিজের শুকনো ঠোঁট দুটোয় একবার জিভ বুলিয়ে নিয়ে বাহ্‌রামকে প্রশ্ন করল, 'কেমন রে, এইখানে ছিল তোর দুধ-ভাই?'

মাথা হেলিয়ে বাহ্‌রাম জানাল, 'হ্যাঁ।'

'তা হ'লে গেল কোথায়—গ্রাম-কে-গ্রাম?'

চুপ ক'রে রইল দুজনেই।

'কী, কথা কইছ না কেন?'

'কী কথা কইব বলুন! আমি তো আজ সাত-আট দিন গ্রামছাড়া—কী হয়েছে কিছুই তো বুঝতে পারছি না।'

আর একটি সিপাহী—মুহম্মদ বিন্ বক্তিয়ার—গোলামের কাছে এসে বলল, 'আমি বুঝেছি গোলাম ভাই, পাছে ওদের চালাকি বা জুচ্চুরি ধরা পড়ে, তাই বাহ্‌রামকে নিয়ে গ্রাম শূন্য ক'রে পালিয়েছে কোথাও।'

গোলাম হায়দার মালতীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'কেমন, এ যা বলছে ঠিক?'

'তা হ'তে পারে। তাই হওয়াই সম্ভব।'

বক্তিয়ার আবারও বললে, 'এই কাফের মাম্‌দোগুলো বড় অদ্ভুত জীব। যাকে আশ্রয় দেবে একবার, বাঁচাবার জন্যে না করতে পারে এমন কাজ নেই। সেদিনই গল্প শুনছিলুম, এদের কে এক রাজা—অতিথি খেতে চেয়েছিল বলে নিজের ছেলেকে নিজের হাতে কেটে রান্না ক'রে খাইয়েছিল।'

'আঘ্।' বিচিত্র শব্দ ক'রে গোলাম হায়দার শিউরে উঠল কথাটা শুনে। তারপরে একেবারে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে বলল, 'চল তাহ'লে অন্যত্র খোঁজ করা যাক। এ গ্রামে ঢুকে আর দরকার নেই।'

সর্বনাশ!

এবার সত্য সত্যই প্রমাদ গুনল মালতী।

তাহ'লে যে ওর এত আয়োজন সব পণ্ড হয়ে যায়।

এদের হাত থেকে অব্যাহতি পেতে গেলেও এ গ্রামে একবার ঢোকা দরকার।

তাছাড়া, তাছাড়া—তার উদ্দেশ্য সফল করতে হ'লেও—

যে জন্য এত কাণ্ড তার—এত আয়োজন!

উন্মাদ বৃন্দাপ্রসাদ সম্ভবত আজও এ গ্রামেই আছে।

অন্তত গ্রামবাসীদের সঙ্গে যে সে যায় নি—সে বিষয়ে মালতী নিশ্চিত।

আর কেনই বা যাবে।

সে তো কিছু জানেই না।

গ্রাম যে জনশূন্য হয়ে গেছে তাও হয়ত সে বুঝতে পারে নি।

আজও হয়ত কোন সেব্ গাছের তলায় বসে আপন মনে হাসছে, নয়ত এক শূন্য গৃহ থেকে আর এক শূন্য গৃহে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

অবশ্য চলেও যেতে পারে কোথাও।

শেষ পর্যন্ত যদি সামান্য জ্ঞান এসে থাকে তো ওদের সন্ধানে বেরিয়ে পড়তে পারে।

কিন্তু সেটাও তো নিশ্চিতভাবে জানা দরকার।

আর তা জানতে গেলে এ গ্রামের মধ্যেটা একবার ঘুরে নেওয়া দরকার।

গুরুজীর বাড়ি, বাগান, মন্দির—আর, আর সেই সাংঘাতিক নদীতীর।

সে অনেকের মুখেই শুনেছে যে বিষয়ীর আত্মা যেমন মৃত্যুর পরও নিজের ধনভাণ্ডারের বাইরে যেতে পারে না—তেমনি খুনীও হত্যাকাণ্ডের স্থান ত্যাগ করতে পারে না। ঘুরে ফিরে সেইখানেই বার বার আসে।

হয়ত সেইখানেই ঘুরছে বৃন্দাপ্রসাদ, কে জানে।

সুতরাং এখন যদি এ গ্রামে না ঢুকে অন্যত্র চলে যেতে হয় তাহ'লে সব আশাই যে যায় নষ্ট হয়ে।...

অতিকষ্টে কণ্ঠের ব্যাকুলতা ও উদ্বেগ দমন করতে হয়।

ইতিমধ্যে গোলাম হায়দার এগিয়ে গেছে কয়েক পা। অপর সকলেও ফিরিয়েছে ঘোড়ার মুখ।

বাহ্‌রাম অসহায় ভাবে চেয়ে আছে তারই মুখের দিকে।

মালতী কোনমতে বলে ওঠে, 'কিন্তু সেটা কি ঠিক হবে? গ্রামটা ভাল ক'রে খুঁজে গেলে হ'ত না?'

'আর খুঁজে কী হবে? দেখছ না একটা জ্যান্ত কুকুর পর্যন্ত গ্রামে নেই!'

'সেইটেই তো সন্দেহের কথা। এমন ক'রে তো গ্রাম শূন্য হ'তে পারে না। এত তাড়াতাড়ি সব মালপত্র নিয়ে গোরুবাছুর ভেড়া নিয়ে কোথায় যাবে? অন্ততঃ দু'একটা জানোয়ারও তো ঘুরে বেড়াবে। আমার মনে হয় এটাই একটা ফাঁদ।'

মালতী মনে মনে জানে যে সাত আট দিন খেতে না পাওয়াতেই কুকুর-গুলো গ্রাম ত্যাগ করেছে—নইলে এ নিস্তব্ধতার আর কোন কারণ নেই।

কিন্তু সে কথাটা এদের মনে-করানো চলবে না।

এদের না স্বাভাবিক ভাবে মনে পড়ে সেই কথাটা—গুরুজীর কাছে বরং সেই প্রার্থনাই জানাতে লাগল মালতী মনে মনে।

'ফাঁদ?' গোলাম হায়দার ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে প্রশ্ন করল, 'কিসের ফাঁদ? কি ফাঁদ?'

কিন্তু কথাটা যে মনে লেগেছে তার—তা মুখ দেখেই বোঝা গেল।

তত্ক্ষণে ঘোড়ার মুখও আবার ফিরিয়েছে সে।

'ফাঁদ না হ'লেও ফন্দী তো বটেই।'

'আরে ফন্দীটা কি তা-ই বল না!'

অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে গোলাম হায়দার।

'কোথায় পালাবে ওরা বাহ্‌রামকে নিয়ে? একদিন না একদিন এই জালিয়াতি ধরা পড়বেই—এ ওরা জানে। তখন তোমরা আসল লোকের খোঁজ করতে আসবে এও স্বাভাবিক। কোথায় ওরা রাখবে বাহ্‌রামকে নিয়ে—যেখানেই যাবে সেখানেই খুঁজে বার করবে তোমরা। তাই হয়ত তাকে এই গ্রামেই কোথাও রেখে সরে পড়েছে সবাই। হয়ত তাকে পাহারা দেবার জন্য

দু'একজন শুধু আছে, নিঃশব্দে ঘাপ্‌টি মেরে। তারাই প্রাণধারণের মতো কিছু কিছু খানা যোগাচ্ছে—যে খানা আগুন জ্বেলে তৈরী করতে হয় না। বাকী সব এদিক-ওদিক অন্য গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছে! এ গ্রাম জনশূন্য শ্মশান হয়ে গেছে দেখলে নিশ্চয়ই তোমরা এখানে ঢুকবে না—খোঁজ করবে না। অন্য কোথাও চলে যাবে, বাস্‌ রাম—আমাদের অতিথি থাকবে নিরাপদ। এও তো একটা ফন্দী আঁটতে পারে সকলে!…সত্যিই তো—এই তো তোমরাও চলে যাচ্ছ, একবার নিজের চোখে না দেখেই!'

অকাট্য যুক্তি…। অস্বীকার করার উপায় নেই।

গোলাম হায়দার একটু যেন বিরক্ত হয়ে উঠল নিজের ওপরই।

কথাটা তারই মনে পড়া উচিত ছিল!

এমন ক'রে বার বার ঐ একফোঁটা মেয়ের কাছে হার মানাটা কিছু নয়।

সে ঈষৎ অপ্রতিভ ভাবে বলল, 'তা নয়, এখানে আসতুম ঠিকই। এদিক-ওদিক ঘুরে দিনের বেলা ঢুকতুম। তা আজকের রাতটা না হয় এখানেই তাঁবু ফেলা যাক্, কাল সকালে তখন—'

'কী বুদ্ধি, বাহ্‌বা বা। তোমাদের সেনাপতি এতগুলো ভেড়া না পাঠিয়ে একটা আওরং পাঠালেই ভাল করতেন।'

অপমানে অগ্নিবর্ণ হয়ে উঠল হায়দারের মুখ।

'সাবধান ছোকরী! মুখ সামলে কথা বলো।'

'তা নয়তো কী! এতগুলো লোক হুড়-হুড় ক'রে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে এলে—বাইশটা ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজ তো কম নয়—সে শব্দ কি এতক্ষণ ওরা পায় নি বলতে চাও, মানে যদি সত্যিই কেউ গ্রামের মধ্যে থাকে? তোমরা সারারাত ধরে এখানে তাঁবু ফেলে খাবে দাবে ঘুমোবে আর ওরা তোমাদের হাতে ধরা দেবার জন্যে বসে থাকবে—না?'

'হুঁ!' গোলাম হায়দারের মুখ সংশয়ে কুটিল হয়ে ওঠে।

'এইটেই যে তোমাদের ফন্দী বা ফাঁদ নয় কী ক'রে বুঝব? সবাই যে ঘাপ্‌টি মেরে বসে নেই—আমরা ঢুকলেই চারদিক থেকে ঘিরে ধরবে না—তার প্রমাণ কি?'

সন্দিগ্ধ-কণ্ঠে জেরা করে সে।

'না, তার প্রমাণ কিছুই নেই। তবে মানুষকে অত বোকা না-ই বা ভাবলে।'

'তার মানে?'

'তারা কি জানে না যে তোমার মনিবের এই কুড়িজন লোকই সম্বল নয়, এদের মারলেই সব শক্তি শেষ হয়ে যাবে না? শুধু শুধু এই কুড়িজন লোককে মেরে বেশী বিপদ টেনে আনবে কেন মাথার ওপর? তার চেয়ে যদি নিঃশব্দে এড়িয়ে যেতে পারে সেই তো ভাল।......যাক্ গে—আমি আর অত বকতে পারি না। কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। তোমার যা মর্জি তাই তুমি করো।'

'হুঁ!'

কথাগুলো খুবই খাঁটি, তবু যেন গোলাম হায়দারের মনের সংশয় কাটতে চায় না।

হয়ত এই অন্ধকার নিস্তব্ধ গ্রামে ঢুকতে তার কেমন ভয়ই হচ্ছিল—সেই জন্যই এত যুক্তি, এত সংশয় তার।

সে একটু চুপ ক'রে থেকে বলল, 'তা মালিক বাহ্‌রাম তোমার পেয়ারের লোক, তার জন্যেই তো তুমি বেঁহোশ দিওয়ানা হয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিলে। এখন তাকে ধরিয়ে দেবার জন্যে এত ব্যস্ত হয়ে উঠেছ কেন? মতলবটা যেন তেমন ঠাওর পাচ্ছি না।'

উত্তর দিতে একটু সময় লাগে মালতীর।

উত্তর যখন দিল তখন তার গলায় আর আগেকার ব্যঙ্গ বিদ্রূপ অবজ্ঞা নেই।

গলা তার ভারী, আবেগরুদ্ধ হয়ে এসেছে।

অন্যদিকে চেয়ে—হয়ত বা চোখের জল গোপন করতেই—ধীরে ধীরে বলল, 'তাকে তো তোমরা ধরবেই, সেই এতটুকু অসহায় তরুণের প্রাণ না নেওয়া পর্যন্ত যে তোমার দিগ্বিজয়ী মনিবের শান্তি হবে না, তা তো বুঝতেই পারছি। তাঁর সিংহাসনের ন্যায্য দাবীদারকে এ পৃথিবী থেকে সরাতে না পারলে তিনি স্বস্তি পাবেন না। আর তিনি যখন জিদ ধরেছেন তখন কেউই সে বেচারীকে বাঁচাতে পারবে না। মাঝখান থেকে আমার ইজ্জত যায় কেন! তাই আমার এ আগ্রহ। আমি মুক্তি চাই ইজ্জত বাঁচাবার জন্যে—জান বাঁচাবার জন্যে নয়, বাহ্‌রাম যদি যায় আমিও এ জান রাখব না, এটা জেনে রেখো।'

'তওবা তওবা! বিবি কী দেখেছ বল দিকি তার মধ্যে! এতটুকু একটা ছেলে—না তার কোন ক্ষমতা না তার একটু সাহস। শুনেছি মেয়েরও অধম সে। তার এই দুধভাইয়ের মতোই হবে হয়ত· আর তাই তো হওয়া উচিত,

যে দুধের যা হিম্মৎ—তার জন্যে জান দেবে কেন? আমাদের মুলুকে এমন ঢের মানুষ আছে—মানুষের মতো মানুষ তারা!'

মালতী কথা কইল না।

বোধ করি চরম অবহেলা ভরেই চুপ ক'রে রইল।

গোলামও একটু বোকার মতো হেসে বলল, 'মরুক গে, আমার কী, যার যা পছন্দ।'

তারপর একটা ছোট্ট দীর্ঘশ্বাস ফেলে—খুব সম্ভব গোপন চিত্তক্ষোভেরই দীর্ঘশ্বাস সেটা, এর দিকে হাত বাড়ানো চলবে না সেই জন্যে চিত্তক্ষোভ—সঙ্গীদের দিকে ফিরে বলল, 'তাহ'লে ভাই সব, চল গ্রামে ঢুকে পড়া যাক। আল্লার নাম নিয়ে ঢুকি—তাঁর মর্জিতে যা আছে তাই হবে।'

আবারও তীব্র ব্যঙ্গ ছুঁচের মতো এসে বেঁধে হায়দারকে।

অতি তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর।

গলার আওয়াজ যে এমন বিঁধতে পারে মানুষকে, যুদ্ধ-ব্যবসায়ী স্থূলবুদ্ধি গোলাম হায়দারের তা জানা ছিল না।

মালতী ছোট্ট একটি প্রশ্ন করল, 'সকলে মিলে, দল বেঁধে?'

ক্ষণেকের জন্য চোখ বুজে যেন আঘাতটা সামলে নিল হায়দার, তারপর একটু থতমত খেয়ে বলল, 'কেন, তাতে কী হয়েছে? দোষ কি?'

'না, দোষ কিছুই নেই। ভালই তো, তোমরা একদিক দিয়ে ঢুকবে—তারা আর এক দিক দিয়ে বেরিয়ে যাবে। কোন অসুবিধাই হবে না!'

থমকে দাঁড়িয়ে গেল হায়দার। বেকুফের মতো অসহায় ভাবে সঙ্গীদের মুখের দিকে চাইল।

ঠিক এই আঘাতটার জন্যে প্রস্তুত ছিল না সে।

আজ তার নসীবটাই খারাপ পড়েছে।

যা করতে যাচ্ছে তাতেই ভুল খাচ্ছে এই ক্ষুদী ভীমরুলটার।

তাকে বাঁচিয়ে দিল বক্তিয়ার। বলল, 'এ ছোকরী ঠিকই বলেছে গোলাম ভাই। গ্রামে যদি সত্যিই মানুষ থাকে আমাদের খবর তারা টের পেয়ে গেছে। আমরা তাদের দেখতে পাচ্ছি না কিন্তু তারা দেখছে। এ ভাবে গেলে হবে না, একেবারে চারদিক দিয়ে ঘিরতে হবে!'

'চারদিক দিয়ে ঘিরবে? একটা গ্রাম ঘিরবে এই কুড়িটা লোক?'

এতক্ষণে বুদ্ধিমানের মতো একটা কথা বলতে পেরে বেশ উৎফুল্ল হয়ে ওঠে গোলাম হায়দার।

'তার দরকার হবে না। গ্রামে ঢোকবার বা বেরোবার পথ বেশী নেই। ডান দিক দিয়ে ঘুরে যাও চার জন, একেবারে নদীর ধার পর্যন্ত চলে যাও, ওদিক দিয়ে না কেউ বেরোতে পারে। বাঁদিকে তুদল যাও চার জন ক'রে—একদল ওদিক দিয়ে নদীর ধারে পড়, আর একদল মাঝখানে যে চওড়া রাস্তাটা পাবে, দেখবে সোজা ঐ দিকের পাহাড়টায় উঠে গেছে—সেই পথের মোড়ে দাঁড়িয়ে থাক। ঐ পথে না গেলে এই পথ—নয়তো নদী পার হ'তে হবে—আর কোন পথ নেই!'

'আর তোমরা? তোমরা এই তালে পালাবার পথ পরিষ্কার পেয়ে যাবে—না?'

গোলাম হায়দারের কণ্ঠে তীব্র শ্লেষ। কোথায় যেন একটু চাপা বিদ্বেষও ফোটে।

'আরে বোকারাম, বিশ থেকে বারো গেলে আট থাকে! আমরা তুজন তো তোমাদের সঙ্গেই থাকছি।' আট জনে আমাদের পাহারা দিতে পারবে না?'

'বোকারাম' বিশেষণটা সামলাতে হয়ত সময় নিত, এবারও বক্তিয়ার সামলে নিল!

বলল, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। ঠিকই বলেছে এ। তুমি এদের চোখে চোখে রাখ গোলাম ভাই, আগে পিছে ক'রে নাও চার চার জন। আমি যাচ্ছি নদীর দিকে, ওদিকে তোমরা তু দল বেরিয়ে পড়, আর দেরি ক'রে লাভ নেই। অন্ধকার হয়ে আসছে চারদিক হু-হু ক'রে, একটু পরে আর নজর চলবে না। এসব কাজে মশাল জ্বেলেও লাভ হয় না, মশালে বড় আলো-আঁধারি হয়।'

সেই-মতোই ব্যবস্থা হয়ে গেল দ্রুত।

আর কথা বাড়াল না হায়দার।

যতই কথা বলছে সে, ততই ঠকে যাচ্ছে। দরকার কি বার বার অপমান হয়ে?

কিন্তু অবাক হয়ে গেল মালিক বাহ্‌রাম।

মালতীর মতলবটা কিছুতেই সে ধরতে পারছে না কেন?

আঃ—ঐটুকু মেয়ের যা বুদ্ধি তার কণামাত্রও যদি তার থাকত!

ওর মতলবের যে তলই পাচ্ছে না সে।

এখানকার পথ-ঘাট সবই সে জানে। মালতী তো নিখুঁত ভাবে, ওস্তাদ নেতার মতো নিজে থেকেই সন্ধান দিয়ে সে পথ আগলাবার ব্যবস্থা করছে—

তবে ও পালাবে কেমন ক'রে ?

কী ভাবছে ও, কী বুঝছে ?

যদি কোন রকমে একটু ধরতে পারত বাহ্‌রাম !

অপরিসীম আত্মধিক্কার আকণ্ঠ ফেনিয়ে উঠতে লাগল তার।

ধিক্—তার পুরুষ-জন্মে ধিক্, তার ধমনীর রাজরক্তে ধিক্ !

সত্যিই তার বাঁচা উচিত নয় ! তার বাঁচবার কোন অধিকার নেই।

॥ ঊনত্রিশ ॥

তিন দল তিন দিকে চলে গেলে হায়দারের দল সাবধানে সামনে অগ্রসর হ'ল।

সংকীর্ণ পথ। দুদিকে নিবিড় বন।

চীরগাছ আর শালগাছই বেশী। ফলের গাছও আছে অনেক। সেব্‌ই অধিকাংশ।

এর মধ্য দিয়ে চার জন পাশাপাশি যাওয়া যায় না।

গোলাম হায়দার দুজনের পিছনে দুজন—এই ভাবে সাজাল তার লোক।

পর পর দু দল অর্থাৎ চার জন দিয়ে মাঝে দিল বাহ্‌রাম আর মালতীকে।

তার পিছনে আবারও দু দল, অর্থাৎ চার জন।

মালতীর ঠিক পিছনে রইল সে নিজে।

অর্থাৎ কোন রকম চালাকি করার না অবকাশ পায় মেয়েটা।

সে রকম দেখলে নারীবধেও ইতস্তত করবে না গোলাম হায়দার। উদ্যত বর্শা তো তার হাতেই রয়েছে !

ওপরওলাদের কাছে যা কৈফিয়ৎ দেবার তা সে দিতে পারবে।

বড় সাংঘাতিক মেয়ে। সাক্ষাৎ সাপিনীর মতোই সাংঘাতিক।

খুব হুঁশিয়ার থাকা দরকার।...

সাবধানেই চলল গোলাম হায়দার।

খুব হুঁশিয়ারীর সঙ্গে; চারিদিকে চোখ রেখে রেখে।

কিন্তু এতক্ষণ ধরে কিংকর্তব্য-আলোচনা ও কথা-কাটাকাটির মধ্যে দিনের শেষ চিহ্নটুকুও অন্তর্হিত হয়েছে চীরগাছের ডগা থেকে।

এখন শুধু সামান্য একটু আলোর আভাস লেগে আছে দূর পাহাড়ের মাথাগুলোয়।

চারিদিকের জঙ্গলে ঘন হয়ে এসেছে অন্ধকার।

ঝাপ্‌সা হয়ে যাচ্ছে দৃষ্টি ; সামান্য দূরেও নজর চলছে না।

ঐসব গাছের ফাঁকে কোন মানুষ লুকিয়ে আছে কিনা বোঝা কঠিন।

ভয় ভয় করে ওদিক চেয়ে, ছম ছম করে গা।

মনে হয় এই নির্জন নিস্তব্ধ অন্ধকারে বুঝি অশরীরী কয়েকজোড়া চোখ তাদের লক্ষ্য করছে।

হয়তো ক্রূর শাণিত দৃষ্টি সে চোখে।

তবে সৌভাগ্য-ক্রমে একটু পরেই ওরা সেই ঘন বন কাটিয়ে একেবারে গ্রামের মাঝখানে এসে পড়ল।

অপেক্ষাকৃত ফাঁকা জায়গা এটা। অন্ধকারের রাজত্ব এখনও শুরু হয় নি এখানে।

বেশ ঘন বসতি, অনেকগুলো বাড়ি এক জায়গায়।

বাড়ি মানেই খানিকটা ক'রে বাগান।

গাছপালা এখানেও আছে, তবে নিরবচ্ছিন্ন নয়।

বাগানে শুধুই বড় গাছ থাকে না— ছোট বড় গাছ মিলিয়ে থাকে।

এখানে নিত্য পূজা করে সবাই, সুতরাং কিছু কিছু ফুলের গাছ আছে প্রত্যেক বাগানেই। আছে কিছু কিছু সব্‌জীর চাষ। শাকের ক্ষেত শর্ষের ক্ষেত—এ তো আছেই।

সুতরাং ফাঁকাও আছে খানিকটা ক'রে।

আর ফাঁকা মানেই তো আলো।

এখানে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল হায়দার।

এতটা নিরাপদে আসতে পেরে বুঝি তার ভরসাও খানিকটা বেড়েছে।

সে ঈষৎ অসহিষ্ণু ভাবে বলল, 'তারপর, কৈ, কোথায় কে ?'

'এখানে মানুষ বসে আছে জেনে তৈরি হয়ে বুঝি আমি এনেছি তোমাদের —শুধু দয়া ক'রে হাত বাড়িয়ে ধরবে বলে ?'

ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে মালতী।

'কী বিপদ ! তাই কি আমি বলছি ? এখন কী করতে চাও তাই বলো না ছাই !'

যেন মালতীই এ দলের অধিনেত্রী !

'আমি কেন করতে চাইব—করার কথা তো তোমারই। তুমিই তো পালের গোদা !'

'কী, আমি বাঁদর !···এত বড় আস্পর্ধা তোমার !'

'থাক থাক, ঝগড়া থাক। এদিকে আলো একেবারেই চলে যাচ্ছে।' যেন বয়স্কা অভিভাবিকার মতো দমিয়ে দেয় হায়দারের উদ্যত রোষ। বলে, 'দু-তিন জনকে হুকুম দাও না, চটপট সামনের বাড়িগুলো দেখে নিক। আমরা ততক্ষণ এখানে দাঁড়াই।'

গোলাম হায়দার কথা না বাড়িয়ে সেই রকমই ইশারা করল।

'থাক, কাজ আগে মিটে যাক তো, তারপর তুমিও রইলে আর আমিও রইলাম!' মনে মনে বলল সে।

কিন্তু একটা একটা ক'রে বাড়ি দেখা—সব ঘর, সব গোপন অন্ধিসন্ধি— যত তাড়াতাড়িই করুক, অল্প সময়ে হয় না।

সামান্য একটু সময় দিয়েই মালতী বলে উঠল, 'ওরা এধার দেখুক না ততক্ষণ, চল না আমরা ওদিকের বাড়িগুলোয় খুঁজে দেখি। একেবারেই অন্ধকার হয়ে এল যে।'

তারপর বোধ হয় মুহূর্ত-খানেক থেমেই, গোলাম হায়দারকে কিছু ভাববার বা উত্তর দেবার অবকাশ মাত্র না দিয়ে, একটা বাড়ির দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, 'ঐ যে উঁচু জায়গার ওপর বড় বাড়িটা—ঐটেই গুরুজীর বাড়ি, যেখানে বাহ্‌রাম ছিল। ওটা একবার দেখবে?'

ভুলে গেল সমস্ত সতর্কতা গোলাম হায়দার। ভুলে গেল যে একটু আগেই মনে মনে বলেছে যে, এ মেয়ে সাপের চেয়েও সাংঘাতিক।

ভুলে গেল যে, ওদের দুজনের ঘোড়ার লাগাম সর্বদা নিজেদের হাতে রাখার হুকুম আছে।

তেমন দেখলে বাঁধতেও পারে।

হঠাৎ মনে হ'ল যে মালতীই তাদের দলের নেত্রী। তাদেরই একজন।

অন্তরঙ্গ, বিশ্বস্ত সহচর।

'চলো চলো' বলে ব্যগ্র হয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলল সে সেই দিকে।

মস্ত বড় বাড়ি বিষ্ণুপ্রসাদের—গ্রামের মধ্যে সবচেয়ে বড় বাড়ি।

বহু পুরুষ ধরে ওঁরা এখানকার গুরু। গ্রামদেবতার সেবাইৎ।

বহু দান-ধ্যান করা সত্ত্বেও কিছু কিছু ক'রে ঐশ্বর্য জমতে বাধ্য।

ঐশ্বর্যের দায়ও আছে অনেক।

বহু লোকজন প্রতিপালন করতে হয়। বহু লোককে আশ্রয় দিতে হয়। তাই, প্রয়োজনেই ঘরের সংখ্যা বেড়েছে।

তিনমহল বাড়ি, বহু ঘর।

ঘোড়া থেকে নেমে পড়ে তিন-চার জন তিন-চার দিকে ছড়িয়ে পড়ল, ঘরে ঘরে ঘুরে দেখতে লাগল।

ঘুরতে লাগল মালতী ও বাহ্‌রামও।

তাদের বাধা দেবার কথা কারুর মনে হ'ল না।

এতক্ষণে একটা আস্থাও এসেছে ওদের ওপর।

আর—তারা তো রইলই—কোথায় কতদূর পালাবে ঐ একফোঁটা মেয়ে আর ঐ রোগা দুর্বল ছেলেটা ?

মালতী এ বাড়ির সব ঘরই জানত।

কোথায় কী থাকে সব তার নখদর্পণে।

তার ওপর ওদের বাগ্‌দান উৎসব হয়ে যেতে সূর্যপ্রসাদের মা একদিন ঘুরে ঘুরে সব কিছু দেখিয়েও ছিলেন—ওর ভাবী শ্বশুর-গৃহের সব কিছু।

মালতী তাই সোজা তাঁর ঘরেই গিয়ে হাজির হ'ল।

হ্যাঁ—আছে। সিন্দুকটা তেমনিই আছে।

কিছুই নিয়ে যায় নি ওরা।

সিন্দুকটাতে চাবি দেওয়ার কথাও মনে পড়ে নি কারুর।

ছুটে গিয়ে সিন্দুকটার ডালাটা তুলে ধরেই চিৎকার ক'রে উঠল মালতী।

ছুটে বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

ততক্ষণে ওরাও ছুটে এসেছে—বাকী পাঁচজন।

'কী, কী হয়েছে ? পেয়েছ ওদের ?'

ব্যগ্র কণ্ঠে প্রশ্ন করে সবাই।

'আরে বাপ্‌রে! সিন্দুকভরা কত সোনা! সোনা আর জহরৎ! এত ধনরত্ন আমি কখনও দেখি নি! সব ফেলে চলে গেছে এমনি ক'রে—সিন্দুকে চাবিও লাগায় নি! বাপ্‌রে! বাপ্‌রে!'

বুঝি চিরকালীন নারীই কথা কয়ে ওঠে ওর কণ্ঠে।

সোনা!

জহরৎ!!

জাদু-মন্ত্রের মতো কাজ করে শব্দ দুটো।

সবাই ছুটে গিয়ে ঘরে ঢোকে।

তবু, যেটুকু সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারত—প্রথম যে লোক গিয়ে সিন্দুকের মধ্যে হাত পুরেছিল সে একমুঠো অলঙ্কার বার ক'রে বাইরে ধরে পৈশাচিক উল্লাসে চিৎকার ক'রে উঠল, 'ইয়া আল্লাহ্‌!'

ব্যস্!

বাকী চারজনও গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল সিন্দুকের ওপর। ঠেলাঠেলি মারামারি চলতে লাগল—পাঁচজনের মধ্যে। উন্মত্ত প্রতিযোগিতা, কে কত বাগাতে পারে।

ঠিক এই মুহূর্তটিরই অপেক্ষা করছিল মালতী। আবার তার দুই চোখে আগুন জ্বলে উঠল।

উল্লাসের আগুন, বিজয়গর্বের অহঙ্কার। হয়তো প্রতিহিংসারও আগুন সেটা।

বাহ্‌রাম দাঁড়িয়ে ছিল হতবুদ্ধির মতো দরজার ওপরই—এক ঠেলায় তাকে বাইরে সরিয়ে দিয়ে চোখের নিমেষে কপাট বন্ধ ক'রে শেকল তুলে দিল সে। সেকালের মজবুত দরজা, সহজে ভাঙবে না।

পাঁচজনই বন্দী হয়ে পড়ল ঘরে।

তারপর বাহ্‌রামের হাত ধরে একরকম তাকে টানতে টানতে প্রাঙ্গণে নিয়ে এসে বলল, 'শিগগির, শিগগির ঘোড়ায় চড়ো—আর এক লহমা দেরি ক'রো না।'

'কিন্তু পথ তো বন্ধ—তুমিই তো পথে পথে পাহারা বসিয়েছ।'

'সে ব্যবস্থাও আমিই করছি।' ঘোড়ায় চড়তে চড়তেই বলে মালতী—এই কদিনে বেশ অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে সে ঘোড়ায় চড়তে—'তুমি আমার সঙ্গে গলা মিশিয়ে চিৎকার করো দেখি—যতটা পারো।'

'ভাই সব! শিগগির, শিগগির? ধরা পড়েছে! শিগগির চলে এসো—'

হয়তো সে চিৎকার ওদের কানে পৌঁছত না। কিন্তু একে বিজন পার্বত্য অঞ্চল—তায় রাত্রির স্তব্ধতা। সামান্য শব্দই প্রতিধ্বনিত হয়ে বিপুল শব্দে পরিণত হয়।

ওদিকে পাঁচটা লোক ঘরের মধ্য থেকে চিৎকার করছে।

তাদের কথা কিছু বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু শব্দটা ছড়িয়ে পড়ছে ঠিকই।

চেঁচাচ্ছে আর বন্ধ দরজায় লাথি মারছে।

দেখতে দেখতে তিনদিক থেকে অশ্বপদশব্দ উঠল। ওরা আসছে।

'চলে এসো, চলে এসো। হ্যাঁ, এই দিক দিয়ে, পগার ডিঙিয়ে আস্তাবলের পিছন দিয়ে—শিগগির।'

'কিন্তু ওরা তো আমাদের ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ পাবে। পিছু নেবে না?'

'আমাদের ঘোড়ার শব্দকে ওদের আওয়াজেরই প্রতিধ্বনি মনে করবে, ভয় নেই। কোনমতে নদীটা পেরোতে পারব, ওরা ব্যাপারটা কি জানবার আগেই।'

চলতে চলতেই চাপা গলায় বলে সে।

তবু ভয় যায় না বাহ্‌রামের মন থেকে—সে চাপা করুণ কণ্ঠে বলে, 'কিন্তু তারপর? ওরা যদি পিছনে আসে এখনই তো ধরে ফেলবে!'

'পাগল? আগে অতগুলো সোনা আর জহরতের ভাগ না নিয়ে কেউ আসবে না। ততক্ষণ আমরা ওপারের চীরগাছের জঙ্গলে পড়তে পারব না? এ ঘোড়া দুটো ভাল আছে। চল চল, ভয় পেয়ো না, পিছিয়ে থেকো না. আর কিছু না হোক মরতে তো পারবে।'

তারপর যেতে যেতেই পিছন ফিরে মন্দিরের দিকে উদ্দেশে প্রণাম জানায় সে, 'কোন ভয় নেই! কেশবজী আমাদের সহায়. দেখছ না তিনিই পথ দেখিয়ে আনছেন। নইলে আমি এত শক্তি কোথায় পেতাম!'

দেখতে দেখতে নদীর ধারে এসে পড়ে ওরা।

নদী পেরিয়ে ওদিকের চীরগাছের ঘন জঙ্গলেও ঢুকে পড়ে একসময়।

তখনও গোলাম হায়দারের দল গ্রামের মধ্যেই চিৎকার করছে আর মশাল জ্বালবার আয়োজন করছে।

॥ ত্রিশ ॥

দুর্গম কষ্টসাধ্য দীর্ঘ পথ। দুঃসহ রকমের দীর্ঘ দিন ও রাত্রি। তারই মধ্যে চলেছে যাত্রীদল।

কোথায়—তা কেউ জানে না।

শুধু যেতে হবে এই তারা জানে।

কষ্টের শেষ নেই। তুষারের মধ্য দিয়ে চলা। অসহ শীত। খাদ্যদ্রব্য বিরল। যা এনেছিল তা শেষ হ'তে বসেছে।

ক্বচিৎ দু-একটি পাহাড়ী গ্রাম পড়েছে পথে। তাদের যা আছে নিঃশেষ ক'রে দিচ্ছে অবশ্য তীর্থযাত্রী অতিথিদের—কিন্তু সে আর কতটুকু?

তবু চলেছে ওরা।

বিষ্ণুপ্রসাদকে পেতেই যে হবে ওদের। তার আগে থামলে চলবে না কিছুতেই।

একটা আশ্বাস এই যে, পথ ভুল হয় নি।

এই পথেই গিয়েছেন বিষ্ণুপ্রসাদ। যা দু-চারখানা গ্রাম পড়ছে—ঐ পথের ফেরৎ যে দু-একজন লোকের সঙ্গে পথে দেখা হচ্ছে—সকলের মুখেই খবর পাওয়া যাচ্ছে।

আকৃতি ও প্রকৃতির বর্ণনা মিলছে। উদাসীন নিঃসঙ্গ প্রবীণ ব্রাহ্মণ, একবস্ত্রে চলেছেন এই দুর্গম পথে। গ্রামবাসীরা জোর ক'রে খাওয়ালে খাচ্ছেন —চাইছেন না কারুর কাছেই কিছু। এ বিবরণে বিষ্ণুপ্রসাদকে চিনতে দেরি হয় না একটুও।

কিন্তু তিনি গিয়েছেন একা—হাঁটতে শুরু করেছেন ক'দিন আগে। তাঁর নাগাল পাওয়া কঠিন বৈকি !

এদের সঙ্গে আছে বৃদ্ধ-শিশুর দল, আছে বহু মাল—আছেন দেবতা। তাঁর সেবা-পূজাতেই কতটা সময় চলে যায়।

তাছাড়া এই দুর্গম অনভ্যস্ত পথে হাঁটা—পা চলতেই চায় না অনেকের। তার ওপর দিন দিনই অশক্ত হয়ে পড়ছে সবাই, গতি আসছে মন্থর হয়ে।

তবু একটা আশায় চলেছিল কোনরকম ক'রে—ফিরে যাবার আশা ; আবার সহজ স্বচ্ছন্দ গার্হস্থ্য জীবন যাপন করার আশা। নিশীথ রাত্রির শেষে সূর্যোদয়ের আশা।

হঠাৎ সেই আশা যেন আরও উজ্জীবিত হয়ে উঠল। ত্রিশূলশৃঙ্গের কাছাকাছি একটা গ্রামে এসে শোনা গেল, যে উন্মাদ ব্রাহ্মণ একা নন্দাদেবীকে দর্শন করতে পায়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন, তিনি পথে একটা সরোবরের ধারে অশক্ত হয়ে পড়ে আছেন।

আর উঠতে কি চলতে পারছেন না—হয়তো আর কোন'দিনই পারবেন না।

কেউ কেউ তাঁকে তুলে আনবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তিনি রাজী হন নি।

কিছু খেতেও চাইছেন না।

বলছেন যে ঈশ্বরের নির্দেশ পেয়েছেন তিনি, এইখানেই তাঁর দেহ রাখতে হবে। প্রায়োপবেশনে সে দেহ ত্যাগ করবেন তিনি।

চল চল ! জোরে চল আরও। গুরুজী জীবিত থাকতে থাকতে পৌছও।

একটা উৎসাহ-চাঞ্চল্যের সাড়া পড়ে যায় এ দলে।

এবার হয়তো ধরা কঠিন হবে না। এই কাছেই তো।

আর দেখা হ'লে, সব কথা বুঝিয়ে বললে, নিশ্চয় ফিরতে রাজী হবেন তিনি।

না হয় তো অন্তত একবার তাঁকে দিয়ে পূজো করিয়ে নিলেই কেশবজী তুষ্ট হবেন। রোষ সম্বরিত হবে তাঁর।

সেদিন কেউ বিশ্রাম করল না।

প্রাণপণে হেঁটে গিয়ে পৌছল কুণ্ডের ধারে—সূর্যাস্তের অনেকটা আগেই।

তুষারে ঘেরা পাহাড় চারিদিকে, তার মধ্যে টলটলে স্বচ্ছ সলিলা একটি সরোবর।

সরোবরের পাড়েও কোন কোন জায়গায় শ্বেতশুভ্র তুষার জমে আছে—কঠিন শিলার মতো ডেলা পাকিয়ে।

দু'একটি আসল শিলাও আছে মধ্যে মধ্যে।

কাছাকাছি আসতে হরকিশোরেরই প্রথম নজরে পড়ল, সেই রকম একটি একান্ত শীর্ণ মানুষ বসে আছেন অবসন্ন ভাবে।

'গুরুজী!'

হরকিশোর ছুটে গিয়ে আছড়ে পড়লেন বিষ্ণুপ্রসাদের পায়ের ওপর।

'গুরুজী ক্ষমা করুন—রক্ষা করুন আমাদের। নইলে আর কোন উপায় নেই, কারও সাধ্য নেই কেশবজীর রোষ থেকে আমাদের বাঁচায়।'

অতিকষ্টে ক্লান্ত বিষ্ণুপ্রসাদ চোখের পাতা খুললেন। জীবনীশক্তি নিঃশেষ হয়ে এসেছে তাঁর—প্রাণের জ্যোতি এসেছে স্তিমিত হয়ে।

'কে, হরকিশোর?' চিনতে একটু দেরিই হ'ল বুঝি। 'এ কি—তোমরা এত লোক এখানে কেন এলে? কি ক'রে এলে?'

ক্ষীণকণ্ঠে প্রশ্ন করেন বিষ্ণুপ্রসাদ।

হরকিশোর বোঝেন যে আর বেশী সময় নেই।

সংক্ষেপে বলেন সব কথা।

বিষ্ণুপ্রসাদকে খোঁজবার কথা, খোঁজ পাবার কথা—তাঁর স্বপ্নের কথা, দেবতার বিমুখতার কথা।

তারপর সেই ভয়ঙ্কর কালব্যাধি, সেই অজ্ঞাতপূর্ব মহামারীর বিবরণ দিয়ে তাঁর দৌহিত্রের মৃত্যুর পর কেমন ক'রে এই সিদ্ধান্তে তাঁরা পৌঁচেছেন এবং কী কষ্ট ক'রে সমস্ত গ্রামবাসী এইভাবে বেরিয়ে পড়ে এই দীর্ঘ পথ অমানুষিক কষ্টের মধ্যে দিয়ে অতিক্রম ক'রে এসেছেন—সেই কাহিনী বিবৃত করেন।

তারপর আবারও দুই পা চেপে ধরেন—'গুরুজী, দোহাই আপনার—আপনি ফিরে চলুন! আমরা কাঁধে করে নিয়ে যাব আপনাকে।'

চোখ বুজেই শুনছিলেন বিষ্ণুপ্রসাদ।

জেগে আছেন কি ঘুমিয়ে আছেন, তা বোঝা যাচ্ছিল না—এমন কি বেঁচে আছেন কিনা তাও যেন সন্দেহ হচ্ছিল এক-একবার।

হরকিশোর থামবার পরও অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থাকেন তিনি। তার-পর আবার চোখ খোলেন। বলেন, 'আর আমার সে সময় নেই হরকিশোর।

আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে একেবারেই। অনেক আশায় ছুটে চলেছিলাম—কিন্তু খেয়াল ছিল না যে, ভগবানের নিয়মের রাজ্য এটা, যে দেহটাকে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছি, তাকে সময়মতো আহার এবং বিশ্রাম দেওয়া দরকার। খুব সুস্থ ছিলুম চিরকাল, তাই দেহটার কথা কখনও ভাবি নি। দর্পহারী কেশবজী একেবারে সেটাকে ভেঙে দিয়ে মনে করিয়ে দিলেন কথাটা।···মৃত্যু সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, আর কয়েকটা দণ্ড পর্যন্ত হয়তো পরমায়ু। মনে মনে খুবই কষ্ট হচ্ছিল হরকিশোর, আকুলি-বিকুলি করছিলুম—আর একবার কেশবজীকে দেখবার জন্য। ওঁর অসীম দয়া তাই নিজে এসেছেন আর আমাকেও বাঁচিয়ে রেখেছেন। নিয়ে এসো হরকিশোর, একবার দেখাও। নিশ্চিন্ত হয়ে শেষ নিশ্বাস ফেলি।'

'কিন্তু'—হরকিশোর ব্যাকুল হয়ে ওঠেন, 'আপনাকে একবার পুজোও যে করতে হবে গুরুজী, নইলে উনি তো তুষ্ট হবেন না। অভিশাপ তো যাবে না আমাদের ওপর থেকে।'

'পুজো!' ম্লান হাসেন বিষ্ণুপ্রসাদ, মুখের পেশী ও স্নায়ু অবসন্ন হয়ে পড়েছে বলে অশ্রুবিকৃত দেখায় সে হাসি। বলেন, 'এখনও আমার পুজো নেবার এত শখ ওঁর? তবে নিয়ে এস, নিয়ে এস খুব তাড়াতাড়ি। এখানে এনে ধরো, একজন একটু জল নিয়ে এসো—আর তো কিছু নেই, জল দিয়েই পূজা শেষ করি।'

'না না গুরুজী—পূজার সব আয়োজনই আছে। এনে দিচ্ছি!'

হরকিশোর ছুটে গিয়ে সেই আদিকেশব বিগ্রহকে নিয়ে আসেন। একটা শিলাখণ্ডের ওপর বসিয়ে তাড়াতাড়ি বার করেন পূজার সব আয়োজন।

চন্দন-মাখানো তুলসী শুকিয়ে এনেছেন তাঁরা—এনেছেন পঞ্চপ্রদীপ ও ঘি। সেই সামান্য উপচার ও সরঞ্জামই দ্রুত হস্তে সাজিয়ে দেন ব্রাহ্মণরা তাঁর সামনে।

একজন সরোবরের জল এনে তাঁর হাত ধুইয়ে দেন, তাঁর ইঙ্গিতে মাথাতেও দেন একটু। শিথিল কম্পিত হাতে যজ্ঞোপবীত জড়িয়ে দেন।

এই আয়োজন হ'তে হ'তেই বুঝি খানিকটা সঞ্জীবিত হয়ে ওঠেন বিষ্ণু-প্রসাদ। শক্তি একটু ফিরে আসে তাঁর। মুখ থেকে মৃত্যু-অবসন্নতা ও পাণ্ডুরতা মুছে যায় অনেকটা।

তিনি প্রসন্ন উজ্জ্বল মুখে তুলসী তুলে নেন, মন্ত্র উচ্চারণ করতে থাকেন—কেশবজীর পায়ে দেবেন বলে।

এমন সময় পেছন থেকে একটা সামান্য আর্তনাদ ওঠে যেন—একটা কী ব্যস্ততা অনুভূত হয়। সঙ্গে সঙ্গে, ভাল ক'রে বুঝি পলক ফেলবারও আগে—কে একজন সবাইকে ডিঙিয়ে মাড়িয়ে সরিয়ে ধাক্কা দিয়ে এগিয়ে আসে সামনে এবং চোখের নিমেষে, ব্যাপারটা কী ঘটল বোঝবার বা চেষ্টা করবারও আগে, কেশবজীর মূর্তিটা বেদী থেকে তুলে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয় সরোবরের জলে।

বৃন্দাপ্রসাদ!

কবে কেমন ক'রে কখন থেকে যে সে এই যাত্রীদলের পিছু নিয়েছে, তা কেউ জানে না। কী খেয়ে বেঁচে আছে এতকাল, তাও সকলের অজ্ঞাত।

একবার মাত্র তার দিকে তাকিয়েই আবার অবসন্ন ভাবে এলিয়ে পড়লেন বিষ্ণুপ্রসাদ, মাথাটা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল। পূজা করা আর তাঁর হ'ল না, এ দেহে কোনদিনই আর হবে না।

হরকিশোর শিউরে আঁত্‌কে উঠলেন যেন।

'গুরুজী! গুরুজী!...ছি ছি—করলে কি বৃন্দাপ্রসাদ—এততেও তোমার সাধ মেটে নি! শেষে পিতৃহত্যা করলে!'

কিন্তু ঠিক সেই সময়েই—হরকিশোরের আর্ত কণ্ঠ নীরব হবার আগেই—পিছনে কার দ্রুত পদশব্দ জাগল। শোনা গেল কার রুষ্ট তর্জন। গ্রামবাসীদের কারও নয়—আর কারা ছুটে আসছে, এ তর্জন তাদেরই।

অবাক হয়ে চাইল সবাই। চাইল উন্মাদ বৃন্দাপ্রসাদও।

আর চাইবার সঙ্গে সঙ্গেই দৃষ্টি স্থির এবং আতঙ্ক-বিস্ফারিত হয়ে উঠল তার।

মালিক বাহ্‌রাম ছুটে আসছে—হাতে তার উন্মুক্ত তরবারি।

পিছনে আসছে মালতী, তার দুই চোখে ঐ তরবারির চেয়েও শাণিত দৃষ্টি।

সেদিকে চেয়ে যেন পাথর হয়ে গেল বৃন্দাপ্রসাদ।

আবারও একটা হুঙ্কার দিয়ে উঠল বাহ্‌রাম। সেই শেষ মুহূর্তে বুঝি বিধাতা খানিকটা পৌরুষ সঞ্চারিত করেছেন তার মধ্যে—তার পূর্বপুরুষের রক্ত জেগেছে তার ধমনীতে।

বহু লোককে ডিঙিয়ে লাফিয়ে তরবারি হাতে একেবারে সামনে এসে দাঁড়াল সে।

কী দেখল আর কী বুঝল বৃন্দাপ্রসাদ কে জানে, বুঝি নিজের নিয়তিরই

দেখা গেল সে বাহ্‌রামের মধ্যে। কিন্তু অকস্মাৎ একটা দারুণ আতঙ্কে চিৎকার ক'রে উঠল। ভয়ার্ত পশুর মতোই আতঙ্কের একটা অব্যক্ত আর্তনাদ ফুটল তার কণ্ঠে। তারপরই সে একবার হেসে উঠল আপন মনে—হা-হা ক'রে।

প্রথম হাসির বেগ কমে আসতে আর একবার ভাল ক'রে চেয়ে দেখল পায়ের কাছে মৃত বাপের স্থির নিস্পন্দ দেহটার দিকে, তারপর আবারও হেসে উঠল হা-হা ক'রে। আরও পৈশাচিক, আরও ভয়ঙ্কর, আরও প্রচণ্ড।

সেই প্রচণ্ড শব্দ বহু সহস্র হস্ত উচ্চে, হিমালয়ের এই নিভৃত নিস্তব্ধ শান্ত তুষাররাজ্যে প্রচণ্ডতর প্রতিধ্বনি জাগাল।

পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় সে প্রতিধ্বনি যেন আছড়ে আছড়ে মাথা কুটে কুটে ঘুরে বেড়াতে লাগল। বহুক্ষণ ধরে সে শব্দের রেশ লেগে রইল ওখানকার গতিহীন বাতাসে, সরোবরের নিস্পন্দ জলে এবং তুষারাবৃত কঠিন পর্বতগাত্রে।

আর সেই রেশ মিলোবার আগেই আর একটা ভয়ঙ্কর শব্দ উঠল কোথায়, গুরু-গুরু, গুম্‌-গুম্‌!

মেঘগর্জনের মতো; ভূমিকম্পের মতো শব্দ।

কিসের শব্দ, কী কারণ, কিছু না বুঝতে পারলেও সে শব্দ কানে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে একটা অজানা ত্রাসে কেঁপে উঠল সবাই।

আকাশে মেঘ নেই যে মেঘ ডাকবে। মাটিও তো কাঁপছে না। ভূমিকম্প উঠলে সরোবরের জলও ছলাৎছল করত—সেও তো তেমনি নিবাত-নিষ্কম্প স্থির। তবে!

শব্দটা কিন্তু বেড়েই যাচ্ছে নিমেষে নিমেষে।

প্রচণ্ড থেকে প্রচণ্ডতর হচ্ছে।

গুম গুম! গুম গুম!

এরই মধ্যে কে যেন চেঁচিয়ে উঠল—'ঐ যে! ঐ যে!'

তারই অঙ্গুলি-সঙ্কেতে সকলে মুখ তুলে তাকিয়ে দেখল—ঠিক তাদের মাথার উপরের এক অভ্রংলিহ শৃঙ্গ থেকে বিরাট—অন্তত কয়েক সহস্র মণ ওজনের—এক হিমানী-সম্প্রপাত নামছে। আগে আস্তে আস্তে নামছিল—এখন যত নিচে নামছে ততই তার গতিবেগও বাড়ছে,—তেমনি তার আকৃতিও।

আর তেমনি ভয়ঙ্কর শব্দ উঠছে তার এই প্রচণ্ড নিম্নগতির।

সকলে আর্তনাদ ক'রে উঠল ভয়ে, হাহাকার ক'রে উঠল! কেউ কেউ আত্মরক্ষার জন্য ছুটে গেল সরোবরে ঝাঁপ দিতে—কিন্তু কেউ বিশেষ কোন চেষ্টা করার আগেই আর কয়েক মুহূর্তের মধ্যে নেমে এল সেই শিলীভূত তুষার।

দেখতে দেখতে একটা গ্রামের সেই কয়েকশত প্রাণীকে নিঃশেষে নিশ্চিহ্ন ক'রে দিল। তাদের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, শোক-হর্ষ—সমস্ত সমাধিস্থ হয়ে গেল সেই সুবিপুল তুষার স্তূপে।

বৃন্দাপ্রসাদের পৈশাচিক হাসির প্রতিক্রিয়া জেগেছিল পর্বতশৃঙ্গে—তারই ফল ঐ ভয়ঙ্কর হিম-প্রপাত।

সে বহুদিনের কথা।

বহু শতাব্দী কেটে গেছে তার পর। বহু রাজ্য ভাঙ্গা-গড়া হয়েছে—বহু উত্থান-পতনের কাহিনী লিপিবদ্ধ হয়েছে মানবেতিহাসের পাতায়। কিন্তু ওদের কথা লেখে নি কেউ। সে কথা কেউ জানেও না। সেদিনকার সেই তীর্থযাত্রীদলের, অস্থিমাত্র পড়ে আছে রূপকুণ্ডের চারিপাশে—মহানাটকের নীরব সাক্ষী তারা। অস্থি—আর সেদিনের নিত্য প্রয়োজনীয় নিত্যসঙ্গী কয়েকটি বস্তুর ভগ্নাবশেষ। সামান্যতম চিহ্ন—সেদিনকার একদল নরনারীর প্রাণ-স্পন্দিত জীবনযাত্রার।

সে লালতা-কেশৌ গ্রামও সম্ভবত আর নেই। হয়তো বহুকাল পরে গৃহসন্ধানী কোন মানুষের দল কিংবা পথশ্রান্ত কোন যাযাবর জাতি এসে বাসা বেঁধেছে সেখানকার শূন্য ঘরে ঘরে। হয়তো দিয়েছে কোন নতুন নাম সে গ্রামের। হয়তো কেশবজীর মন্দিরও ভেঙ্গে-চুরে মিলিয়ে গেছে মাটিতে—কিংবা সেখানে বসেছেন নতুন কোন বিগ্রহ, নতুন দেবতা।

কিছুই নেই তাদের—আর কোথাও কোন অস্তিত্ব নেই। বিধাতার রুদ্ররোষ শুধু তাদের সংহার করে নি—বিনষ্ট করেছে তাদের ইতিহাসও।